অগ্নিঝরা দিনলিপি

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর
ইতিহাসখ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনীসম্বলিত উপন্যাস....

# শেষ আঘাত

১

আলতামাস

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর ইতিহাস খ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস

# শেষ আঘাত

## (প্রথম খণ্ড)

মূল
এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

রূপান্তর
মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ঐতিহাসিক উপন্যাস

# "শেষ আঘাত" (১ম খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস

প্রকাশক

**তারিক আজাদ চৌধুরী**
**আল-এছ্হাক প্রকাশনী**
**আল-আবরার প্রকাশনী**
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি - ২০০৭ ইং

পরিবেশনায় ও প্রাপ্তিস্থান
**আল-এছ্হাক প্রকাশনী**
বিশাল বুক কমপ্লেক্স (দোকান নং-৩৭)
৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৩৫২৬
**আল-আবরার প্রকাশনী**
ইসলামী টাওয়ার,দোকান নং-৩
১১, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন- ০১৫৬৩৩৪০৭৫

মুদ্রণে
আফতাব আর্ট প্রেস
তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।

মূল্য ◆ ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

---

**SHASH AGATH : Vol-1 (A Historical Novel)**
BY: Enayatulla Altamash. Published by. Tariq
Azad chowdhury of Al-Eshaque Prokashani & Al-Abrar
Prokashani, Bisal Book Complex & Islami Tower,
Bangla Bazar. Dhaka. Bangladesh.
Phone : 7123526

**Price :- 120.00 Taka Only**

**ISBN- 984 - 834 - 837- 062-5**

# অনুবাদকের কথা

উপমহাদেশের ইসলামী সাহিত্যাঙ্গণে আলতামাস এখন একটি অপরিহার্য নাম। ইসলাম প্রিয় বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তার ঈর্ষান্বিত গ্রহণযোগ্যতা বেশ কৌতুহলদ্দীপক, ইসলামের শ্বাশ্বত ইতিহাস ও তার চিরায়তধারাকে অবলম্বনে এ পর্যন্ত তিনি যে ক'টি উপন্যাস রচনা করেছেন তার সব ক'টিই পাঠকমহলে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। এর কারণ, তার উপন্যাসে পাঠক এক দিকে গল্প-কাহিনীর বিচিত্র স্বাদ আস্বাদনে সিক্ত হয়, অপর দিকে ইতিহাসের নিখুঁত চিত্রায়ন তার মন মগজে অংকিত হয়ে যায়। এক অমোঘ সত্যের আলো তার অগ্রসরমান জীবন পরিক্রমার পাথেয় হয়ে থাকে।

'আওর নীল বাহ্‌তা রাহা' দীর্ঘ উপন্যাসটিও একই ধারার নন্দিত প্রয়াস। ভারত-পাকিস্তানে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইসলামের ইতিহাসের এমন কয়েকটি মৌলিক অংশ উন্মোচিত হয়েছে যা অনেকেরই আজানা। এমনকি অন্য কারো কলমেও তা উপস্থাপিত হয়নি। তাই নিশ্চিত করে বলা যায় 'শেষ আঘাত' থেকে পাঠক 'সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনার' মতো দুর্লভতা অর্জনের স্বাদ পাবেন ইনশাআল্লাহ।

— মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

১৫-২-০৭ ইং

# প্রকাশকের নিবেদন

আশাতীত না হলেও এক প্রকার গর্বের সঙ্গেই বলা যায়, ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক সময় যে শূন্যতা ছিলো আজ তার অনেকটাই কেটে গেছে। এক ঝাক সৃজনপিয়াসী প্রতিভাধর আলেম নিরলস সাহিত্য চর্চার আলোকে বাংলা ভাষাকে প্রতিনিয়ত করে তুলেছে আরো সমৃদ্ধময়। এক্ষেত্রে কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক উপন্যাস উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে গড়ে উঠে বিপুলসংখ্যক ইসলামমুখী পাঠক শ্রেণী।

বলা বাহুল্য, এ সকল রুচিশীল ও পাঠক প্রিয় সাহিত্যকর্ম প্রকাশনায় "আল-এছহাক প্রকাশনী" বরাবরই অগ্রণী থাকার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর সবগুলো জনপ্রিয় উপন্যাসের অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশ করে আমরা পাঠক মহলের কাছ থেকে পেয়েছি বিপুল সাড়া। বিদগ্ধ পাঠকমহলেরই উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়ে উপমহাদেশের আরেক প্রবাদতুল্য ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামসের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোও সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে "আল-এছহাক প্রকাশনী"।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পেলো এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের 'শেষ আঘাত' প্রথম খণ্ড। বিশিষ্ট আলেম, সাহিত্যিক, পাঠকপ্রিয় লেখক, অনুবাদক মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীনের অনুবাদ করেছেন, তার অনুবাদে সবসময় মৌলিকতার স্বরূপ আরো শিল্পায়িতভাবে বিস্তৃত হয়। বিদগ্ধ পাঠককে যা আকর্ষিত ও আলোড়িত করে তুলে। এই বইতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

আশা করি তার অনূদিত আলতামাসের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এটিও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

— তারিক আজাদ চৌধুরী

# প্রথম খণ্ড

# ১

রাগী সূর্য তার সমস্ত রাগ ঢেলে দিচ্ছে মরুর খটখটে বালিয়াড়িতে। চার দিক জুড়ে নৃত্য করছে ঝলসানো তাপের অদৃশ্য শিখাগুলো। এর মধ্য দিয়েই তাপদগ্ধ হয়ে ছুটে চলছে এক মুসাফির। গন্তব্য তার মদীনা। এ বিজন মরুতে সে একলা। সঙ্গী বলতে একমাত্র তার ঘোড়াটিই। অথচ মরুতে কোন মুসাফির একা একা পথ চলার দুঃসাহস দেখায় না। কারণ প্রতি পদেই এখানে লুটেরা আর মরু দস্যুর ভয়। লোকেরা এজন্য কাফেলার সহযাত্রী হয়ে সফর করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। কাফেলার সঙ্গে সফর করলে শুধু লোক-সঙ্গ ও নিরাপত্তার অভাবই দূর হয় না, নানান বিপদাপদে রোগ শোকে সম্মিলিত সাহায্যও পাওয়া যায়।

তবুও একা একাই চলছে এ মুসাফির। না, তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সে পথহারা কোন পথিক। পথহারা পথিকের চেহারায় যে বিমর্ষতা থাকে, শংকার যে কালো আঁচড় থাকে তার মধ্যে সেটা একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য সফরের ক্লান্তি তার মধ্যে স্পষ্ট। কিন্তু পথচলায় 'কুছ পরওয়া নেহি' ধরনের দূরন্ত অভিব্যক্তি। গুণগুণ করে কখনো মরুচারীদের কোন গানের কলি আওড়াচ্ছে সে, কখনো ঘোড়ার সাথে বিড় বিড় করে কথা বলছে। এভাবে হেসে খেলেই সে এই কঠিন সফরকে সহজ করে নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে সে পথে দু'বার তাঁবু ফেলেছে। ঘোড়াটিকে সে ক্লান্ত হতে দেয়নি। তার সাথের পাথেয়, তার পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছিলো না যে, সে জীবিকার সন্ধানে ক্লিষ্ট হয়ে ফিরছে, না সে কোন বেদুইন পল্লীর লোক, না দরিদ্র কোন পরিবারের অসহায় কেউ। চেহারায় আভিজাত্যের দারুণ দ্যুতি ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো সে তার গোত্রের সরদার গোছের কেউ হবে।

তার সফরের আরেকটি সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ছিলো। সে তখন মাটি ও বালির উঁচু নিচু অসমতল টিলা টক্করের ভোলভালার ভেতর দিয়ে পথ চলছিলো। সে হয়তো জানতো সামনেই ছোট একটি মরুদ্যান রয়েছে। তাই সে তার ঘোড়ার লাগামও ঢিল করে।

মরুদ্যানে গিয়ে সে তার ঘোড়াটি থামাতে চাইলো। কিন্তু ঘোড়া তার মুনীবের ইংগিত উপেক্ষা করে ছুটতে ছুটতে উদ্যানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ক্ষীণ

একটি পাহাড়ী ঝর্ণাধারায় গিয়ে পৌছে চঞ্চল হয়ে পানি পান করতে লাগলো। মুসাফিরও ঘোড়া থেকে নেমে থলে খুলে তার শুকনো খাবারের প্রতি মনোযোগ দিলো।

পরদিন ভোরে সে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলো। মরুর শীতল রাত তাকে ও তার ঘোড়াটিকে দারুন সতেজ করে তুলেছে।

টিলা টক্করের এলাকা থেকে সে যখন বের হলো সূর্য তখন তার মাথার ওপর। কোথাও পথের ওপর শুকনো ঝাড়, পাতাবিহীন উলঙ্গ প্রকান্ড গাছ। মুসাফির পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লো। ভেতরে মানুষ চলাচলের পরিষ্কার রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা এত আঁকা বাঁকা ও ঘন ঘন মোড় ঘুরানো যে, মরুর রহস্য যে জানে না সে এখানে এসে নির্ঘাত পথ হারিয়ে ফেলবে। দিনক্ষণ ঘুরে এক জায়গাতেই ফিরে আসবে।

কিন্তু এ মুসাফিরের দৃঢ় ও নির্ভীক হাবভাব দেখে অনুমান করা যাচ্ছিলো যে, সে মরুর রহস্য তো জানেই নিজেও আরেক রহস্য। যে দিক দিয়েই সে রাস্তা পাচ্ছিলো নির্ভয়ে সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলো।

অনেক্ষণ পর সেই আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ পেছনে ফেলে সে বিশাল বালির সমুদ্রে পড়লো। চার দিকের দিগন্ত জুড়ে যেন বালির উত্তাল তরঙ্গ। বালির ওপর দিয়ে যেন পশলা পশলা আগুনের লেলিহান জ্বলছে। তবে এ থেকে পাক খাওয়া শিখাগুলো আগুনের মতো নয়; চকচকে আয়না বা স্বচ্ছ ঝিলের মতো মনে হচ্ছিলো।

হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো দূরাগত কোন শব্দ। শব্দ অনুসরণ করে তার দৃষ্টি চলে গেলো এক সওয়ারের দিকে। সওয়ার এদিকেই আসছিলো। যেন ঝিলের স্বচ্ছ পানি ভেদ করে সাঁতরে আসছে। কিন্তু সে কি উট সওয়ার না ঘোড় সওয়ার তা বুঝা যাচ্ছিলো না।

মুসাফির থেমে গেলো। হাত চলে গেলো তার কোষবদ্ধ তলোয়ারের ওপর। আগন্তুক কোন লুটেরা বা মরু তস্করও হতে পারে। না তার সঙ্গে অর্থ সম্পদের কোন থলে ছিলো না। কোন স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণমুদ্রার মজুদও ছিলো না। তবে তার ঘোড়াটি এখন তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সেটা সে কোনভাবেই হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলো না। গন্তব্য তার এখনো অনেক দূর।

আগত সওয়ারের অবয়ব যতই স্পষ্ট হতে লাগলো ধীরে ধীরে তার তলোয়ারও কোষমুক্ত হতে লাগলো; আগত সওয়ার যাতে তার ওপর আচমকা হামলা করতে না পারে এজন্য সে পূর্ণ সতর্ক হয়ে রইলো।

মরুর চামড়া ঝলসানো তাপ থেকে বাঁচার জন্য আগত সওয়ার মাথা ও মুখ কাপড়ে আবৃত রেখেছিলো। শুধু চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছিলো। এই মুসাফিরের চেহারাও নেকাব আবৃত ছিলো। একেবারে কাছে আসার পর বুঝা গেলো এ আসলে ঘোড়সওয়ার।

দু' সওয়ার মুখোমুখি হলো, চরম উত্তেজনা নিয়ে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ দু'জনের একজন মুখ খুললো। কাঁপা কাঁপা গলায় আগত সওয়ার জিজ্ঞেস করলো–

আমাদের কি অপরিচিত থাকার প্রয়োজন আছে ? আচ্ছা একলা সফরে বের হয়েছো কেন ?

'তুমিই বা কেন একলা সফরে বের হলে ? কোত্থেকে আসছো ? যাচ্ছোই বা কোথায় ?'– মুসাফির ঘোড়সওয়ার জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার আওয়াজ কেমন চেনা চেনা লাগছে'– আগত সওয়ার বললো।

'তোমার আওয়াজ তো আমার কাছে এমনই ঠেকছে'– মুসাফির বললো।

'তাহলে আর আমাদের পরিচিত হতে বাঁধা কোথায়?'– আগত সওয়ার একথা বলে তার চেহারা বেনেকাব করে দিলো।

'খোদার কসম ইবনে ওলীদ!'– মুসাফির সওয়ারও তার চেহারা নেকাবমুক্ত করে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো– 'আমি ঠিকই চিনেছিলাম... এ আওয়াজ আমার বন্ধু খালিদ ইবনে ওলীদের।'

'আমর ইবনে আস! – খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) ঘোড়া থেকে নেমে হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি না আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলে ?'

দু'জনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ এভাবেই একজন আরেকজনের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন।

আসলে খালিদ ইবনে ওলীদ ও আমার ইবনে আস (রা) গোপনে মদীনা যাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য। কিন্তু কেউ কারো মনের পবিত্র বাসনা সম্পর্কে জানতেন না। একজন আসছিলেন মক্কা থেকে। আরেকজন আবিসিনিয়া থেকে। পথে দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়ে যায়।

কিন্তু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ আমর ইবনে আছকে দেখে বেশ আশ্চর্য হন। তার এ বিস্ময় আবাদী থেকে বহুদূরের বিজন মরুতে আমরকে দেখার কারণে নয়, বরং আমর দু' বছর আগে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। আবিসিনিয়া

থেকে সরাসরি মক্কায় যাওয়াটাই আমর ইবনে আসের জন্য স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আমরের গন্তব্য মদীনার দিকে কেন ? এজন্যই তিনি বেশ হয়রান হয়ে আবার আমর ইবনে আসকে জিজ্ঞেস করেন–

'আচ্ছা আস! সত্যি করে বলো তো তুমি এখানে কি করে এলে ? তুমি না আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর কাছে চলে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ' ইবনে ওলীদ!'– আমর ইবনে আস (রা) বললেন– ' আমি আবিসিনিয়া চলে গিয়েছিলাম। তবে শুধু ব্যবসার জন্যই যাইনি অন্য কারণও ছিলো। কিন্তু এবার হঠাৎ করেই ফিরতে হলো আমাকে। ধরে নাও পথ হারিয়ে এখানে পৌঁছেছি। তোমাকে পেয়ে গেছি। তুমিই সম্ভবত আমাকে কোন পথ দেখাতে পারবে। চিন্তার রাজ্যে ফিরতে ফিরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'আগে তোমার চিন্তার রাজ্যের সন্ধান তো দাও'– খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) বললেন– 'তুমিও যদি তোমার কল্পিত চিন্তার জগতে হারিয়ে যাও মক্কার কুরাইশরা তো তাহলে হারিয়ে যাবে অচিন অন্ধকারে।'

একথার জবাব দিতে গিয়ে আমর স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লেন।

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আস বনু সাহাম গোত্রের লোক। কুরাইশরা বহু প্রতিমার পুজারী। এসব প্রতিমার তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে বনু সাহামের নাম তখন উচ্চারিত হতো সর্বাগ্রে। এ কারণে আমর ইবনে আসের বাবা আস ইবনে ওয়ায়েল সাহামীর বেশ নাম ডাক আছে কুরাইশদের মধ্যে। তাছাড়া আস বংশীয় কৌলিণ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, অর্থ সম্পদেও তেমন শীর্ষতম। তাদের অর্থ সম্পদের যোগান আসতো বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা।

আমরের বাবা আস ইবনে ওয়ায়েলের ব্যক্তি প্রতিপত্তিও কম ছিলো না। উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। কোন কোন্দলের কারণে উমর (রা) এর গোত্র বনু আদীকে বনু আব্দে শামস ভিটে ছাড়া করে। সাফা পাহাড়ের কাছেই ছিলো বনী আদীর বসতি। তাদেরকে কেউ আশ্রয় দেবে এমন সাহস কারো ছিলো না। কিন্তু বনু সাহাম বনু আদীকে আশ্রয় দেয়। পরে যখন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন বনু সাহামের লোকেরা তাকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে

লাগে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আস ইবনে ওয়ায়েল উমর (রা)-কে তার হেফাজতে রাখেন।

আস ইবনে ওয়ায়েল খুব সৌখিন লোক ছিলেন। সব সময় ফিনফিনে রেশমের কাপড় পরতেন। আমর ইবনে আসেরও বাবার এ সৌখিন-ফুরফুরে জীবন বেশ ভালো লাগে। আমরের কাছে তার বাবার আরেকটা জিনিস ভালো লাগে। সেটা হলো, সমাজকে উদার ও দক্ষ নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে তার বাবার সাফল্য।

ইসলাম প্রকাশের পর খালিদ ইবনে ওলীদ ও কুরাইশদের অন্যান্য সরদারের মতো আমর ইবনে আসও রাসূলুল্লাহ (স) এর শত্রু হয়ে যান। তাঁকে হত্যা করার নানান ফন্দি ফিকির করতে থাকেন। তবে তাকে এটাও ভাবিয়ে তোলে যে, কুরাইশরা এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধেই মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। তবুও আহযাব যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আশার বিন্দুটুকু বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলছিল।

শাহ সওয়ারী, তলোয়ার চালনা ও কুশলী যোদ্ধা হিসেবে আমর খালিদ ইবনে ওলীদের চেয়ে কম ছিলেন না। আহযাবে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার অসাধারণ যুদ্ধ কৌশলের চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখিয়েছেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসীম সাহসী রণবীর হিসেবে। কিন্তু পূর্বের সেই লাঞ্ছনাকর পরিণামেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে কুরাইশদের ভাগ্যে। বড় অপদস্থ হয়ে তারা ময়দান ছাড়তে বাধ্য হয়।

পরাজয়ের আরেকটি ক্ষত নিয়ে আমর ইবনে আস ফিরে আসেন মক্কায়। কিন্তু এ নয়া ক্ষতের দগদগে জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারতে থাকে দিন রাত। অবশেষে তিনি কুরাইশদের বাছা বাছা কয়েকজনকে এক জায়গায় জড়ো করেন। যথাসম্ভব নিরাসক্ত গলায় তাদেরকে বলেন–

'কুরাইশের অন্যতম বুদ্ধিজীবিরা! মুহাম্মদ (স)-এর ব্যাপারে আমরা এখনো আত্মতুষ্টিতে ভুগছি। উহুদ ছাড়া একটি যুদ্ধেও আমরা তার সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারিনি। মেনেই নিতে হচ্ছে মুহাম্মদ নামের তারকাটি আকাশের শীর্ষ চূড়ায় পৌছে যাচ্ছে।'

'আমরা তোমাকে বিচক্ষণ বলে জানি। তুমি যা বলেছো তাও আমরা দেখেছি। আমাদের মধ্যে তোমার বুদ্ধি বিবেচনা সবচেয়ে প্রখর। এখন আমাদের কী করতে হবে তাই বলো'– এক লোক বললো।

'তোমরা সবাই আমার বন্ধু। তবুও আমি যা চাই তোমরা হয়তো মানতে চাইবে না। কিন্তু আমার নিজের ও তোমাদের প্রত্যেকের ন্যূনতম একটি সম্মানজনক জীবনের কথা ভেবে কূল পাচ্ছি না এখন। আমাদের আভিজাত্যই নয়, অস্তিত্বই ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পথে। সামনে আমি তাই একটি পথই খোলা দেখছি। কেউ আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে থাকতে পারো। আমি আবিসিনিয়ায় চলে যাবো। সম্রাট নাজ্জাশীর আশ্রয়ে থাকবো।'

'সেখানে আর কতদিন থাকতে পারবে। আর করবেই বা কি সেখানে?' কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো।

'ব্যবসা। না হয় নাজ্জাশী আমাদের জন্য অন্যকোন জীবিকার পথ করে দেবেন। এ সময়ের মধ্যে মুসলমানরা যদি কুরাইশদের পুরোদমে কাবু করে ফেলে তাহলে নাজ্জাশীর ছায়ায় থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর কুরাইশরা যদি মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হয় তাহলে এ নতুন ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরাও ফিরে আসবো।'

✪ ✪ ✪

'ইবনে ওলীদ!' – আমর ইবনে আস খালিদ ইবনে ওলীদকে এসব কথা শুনিয়ে বললেন– 'তুমি নীরবে আমার কথা শুনে গেছো। তোমার নীরবতার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে– আমার কথাগুলো তোমার ভালো লাগেনি।'

'আমি সরব কি নীরব সেটা ছেড়ে দাও দোস্ত'– খালিদ (রা) আশ্বাস ভরা সুরে বললেন– 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমারও কিছু কথা আছে। কাউকে আমি তা বলতে চাই, আগে তোমার সব কথা শুনে নিই।'

'তোমাকে বলেছিলাম, আমার প্রস্তাব শুনে কুরাইশদের কয়েকজন আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। ব্যবসার নাম করে আমরা রওয়ানা করলাম। আবিসিনিয়ার পথ তো তুমি জানো। মক্কা থেকে বের হয়ে আমরা লোহিত সাগরের তীর ধরে ইয়ামানে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আদনে। আদনের কাছেই এক জায়গায় সমুদ্রের পাট দুদিক দিয়ে সংকুচিত হয়ে নদীর রূপ নিয়েছে। সেখানে পৌঁছে আমরা পালতোলা নৌকায় করে সমুদ্র পার হলাম। তারপর শুরু করলাম স্থল পথে সফর। তিন চার রাত তাঁবু ফেলতে হলো পথে। বেশ কয়েকদিন পর পৌঁছলাম আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা। এ সফর যে কত দীর্ঘ আর কঠিন ছিলো সে এক মাত্র তুমিই বুঝবে। তবুও অমরা গন্তব্যে

পৌঁছলাম বহাল তবিয়তে। তারপর গেলাম নাজ্জাশীর কাছে। বললাম, আমরা কারবারি লোক। কারো ওপর বোঝা হয়ে থাকা আমাদের স্বভাব নয়। আপনার আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন সাহায্য আমরা চাই না। নাজ্জাশী আমাদেরকে শাহী মেহমানের সম্মান দিলেন। আর যে আবাসন দিলেন আমাদের তা এক কথায় শাহী খান্দানের জন্যই হয়ে থাকে।'

'তোমার এসব কথায় আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুনতে চাচ্ছি তুমি ফিরে এলে কেন'– খালিদ ইবনে ওলিদের গম্ভীর গলা–' তুমি আবিসিনিয়া থেকে এলে মক্কায় কেন গেলে না ? মক্কা তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছো। তুমি কি আমার কাছে লুকাচ্ছো কিছু আমর!'

'না ইবনে ওলীদ! তুমি আমার বন্ধু। কুরাইশদের মধ্যে তোমার মতো আমিও নেতৃস্থানীয় লোক। আবিসিনিয়ায় যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু বলিনি। অন্যদেরও বলিনি। শুধু আমার সঙ্গীদের বলেছিলাম কাউকে যেন ওরা কিছু না জানায়। কিন্তু কোন কারণে আমার মন এমন দ্বিধান্বিত যে, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। তোমাকে পেয়ে ভালোই হলো।'

'তোমার সঙ্গীরা কোথায় ?'

'ওদেরকে ওখানেই রেখে এসেছি। ওদেরকে আমার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। ওরা পছন্দ করেনি। তাই ওদেরকে ছেড়ে এসেছি।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছো, এখন তোমার কথা শুনে সন্দেহ হচ্ছে তোমার চিন্তার ঘোড়াটিই মুখ থুবড়ে পড়েছে। এত লম্বা কথার দরকার কী ইবনে আস ? তোমার আসল উদ্দেশ্যটা বলে ফেলো না!'

'ইবনে ওলীদ! আগে আমার সব কথা শুনে নাও। তারপর আসলটা বলবো। না হয় তুমি আমাকে ভুল বুঝবে। এ তো তুমি জানো আমাদের ব্যবসায়ীরা আবিসিনিয়ায় বাণিজ্য সফরে যায়। একদিন এক আরবী বাণিজ্য কাফেলা আদ্দিস আবাবা পৌঁছে। এতে আমার পরিচিত কিছু লোক ছিলো। তাদের কাছে জানতে পারি, মুহাম্মদ (স) হুদায়বিয়ায় কুরাইশদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। চুক্তিমতে একদল অপর দলের বিরুদ্ধে দশ বছর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। মুহাম্মদ (স) কুরাইশদের সব শর্তই মেনে নিয়েছেন এবং ঠিক হয়েছে, এক বছর পর তিনি ফের উমরা করতে আসবেন। আমি মানতে পারছিলাম না এমন কোন চুক্তিও হতে পারে। কিন্তু কিছু দিন পর মক্কা থেকে আসা এক লোককে পেলাম। সে

জানালো, মুসলমানরা তাদের পয়গম্বর মুহম্মদ (স) এর সঙ্গে এক বছর পর মক্কায় এসে নিরাপদেই উমরা আদায় করে ফিরে গেছে..............

'মক্কা থেকে আসা সেই লোক থেকে আরো কয়েকটি কথা জানতে পারি। এ থেকে যে ফলাফল পাই তা হলো, কুরাইশরা মুসলমানদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। ওদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। আমার কথা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে। তবে আমি আমার মনের কথাই বলছি। মুহাম্মদ (স) এর অসামান্য কৃতিত্বের প্রতি আমি মুগ্ধ। অনেক ভেবে চিন্তে এ মতামত দাঁড় করিয়েছি, মুহাম্মদ নামক নক্ষত্রটি তার শীর্ষ চূড়ায় পৌছে গেছে। কারণ আমার মতো তুমিও জানো, তিনি মদীনায় যাওয়ার পর থেকে মুসলমানদের সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। তুমি তো এও জানো কুরাইশরা মদীনায় হামলা করতে গেলে মুসলমানরা কী এক অভাবনীয় প্রতিরোধ পন্থা আবিস্কার করে। তারা মদীনার প্রায় চারদিকে পরিখা খনন করে।'

কুরাইশদের সেই হামলায় খালিদ ইবনে ওলীদ (রা)ও ছিলেন। আমর ইবনে আসের মুখে এ যুদ্ধের কথা শুনে নিজেই যুদ্ধের পুরো কাহিনী শোনালেন আমরকে এবং মুসলমানদের পরিখা খননের ব্যাপারে খোলামেলা প্রশংসা করলেন।

'তাহলে দোস্ত! তুমিই বলো'– আমর ইবনে আস বললেন– 'মুসলমানদের রনাঙ্গণের শ্রেষ্ঠত্ব আমি কেন মেনে নেব না? আবিসিনিয়ায় এসব শোনার পর আমার মতামত এ দাঁড়িয়েছে যে কুরাইশদের কাছে এখন আর কিছুই নেই। আমার মতে মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব আছে তার ছিটেও আমাদের কোন বড় নেতার মধ্যেও দেখা যায় না। আমি যোদ্ধা, তুমিও একজন যোদ্ধা। কিন্তু আমরা কি আমাদের লোকদের সঙ্গে মিলে কখনো আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঝলক দেখাতে পেরেছি? ...... না ..... পারিনি। এখন আমি যা বলবো তা হয়তো তোমাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে বা আমাকে হত্যার জন্য তুমি উন্মুক্ত করতে পারো তোমার তরবারি।'

'তাহলে তোমার মনের কথা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। ইবনে আস! ইসলাম গ্রহণের জন্য তুমি এসেছো। আমি কি ভুল বললাম?' – খালিদ বললেন স্মিত হাস্যে।

'খোদার কসম! তুমি আমার মনের কথাই বলেছো। কিন্তু এরপরও আমি দ্বিধান্বিত। কখনো মনে হয় আমার ফয়সালা সঠিক নয়। হয়তো আমি আমার

গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই না। কিন্তু ওদেরকে দেখে আমার আফসোস হয় ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলো না। .... ইবনে ওলীদ! তুমি বলো আমার ফয়সালা সঠিক না বেঠিক ? যদি বেঠিক হয় তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি আমার ধড় দেহ থেকে আলাদা করে দাও।'

খালিদ (রা) মুখ তোলে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। পর মুহূর্তেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমর ইবনে আসের দিকে তাকালেন এবং তার হাত দুটি রাখলেন আমর ইবনে আসের কাঁধে। খালিদ ইবনে ওলীদের চেহারায় তখন যেন খেলা করছিলো এক জ্যোতির্ময় আভা। কিন্তু চোখে তার আনন্দের অশ্রু।

'ইবনে আস!'– খালিদ ইবনে ওলীদ আমার ইবনে আসের কাঁধে হালকা ঝাকুনি দিয়ে আবেগ ভেজা কণ্ঠে বললেন–

'তোমার ফয়সালাই সঠিক। এখন আর অন্যকোন ভাবনা মনে স্থান দিয়ো না। এই সফরে আমি তোমার হামসফর। আমাদের দু'জনের মনযিল একটাই........ আমিও মদীনায় যাচ্ছি ইলাম গ্রহণের জন্য। মক্কার কাউকে কিছু বলিনি। চলো, কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

খালিদ ইবনে ওলীদ ও আমর ইবনে আস মদীনায় পৌঁছে এক সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হলেন।

'আপনার পবিত্র হাতে বায়আত হতে এসেছি। আমার মন প্রাণ দিয়ে আপনার রিসালাতের কথা স্বীকার করছি'– খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) কে বললেন একেবারে আনত কণ্ঠে।

রাসূলুল্লাহ (স) খালিদ (রা) কে বায়আত করে তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি আমর ইবনে আসের দিকে স্মিত মুখে তাকান। আমর ইবনে আস রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরো কাছে এসে বসেন এবং দরজা কণ্ঠে বলেন– 'আমিও আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করেছি। কিন্তু বায়তের আগে আমার আর্জি হলো– আমার অতীতের সব পাপ ক্ষমা করে দিতে হবে। আমিও ভবিষ্যতে নিজেকে পাপমুক্ত রাখবো। নিজেকে ইসলামের গণ্ডিতেই লালন করবো।'

রাসূলুল্লাহ (স) আমর ইবনে আসকে বললেন, পাপ ক্ষমার অধিকারী আল্লাহ। আর যে তাওবা করে ইসলামে দীক্ষিত হয় তার অতীতের সব পাপ ধুয়ে যায়। যেমন হিজরতের মাধ্যমে অতীতের সব পাপ ধুয়ে যায়। তারপর তিনি

আমর ইবনে আসকে আরো বললেন, তিনি যেন বায়আত হয়ে যান। তখন নিজেই নিজের পরিবর্তন অনুভব করতে পারবেন। আমার ইবনে আস (রা)ও মুসলমান হয়ে গেলেন।

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আসের ইসলাম গ্রহণের অনেক আগের কথা। তিনি ব্যবসায় এবং দেশ ভ্রমণের জন্য ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসরসহ বিভিন্ন দেশে যেতেন। একবার কয়েকজন কুরাইশী নিয়ে আমর ইবনে আস ব্যবসার কাজে বায়তুল মুকাদ্দাস যান। তারা সবাই ডেরা ফেলেন শহরের বাইরে এক খোলা জায়গায়। তারা নিয়ম করে নেন, প্রতিদিন পালা করে একজন একজন সবার সওয়ারী উটগুলোকে মাঠে চরিয়ে আনবে।

দিন ঘুরে একদিন উট চরানোর পালা আসলো আমর ইবনে আসের। সূর্য মাথার ওপর উঠার পর তিনি উটগুলো নিয়ে কাছের এক জঙ্গলে চলে গেলেন। উটগুলোকে ছেড়ে দিলেন এক পাহাড়ের নিচে। সবুজ ঘাস ও পাহাড়ি লতানো গাছগাছালিতে জায়গাটি বেশ সবুজ। প্রচণ্ড গরমে পাতায় পাতায় ছায়াময় জায়গাটিকে মনে হচ্ছিলো স্বর্গের একটি টুকরো। একটি গাছের ছায়ায় তিনি বসে পড়লেন।

আনমনে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ তার চোখ চলে গেলো পাহাড়ের ঢালের দিকে। ঢাল বেয়ে একটি লোক নেমে আসছিলো ; তবে বহু কষ্টে। কখনো এলোমেলো পায়ে, কখনো হোচট খেতে খেতে, কখনো আছড়ে পাছড়ে পাহাড়ের পাথরি পথ ভেঙ্গে নেমে আসছিলো লোকটি। আমর ইবনে আস গভীর চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অবশেষে লোকটি পাহাড় থেকে নেমে এলো। তার চলার মতো শক্তি ছিলো না আর। তবুও মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে কাতরাতে কাতরাতে আমর ইবনে আসের কাছে এসে পড়ে গেলো। 'পানি...... পানি....... মরে যাবো'– লোকটির মুখ থেকে হেচকি বের হতে লাগলো।

ছোট একটি পানির মশক আমর ইবনে আসের কাছে আছে। এ প্রচণ্ড তাপদগ্ধ দিনে একটু পর পরই গলা ভেজাতে হয়। তা না হলে মনে হয় গলায় বিষ কাটা চেপে ধরেছে। তবুও আমর মশকের মুখ খুলে লোকটির শুষ্ক মুখে

লাগিয়ে দিলেন। লোকটি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে পানি পান করলো। মশক প্রায় খালি করে ফেললো। প্রাণ ফিরে এলো তার মুমূর্ষু দেহে।

'পানি নয় আমাকে তুমি নতুন জীবন দিয়েছো ভাই!' –কৃতজ্ঞতায় কেঁপে উঠলো লোকটির কণ্ঠ– 'আমি হযরত ঈসা (আ) এর পবিত্র ভূখণ্ড দর্শনের জন্য পাহাড়ে চড়েছিলাম। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এ ভূখণ্ডের পবিত্র দৃশ্যগুলো দেখবো বলে। কিন্তু আমার বেকুবি হলো সঙ্গে পানি নিইনি আমি। তোমার কাছে যে জীবিত পৌছতে পেরেছি এতো এক মুজিযা।'

লোকটি জানালো, তার নাম শামমাস। সে খ্রিস্টান। মিসরের নৌবন্দর ও রাজধানী ইস্কান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়) তার বাড়ি। মিসরে তখন ইরানের হুকুমত চলছে।

শামমাস পানি পান করে বেশ তাজা হয়ে উঠলেও দীর্ঘক্ষণ পানিবিহীন থাকায় তার দু' চোখ ভারী হয়ে আসলো। দেহে রাজ্যের ক্লান্তির ভার নিয়ে একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়লো। একটু পর সে নাক ডাকতে লাগলো।

আমর ইবনে আস এবার উটগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। পেট ভরা ছাড়া অন্য কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই উটগুলোর। আমর মশকটি উল্টিয়ে দেখলেন, তৃষ্ণার্ত লোকটি দু' এক ফোটা পানি অবশিষ্ট রেখেছে কিনা। না- দু' চার ঢোক পানি অবশিষ্ট আছে। তিনি এজন্য বেশ আরামবোধ করলেন যে, সামান্য একটু পানির বিনিময়ে এই শামমাস নামক লোকটির প্রাণ বেঁচে গেলো। অবশ্য এ অঞ্চলে পানি এখন স্বর্ণের চেয়েও অধিক দামী।

কি মনে করে আমর ঘুমন্ত শামমাসের দিকে তাকালেন। তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ভয়ংকর দর্শন বিরাট একটি কালচে বর্ণের সাপ আস্তে আস্তে ঘুমন্ত শামমাসের দিকে এগিয়ে আসছে। গ্রীষ্মকালে গরম যত বাড়ে সাপের বিষও তত বাড়ে। আর এতো এক বুনো সাপ। এক ছোবলেই যে কোন প্রাণী সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। সাপ আর শামমাসের মধ্যে দূরত্ব এখন দু' এক কদমের মাত্র। এত তাড়াতাড়ি শামমাসের কাছে পৌছা এখন অসম্ভব। আমর ইবনে আস এক ঝটকায় তুনীর থেকে তীর বের করে ধনুকে লাগিয়ে সাপের দিকে তাক করলেন। সাপ ফণা তুলে ফেলেছে। ওই ফণা লক্ষ্য করে তিনি তীর ছুঁড়লেন। এত কাছ থেকে কোন তীরন্দাযের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। তীর সাপের মাথা চূর্ণ করে মাটিতে গেঁথে গেলো। কয়েকবার ছটফট করে সাপটি সেখানেই স্থির হয়ে গেলো। শামমাস তখনো গভীর ঘুমে। তাকে আর জাগালেন না তিনি।

কিছুক্ষণ পর শামমাসের ঘুম ভাঙ্গলে সে উঠে বসলো। প্রথমেই তার চোখ পড়লো মরা সাপটির ওপর। সে সেখান থেকে ছিটকে সরে এলো। সাপের দুমড়ানো মুচড়ানো মাথাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর ঘুরে আমর ইবনে আসের দিকে তাকালো। তার চোখে মুখে অবিশ্বাস-বিস্ময়। আমর ইবনে আস মুচকি হাসছিলেন।

'ওটা মরে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার কাছে ও পৌঁছেই গিয়েছিলো। আমার তীর আর ওকে এগুতে দেয়নি।'

শামমাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমর ইবনে আসের কাছে এসে বসে পড়লো। তার দিকে তাকিয়ে রইলো ঘোর লাগা চোখে। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিলো না। শামমাস নিশ্চিত হতে পারছিলো না তার সামনের লোকটি কি মানুষ না দেবতা!

'তোমাকে আমার কোন মানব সন্তান মনে হচ্ছে না। খোদা তোমাকে আমার নিরাপত্তার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কি আসমানী মাখলুক নও?' – শামমাস বললো সেই ঘোরলাগা সুরে।'

'আহা! এতখানি আজগুবি কথা সহ্য করার মতো শক্তি আমার নেই। মানুষ তো মানুষেরই কাজে আসে। আকাশ থেকে আসিনি আমি। ব্যবসার কাজ নিয়ে মক্কা থেকে এসেছি এবং কুরাইশ গোত্রের লোক আমি– আমর ইবনে আস বললেন।

'মিসরের সবচেয়ে বড় শহর ইস্কান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়) থাকি আমি। এটা মনে করো না আমি মিসরী বলে আরবদের রেওয়াজ-রীতির কিছুই জানি না। আমি জানি আরবে একজন মানুষের প্রাণের মূল্য এক শ' উট এবং এক শ' উটের দাম এক হাজার দীনার! ভুল বলেছি আমি?'

'না বন্ধু! তুমি ঠিকই বলেছো। একশ উটের সমানই একজন মানুষের প্রাণের দাম। আর এই দাম শোধ করার মতো খুব কম লোকই আছে আরবে। এজন্য কেউ কাউকে কতলও করে না কিন্তু তোমার মনে এখন এসব কথা আসলো কেন?'

'কেন এসেছে সেটা জিজ্ঞেস করো না'– শামমাস বললো– 'তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাবো। কিন্তু খোদার কসম! দুটি প্রাণের মূল্য আমি তোমাকে দেবো। এটা তোমার প্রাপ্য। এটা আমি শোধ না করলে খোদা আমার

প্রতি খুব নারাজ হবেন। এটা বহু নবী ও মহাপুরুষের পূণ্যভূমি। এখানে শায়িত এসব পুণ্যাত্মাদের নারাজ করার দুঃসাহস নেই আমার।'

'কিন্তু এটা তো বলো' সেই দুটি মানুষ কে যাদেরকে তুমি কতল করেছো ? আর আমিই বা তোমার কে যে, ওদের রক্ত পণ শোধ করবো ?' – আমর ইবনে আস বললেন কিছুটা হয়রান হয়ে।

'আরবের লোকেরা তো তোমার মতো এতো কম বুদ্ধির হয় না। তুমি তো দুইবার আমার প্রাণ বাচিয়েছো। তৃষ্ণা নামক জন্তুটা তো আমাকে মেরেই ফেলেছিলো। আর যদি একটু দেরী হতো, তুমি আমাকে পানি পান না করাতে, আমি মরে এতক্ষণে অতীত হয়ে যেতাম। তারপর তুমি দ্বিতীয়বার ভয়ংকর বিষধর এক সাপের দংশন থেকে বাঁচিয়েছো। তুমি একটু অসাবধান হয়ে তীর চালালেই সাপটি আমাকে নিশ্চিত ছোবল মারতো। নিদ্রা থেকে জাগার আগেই আমার জন্য সাব্যস্ত হয়ে যেতো চির নিদ্রা। এখন তুমিই বলো, দুটি প্রাণের মূল্য আমার ওপর বর্তায় কি না ?'

আমর ইবনে আস খানিকটা বিব্রত হলেন। একজন মানুষ তো আরেকজন মানুষের চরম বিপদে এগিয়ে আসবেই। এতো তার জীবন মরণপণ দায়িত্ব। একজন সজ্জন ব্যক্তির পক্ষে এ কাজটা পরে বলার মতো এত কৃতিত্বের নয়। এজন্য সে কোন কিছুর প্রাপ্য হবে কেন ? শামমাসকে আমর ইবনে আস ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন।

'হায় আমার আরবী বন্ধু! তুমি জানো কার প্রাণটি বাচিয়েছো ? খোদা আমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন আর এমন প্রতিপত্তি দান করেছেন শাহী খান্দান পর্যন্ত দীর্ঘ আমার বন্ধু মহলের সুতো। ওখানকার হাকিম, আমির-উমারা বড় বড় ঘরানার লোকের সঙ্গে আমার উঠা-বসা। ওদের বিশেষ বিশেষ মজলিসে, পান জলসায় আমাকে বড় উঁচু দৃষ্টিতে দেখা হয়। এ মুহূর্তে আমার সঙ্গে দু' হাজার দীনার থাকলে এখানেই আমি তোমার প্রাপ্য শোধ করে দিতাম। টাকা পয়সা আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাবো। অমত করো না কিন্তু তুমি। আমার প্রতি যখন দুটি অনুগ্রহ করতে পেরেছো আমার প্রতি তৃতীয় অনুগ্রহটিও করো।'

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আস (রা) বিত্তশালী পিতার পুত্র ছিলেন। আসের ব্যবসায়িক পরিধিও ছিলো বিস্তৃত। এজন্য দেশ ভ্রমণে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেন এবং ভ্রমণ বেশ উপভোগও করতেন। ইবনে আসের কাছেও দেশ বিদেশ ভ্রমণও বেশ উপভোগ্য ছিলো তাই শামমাসের মিসর নিয়ে যাওয়ার পীড়াপিড়িতে আমর ইবনে আস (রা) রাজি হয়ে গিয়েছিলেন এক প্রকার। কিন্তু এই আমন্ত্রণ যেহেতু অনুগ্রহের প্রতি বদলার মতো তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছিলেন না।

এছাড়া মিসসের আলেকজান্দ্রিয়ায় কথা তিনি শুনে আসছেন সেই কৈশোরকাল থেকে। কয়েকবার আলেকজান্দ্রিয়ায় যাওয়ার খেয়ালও চেপেছিলো। আমার (রা) তাই আজকের ঘটনার কথা তার সঙ্গীদের জানালেন, আর শামমাসের পীড়াপিড়ির কথাও বললেন।

সহযাত্রী সঙ্গীরাও আমর (রা) কে শামমাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। আমর (রা) কাফেলা থেকে এক সঙ্গীকে বাছাই করলেন। তাকে নিয়ে শামসের ওখানে গিয়ে শামমাসকে জানালেন, তিনি তার ভ্রমণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। শামমাস তো খুশীতে আটখানা।

পর দিন ভোরে আমর (রা) তার সঙ্গীকে নিয়ে শামমাসের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্য। জল ও স্থলের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সফরের তের দিনের মাথায় তারা আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছলো।

আমর ইবনে আস (রা) যখন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের আড়ম্বড়তায় পূর্ণ সাজ-সজ্জার রাজসিক বাহার দেখলেন তিনি তখন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'শামমাস! আমি এমন তিলোত্তমা শহর ও বিত্ত বৈভবের প্রাচূর্যের শৈল্পিক প্রকাশ আর কখনো দেখিনি। সৌন্দর্যের এমন শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথায় আছে আমার জানা নেই।

ঐতিহাসিকরা আলেকজান্দ্রিয়া একটি ঘটনা লিখেছেন যেটা পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে কাকতালীয় একটা পরস্পরা চিহ্নিত হয়। ঘটনাটি এরকম ঃ

সেদিনই আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি উৎসব চলছিলো। এই উৎসবে শুধু সাধারণ শহরবাসীই নয় শাহী খান্দানের লোকজনসহ বড় বড় আমীর উমারাগণও যোগ দিয়ে থাকেন। এতে মল্লযুদ্ধ, তীরান্দাযী, তলোয়ার চালনা, ঘোড় দৌড়সহ নানা ধরনের উপভোগ্য প্রদর্শনী হয়ে থাকে। দর্শকরা অতি মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসে এই উৎসবে।

শামমাস আমর ইবনে আসকে অতি দামী রেশমী কাপড়ের শাহী পোষাক পরিয়ে উৎসবস্থলে নিয়ে গেলো। আমর ইবনে আস লক্ষ্য করলেন, শাহী খান্দান ও রাজ দরবারের লোকদের সঙ্গে শামমাসের বেশ সখ্যতা রয়েছে। তাদের মধ্যে শামমাসের একটা বিশেষ কদর আছে।

বিভিন্ন ধরনের খেলা প্রদর্শনীর পর শুরু হলো অভিনব আরেক প্রদর্শনী। শাহী খান্দান ও অভিজাত মহলের দর্শকরা যেখানে বসে আছে তার সামনে কিছু লোক বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। সেখানেও এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে গোলাকার একটি খেলনার বস্তু। সে সেটা চোখ বন্ধ করে সজোরে ওপরের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে আর সেটা নিচে নেমে আসছে। বার বার সে এভাবে ওপরের দিকে সেটা ছুড়ে মারছে।

শামমাস আমর ইবনে আস (রা) কে জানালেন, প্রতি বছরই আলেকজান্দ্রিয়ায় জাতীয় উৎসব বসে। এতে প্রদর্শনীর এই অংশটা অবশ্যই থাকে যে, এক লোক চোখ বন্ধ করে ঐ গোলাকার জিনিসটি উপরের দিকে ছুড়ে মারে। জনশ্রুতি বা প্রচলিত ধারণা হলো ছুড়ন্ত ঐ গোলাকার বস্তুটি যার বাহুতে গিয়ে পড়বে সে দেশের রাজা-বাদশাহ্ না হয়ে মরবে না।

আমর ইবনে আস (রা) দেখলেন, গোলাকার ঐ খেলনাটি বেশিরভাগই মাটিতে গিয়ে পড়ছে। আর কোন মানুষের ওপর পড়লেও তার বাহুতে পড়ছে না মাথা, কাঁধ, পিঠ বা কোমরের ওপর পড়ছে। শামস যেহেতু এখানে অভিজাত মহলের লোক। তাই সে সামনের সারিতে বসার সুযোগ পায়। আমার ইবনে আসকেও শামমাস তার সঙ্গে বসায়।

খেলা চলছে আর দর্শকরা হৈ হুল্লোড় করে আনন্দ করে নিচ্ছে। হঠাৎ একবার সেই খেলনাটি আমর ইবনে আস (রা) এর বাহুর ওপর গিয়ে পড়লো। চার দিকের অজস্র শব্দ হঠাৎ করে থেমে গেলো। নিস্তব্ধতা ক্রমেই গুঞ্জনের রূপ নিলো। শাহী খান্দানের লোকেরা সব দাঁড়িয়ে গেলো। কার বাহুতে ভবিষ্যৎ সম্রাট চিহ্নিতকারী বস্তুটি পড়েছে তারা তাকে এক নজর দেখতে চাচ্ছে।

শামমাস উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো। এ লোকের নাম আমর ইবনে আস। মক্কা থেকে এসেছে। দর্শকদের মধ্য থেকে বহু কণ্ঠের বিদ্রুপাত্মক অট্টহাসি শোনা গেলো। কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো–

'এসবই ভুল, আরবের এ বুদ্ধু আমাদের বাদশাহ হতে পারে না।'

আরো কয়েকটি চাঁছা ছোলা কণ্ঠ আওয়াজ তুললো–

'না, কখনো হতে পারে না ...... এ বেটে– বামন কখনো মিসরের বাদশাহ হতে পারবে না।'

আমর ইবনে আস (রা) আরবের গড় পড়তা লোকদের মতো দীর্ঘকায় ছিলেন না। সে তুলনায় কিছুটা খর্বাকৃতির ছিলেন। তবে মাথা, হাত ও পা ছিলো বড় বড়। মুখ-চোয়াল ছিলো সুদৃঢ়-শক্ত পোক্ত। আর বুকটা ছিলো প্রাচীরের মতো চওড়া। সুদর্শন যুবকদের মতো এমন তেল সিক্তভাব নেই যে, একবারের দেখাতেই তার প্রতি আকর্ষিক হয়ে উঠবে। তবে তার কালো ভ্রমরের মতো চোখ দুটি ও উজ্জ্বল আভাসিক্ত চেহারায় সব সময় স্ফুটিত থাকে বিপুল প্রাণময়তার সতেজ অভিব্যক্তি। সদা হাস্যময়ী আমর ইবনে আস (রা) চরম রেগে উঠার মতো কথায়ও রাগতেন না।

এখানে বাদশাহ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তখনই তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হবে। বরং ভবিষ্যতে কোন এক সময় সম্রাটের মুকুট তার মাথায় উঠবে। কিন্তু সহস্র কণ্ঠ নানান মন্তব্যে তাদের অপছন্দের কথা জানাতে লাগলো। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথা তো তারা জানে না। স্বয়ং আমর ইবনে আস (রা)ও কল্পনা করেননি তার ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস এমনকি ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে সেদিনের এই ঘটনাটি যুক্ত হয়ে যাবে!

যা হোক, এ বিব্রতকর অবস্থা দেখে সামমাস আমর (রা) এর হাত ধরে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলো। এরপর তিনি সেখানে আরো কয়েকদিন অবস্থান করে ঘুরে ফিরে দেখলেন। বিদায়ের সময় জোর করে আমর ইবনে আসকে দুই হাজার দীনার উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলো। তারপর আমার ইবনে আস ও তার সঙ্গীকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে দিলো। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দূরত্ব পাঁচ শত মাইল।

ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকীম লিখছেন, আমর ইবনে আস (রা) মিসর থেকে তো ফিরে এলেন কিন্তু মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া তার মাথায় এমনভাবে গেঁথে রইলো যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, তার মিসর গিয়ে থাকতে বড় ইচ্ছে করে।

✪ ✪ ✪

ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি যেহেতু এসেছে তাই এখানে ইতিহাস থেকে আমর ইবনে আস (রা) এর অসাধারণ বিচক্ষণতা ও ক্ষিপ্রতার উদাহরণ পেশ করা অসমীচিন হবে না।

মুসলমানদের সঙ্গে তখন চলছিলো রোমকদের যুদ্ধ। পুরো সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ বিশাল ভূখণ্ড তখন রোমকদের দখলে। ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার সিপাহসালার তখন হযরত আমর ইবনে আস (রা)। আর রোমকদের জেনারেল ছিলো 'আতরাবুন' নামের ইতিহাসখ্যাত এক জেনারেল। অনেক ঐতিহাসিক তাকে হেরাকল (হেরাক্লিয়াস) এর সমপর্যায়ের রণচতুর সেনাপতি বলে অভিহিত করেছেন।

আমর ইবনে আস (রা) যখন তার সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা ও ক্লান্তিতে ভঙ্গুর দৈহিক অবস্থার কথা জানিয়ে উমর (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন সেনা সাহায্য চেয়ে। পয়গাম পেয়ে তখন উমর (রা) যথেষ্ট সংখ্যক সেনা সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি জযবাদীপ্ত চ্যালেঞ্জিক মন্তব্য করলেন– 'আমরা রোমের আতরাবুনের বিরুদ্ধে আরবের আতরাবুনকে লাগিয়ে দিলাম। দেখা যাক এখন কি ঘটে।'

আতরাবুন তখন ফিলিস্তিনের 'আজনাদাই' নামক স্থানে তার সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে সেনা সাহায্যও পৌছে গেছে। তখন মুসলিম সৈন্যরা বিভিন্ন শহর ও কেল্লায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। এজন্য সবখানেই মুসলিম সেনাদের তীব্র অভাব-অপ্রতুলতা অনুভূত হচ্ছিলো। তাই আমর ইবনে আস (রা) মদীনা থেকে আসা সেনাদলের পুরো অংশকে নিজের কাছে না রেখে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজের কাছে রেখে অন্যদের ভিন্ন তিনটি চৌকিতে পাঠিয়ে দিলেন।

আমর ইবনে আস (রা) যখন তার ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হলেন তখন অতরাবুন কেল্লাবন্দী হয়ে গেছে। তিনি গিয়ে দেখলেন, আতরাবুন শুধু কেল্লাবন্দীই হয়নি। কেল্লার চারপাশে পরিখা খনন করে রেখেছে। এ কেল্লা অবরোধ মূলত অতি মূল্যবান সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কোন কিছু নয়। পথ একটাই আছে। আতরাবুনকে ধোকা দেয়া।

আমর (রা) আতরাবুনের কাছে এক সন্ধি-দূত পাঠালেন। জানা কথা আতরাবুন সন্ধি প্রস্তাব মানবে না। লাভ যা হবে তা হলো, দূতবেশী সেই লোক কেল্লার তেতরটা ভালো করে দেখে আসতে পারবে। সে অনুযায়ী আমর (রা) তাকে কিছু দিক নির্দেশনাও দিয়ে দিলেন।

দূতবেশী সেই গুপ্তচর যখন ফিরে এলো আমর (রা) তার কাছে যা জানতে চাইলেন সে তার সঠিক উত্তর দিতে পারলো না। বরং স্পষ্ট বুঝা গেলো

আতরাবুনকে দেখে এরা ভয় পেয়ে গেছে এবং আসল কাজটি করে আসতে পারেনি।

আমর ইবনে আস (রা) তার সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, দ্মবেশ ধরে তিনি আতরাবুনের কাছে সন্ধিদূত হয়ে যাবেন। তিনি এও বললেন, আতরাবুন যদি তাকে সিপাহসালার হিসেবে সামান্য সন্দেহ করে তাহলে হয় তাকে সে হত্যা করবে না হয় কালো কুঠুরীতে বন্দী করে রাখবে।

আমর ইবনে আস (রা) কেল্লার দরজায় গিয়ে বললেন, তাকে মুসলিম সিপাহসালার সন্ধি দূত করে আতরাবুনের কাছে পাঠিয়েছেন। আতরাবুন সংবাদ পেয়েই তাকে ডেকে পাঠালো। একজন দূতকে যতটা সম্মান দেয়া হয় তাকেও ততটুকু সম্মানই দিলো আতরাবুন।

তারপর সন্ধির আলোচনা শুরু হলো যথারীতি। আমর (রা) জানতেন, আতরাবুন অত্যন্ত চৌকষ এক জেনারেল। কিন্তু আতরাবুনের চোখের দৃষ্টিতে যে কতটুকু ধুরন্দরতা ও গভীরতা আছে সেটা তো তিনি জানতেন না। কথায় কথায় আমর ইবনে আস (রা)-এর যে কোন একটি কথায় আতরাবুন চমকে উঠলো। তারপর বলে উঠলো স্মিত হাস্যে–

'আমার দৃষ্টি কখনো আমাকে ধোকা দেয়নি। আমার মনে হয় আমি সাধারণ কোন সন্ধিদূতের সঙ্গে কথা বলছি না। আমি এক সিপাহসালারের সঙ্গে কথা বলছি......... তুমি কি আমার ইবনে আস নও ?'

'না– আমর (রা) দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন– আমি যদি আমর ইবনে আস হতাম নিজের ওপর মিথ্যার পর্দা ফেলতাম না। আমাদের সিপাহসালার এতই নির্ভীক ও দুঃসাহসী যে, তার মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় না।'

আতরাবুন একথায় এমন অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে উঠলো যেন আমর ইবনে আস (রা)-এর কথা মেনে নিয়েছে এবং তাকে সত্যিই সন্ধিদূত মনে করছে। তবে আমর (রা) বুঝে গেলেন যে, তার ব্যাপারে আতরাবুনের সন্দেহ দূর তো হয়ইনি বরং আরো দৃঢ় হয়েছে। তিনি এখান থেকে বের হওয়া কৌশল খুঁজতে লাগলেন।

একবার আতরাবুন কথার ফাঁকে এক অজুহাতে কামরার বাইরে বের হয়ে খুব দ্রুত আবার ফিরে এলো। আমর (রা) নিশ্চিত হয়ে গেলেন। আতরাবুন তার ভাগ্যের ফয়সালা করে এসেছে। আসলে আতরাবুন তার বিশ্বস্ত এক মুহাফিজকে

বলে আসে যে, এই আরবী ব্যক্তি যখন বাইরে বের হবে তখন এক কোপে তার দেহ থেকে মাথাটি আলাদা করে ফেলবে।

আমর ইবনে আস (রা) এবার তার কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেললেন। এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি রোমীয়দের যুদ্ধ শক্তিকে বেশ ভয় পাচ্ছেন এবং যে কোন শর্তই দেবে তা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন। আমর (রা) এর এই নিখুঁত অভিনয়ে আতরাবুন বেশ প্রভাবন্বিত হলো।

'আমি এখন আমার আসল পরিচয় তুলে ধরছি– আমর (রা) আতরাবুনের মুখের রূক্ষভাবে পরিবর্তন হতে দেখে বললেন– আমি সিপাহসালার আমর ইবনে আসের পাঠানো দূত নই। বরং আমাদের দশজনকে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) পাঠিয়েছেন আপনার সঙ্গে সন্ধি বিষয়ে আলোচনা করতে। আমাদের প্রতি হুকুম হলো, গ্রহণযোগ্য যে কোন শর্ত যেন আমরা মেনে নিই। আমরা মদীনা থেকে সরাসরি আপনার কাছে এসেছি। আমর ইবনে আসের কোন সম্পর্ক নেই এর সঙ্গে, আমি আপনার শর্ত শুনলাম। আমার বাকি নয় সঙ্গী কেল্লা থেকে একটু দূরে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আপনি চাইলে আমি ওদেরকে এখানে নিয়ে আসবো। অথবা আপনি চাইলে আমি ওদেরকে আপনার শর্তগুলোর কথা জানাবো। তারপর আমরা এখানেই ফয়সালা করে আপনাকে বলবো। আশা করি আমার সঙ্গীরা আপনার শর্ত মেনে নেবে।'

'এতো আরো ভালো– আতরাবুন বললো– সবচেয়ে ভালো হয় তুমি ওদেরকে এখানে নিয়ে আসলে।'

এর মধ্যে আতরাবুন আরেক অজুহাতে কামরার বাইরে গিয়ে একজনকে নির্দেশ দেয়, অমুক জায়গায় অমুক মুহাফিজ দাঁড়িয়েছে। তাকে গিয়ে বলো, পূর্বের হুকুম প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমর ইবনে আস (রা) নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। কেল্লার দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আতরাবুন অপেক্ষা করার পর বললো,

'এই আরব সিপাহসালার আমাকে ধোকা দিয়ে জীবিত বের হয়ে গেলো। আমি এ লোকের মতো এমন ধুরন্ধর লোক দেখিনি।'

তারপর দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। উভয় পক্ষেরই অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আর আতরাবুন তার বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের নিয়ে চলে গেলো বায়তুল মুকাদ্দাস। সেখানে গিয়ে কেল্লাবাসী হয়ে গেলো। আমর (রা) আর দু'জন সালার

নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন। একদিন আতরাবুনের এক দূত তার কাছে এ মর্মে পয়গাম নিয়ে এলো যে,

'তুমি আমার বন্ধু। তোমার কওম তোমাকে সে মর্যাদাই দিয়েছে সে মর্যাদা আমার কওম আমাকে দিয়েছে। আমি তোমাকে কোন ধোকায় রাখতে চাই না। যদিও তোমরা আজনাদাইন দখল করে নিয়েছো কিন্তু এই ভুল ভাবনায় থেকো না যে, ফিলিস্তিনের আর কোথাও তোমরা বিজয় লাভ করতে পারবে। তাই উচিত হলো, তোমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া এবং ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো। যদি আমার কথা না শোনো তাহলে তোমাদের পরিনাম তাদের মত হবে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করতে এসে আর জীবিত ফিরে যায়নি।'

আমার ইবনে (রা) আস জবাবী পয়গাম সেই দূতের হাতেই দিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন, 'আমি ফিলিস্তিন বিজয়ী মুজাহিদ! আমি তোমাকে বন্ধুত্বমূলক পরামর্শ দিচ্ছি। তুমি তোমার জ্ঞানবান দূরদর্শী উপদেষ্টাদের সঙ্গে মত বিনিময় করো। ওরা তোমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার কোন বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে পারে।'

আতরাবুন এই পয়গাম পড়ে হো হো করে হেসে নিজেই তার উপদেষ্টা ও অন্যান্য ও ফৌজি অফিসারদের মজলিসে এই পয়গাম নিজেই পড়ে শুনিয়ে বললো, আমর ইবনে আস বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ী হতেই পারে না। এমনভাবে আতরাবুন কথাটি বললো যে সবাই চমকে উঠলো, তাহলে বায়তুল মুকাদ্দাস অবশ্যই বিজিত হবে। তবে এর বিজেতা আমর ইবনে আস নয় ; অন্য কেউ। তাই তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো। আপনি এত নিশ্চিত হয়ে একথা কেন বলছেন ?

'বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজেতার নাম 'উমর' (রা) – আতরাবুন এক দূর্লভ তথ্য শোনালো– কারণ, তাওরাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজেতার নাম শুধু তিন অক্ষরে লিখেছে উমর ....... আমর লেখা নেই সেখানে। তারপর উমরের বিভিন্ন গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাওরাতে স্পষ্ট করে লিখেছে, বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের দখলে চলে যাবে।'

✪ ✪ ✪

আমর ইবনুল আসের মিসর যাওয়া নিয়ে যেহেতু কথা উঠেছে তাই কথা উঠতে পারে মিসরে তখন কার শাসন চলতো? মিসরে তখন রোমকদের শাসন চলতো। শাসক ছিলেন হেরাক্লিয়াস। কিন্তু হেরাক্লিয়াস তো থাকতেন সিরিয়ায়। আর মিসরসহ আশপাশের পুরো এলাকার দখল ছিলো রোমকদের হাতে। তাহলে হেরাক্লিয়াস মিসর গেলেন কিভাবে ? হেরাক্লিয়াস স্বেচ্ছায় মিসর যাননি। মুসলমানরা তাকে সিরিয়া ছেড়ে মিসর যেতে বাধ্য করেছিল।

তদানিন্তনবিশ্ব শাসন করতো দুই পরাশক্তি– পারসিক ও রোমকরা। তাই এদের মধ্যে সব সময় শক্তির সংঘাত লেগেই থাকতো। ওদের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিলো মিসর ও এর আশপাশের ভূখণ্ড। তাই কখনো পারসিকরা মিসর ও সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করে নিতো। আবার কখনো রোমকরা তাদেরকে পরাজিত করে নিজেদের এলাকা ছিনিয়ে নিতো।

এ দুই পরাশক্তির কল্পনার জগতে কখনো এ ভাবনা উদয় হয়নি যে, দিগন্তের নীলিমা থেকে তৃতীয় আরেকটি শক্তি জেগে উঠবে। যারা তাদের শক্তির দম্ভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে।

আরবদেরকে ওরা জাহেল, গোঁয়ার ও আস্তাকুড়ের পুতি গন্ধময় নোংরার চেয়েও অস্পৃশ্য মনে করতো। কিন্তু সেই আরবেরই এক পর্বত গুহা থেকে সারা দুনিয়াময় পরিব্যাপ্ত আলোর এক মিছিল বেরোলো। জন্ম নিলো আরেক পরাশক্তির। কিন্তু এ তৃতীয় শক্তি অন্য দুই শক্তির মতো শুধু যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিই নির্ভরতা ছিলো না। বরং এক মহান আকীদা ও অসীম বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এ শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল। পারসিক ও রোমকদের বিশাল বিশাল শক্তিধর বাহিনীও এ নতুন বিশ্বাসধারীদের গুটি কয়েক লোকের সামনে টিকতে পারেনি।

ইতিহাসের অনন্ত বিস্ময় যে, যে রোমকরা প্রবল শক্তিধর ইরানীদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল সেই রোমকরা কি করে মুষ্টিময় কয়েকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। ঐতিহাসিকরা এজন্য মুসলমানদের রণ নিপুণতা, সমর কৌশল, জযবা, সিপাহসালারদের নেতৃত্ব ও যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতার প্রশংসা করেছে। কিন্তু একটি দিক তাদের মোটা চোখে ধরা পড়েনি। অবশ্য সে অন্তর্দৃষ্টি তাদের থাকারও কথা নয়। এর জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

✪ ✪ ✪

রোমের একটি অতি মজবুত কেল্লা কুনসীরীন। এ কেল্লা এলাকায় জাবালা বিন আইহাম নামে এক লোক থাকে। বিশাল ধনসম্পদের মালিক এই জাবলা বিন আইহাম। সে তার এলাকায় ছোটখাট একটি বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করে। তার গোত্র গাসসানও তার এলাকার বাদশাহ বনে যায়। তার এ ছোটখাট বাদাহশী ঠিক রাখার জন্য রোমকদের সঙ্গে সব সময় সখ্যতা বজায় রাখে সে তবে রোমানরা মুসলমানদেরকে যেমন চিরশত্রু মনে করে, সে মুসলমানদের প্রতি এতটা কঠোর মনোভাবের ছিল না।

চালচলনে সে ছিল খুব সৌখিন মেজাজের। কবিতা শোনা কবিতার জলসা বসানো এসব সে দারুন পছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ (স) এর অতি প্রিয় কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা) এর একজন অন্ধভক্ত ছিল সে। তার কবিতার বিমোহিত শব্দ শুনে জাবালা উম্মাতাল হয়ে পড়ে।

রোমকরা এবং হেরাক্লিয়াস যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পালালো জাবালা তখন মুসলমান হয়ে যাওয়াটাই সুবিধা মনে করলো। সে এলাকায় নিয়োজিত মুসলিম লশকরের সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালো তার গাসসান গোত্রসহ সে মুসলমান হয়ে যাবে। আবু উবাইদা (রা) এর চোখে ছিলো এটা ছিলো এক বিশাল বিজয়। তিনি কয়েকজন মুবাল্লিগ তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জাবলা বিন আইহাম পুরো গোত্রসহ মুসলমান হয়ে গেলো। এ সংবাদ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর কাছে পৌছলে তিনি আনন্দে এতই অভিভূত হলেন যে, তার চোখ দিয়ে পানি এসে গেলো।

মুসলমান হওয়ার পর জাবালার প্রিয় কবি হাসসান (রা) এর মাতৃভূমি আরবের মরু মাটি দেখার খুব ইচ্ছা জাগলো। সে আমীরুল মুমিনীনের কাছে দূত পাঠালো, সে আরব সফরে আসতে চায় এবং হজ্জও আদায় করতে চায়। উমর (রা) তাকে এজাযত দিয়ে দিলেন। হযরত উমর (রা) ভাবলেন, জাবালা যে ধরনের লোক, সে হজ্জ করার পর খাটি মুসলমান হয়ে যাবে এবং তার গোত্র ইসলামের একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

জাবালা একদিন পাঁচ'শ সওয়ার নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে পৌছলো। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল শাহী খান্দানের আর বাকীরা তার কাবীলা গাসসানের। আমীরুল মুমিনীন খবর পেয়ে লোকদের নির্দেশ দিলেন জাবালা বিন আইহাম ও তার সঙ্গীদের যেন পুর্ণ মর্যাদায় স্বাগত জানানো হয়। লোকেরা পথে বেরিয়ে গেলো।

আর পথের দু ধারে বাড়ির ছাদে ছাদে শিশু ও মহিলারা ভিড় জমিয়ে এই কাফেলাকে দেখতে লাগলো।

শহরে প্রবেশের আগে জাবালা তার দুইশ লোককে এক বিশেষ ধরনের শাহী পোষাক পরতে বললো। সেগুলো ছিলো অতি দামী রেশমের তৈরী। ওরা যখন সেই পোশাক পরলো। তাদের একেকজনকে বাদশাহ্‌ বা শাহাজাদার মতো লাগছিলো। দর্শকরা হয়রান হয়ে গেলো। সবাই বড় বড় চোখ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। এমন মূল্যবান পোশাক তারা এর আগে আর দেখেনি। আর জাবালার পোশাক তো ছিলো আরো জলমলে– বিচিত্র বর্ণের। সে মাথায় মুকুট পরে রেখেছিলো। তাকে দেখে তো দর্শকরা শব্দ পর্যন্ত করতে ভুলে গেলো। সবাই এজন্য আরো বিস্মিত হলো যে, এরা মুসলমান হলেও এই শাহী মেজায এখনো ছাড়েনি।

জাবালা প্রথমেই আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষাতে চলে গেলো। উমর (রা) তাকে আলিঙ্গন করে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালেন যে, সে ও তার কবীলা আল্লাহর সত্য দীন কবুল করে নিয়েছে। এখন আর কোন শক্তি তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

জাবালা তার পাঁচশ লোকের কাফেলার থাকার জন্য অত্যন্ত দামী ও কারুকার্য খচিত তাঁবু নিয়ে এসেছিল। উমর (রা) তাদেরকে খুব ভালো একটি জায়গা দিয়ে দিলেন। সেখানে তারা সারিবদ্ধভাবে তাঁবু স্থাপন করে। জায়গাটি শহরের বাইরে হওয়ায় মনে হচ্ছিলো এ এক বিশাল তাঁবু পল্লী।

হজ্জের সময় ঘনিয়ে এলে উমর (রা) তাকে নিয়ে হজ্জ আদায় করতে মক্কায় পৌঁছেন। জাবালা তার সঙ্গে কাফেলার মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে যায়। বাকী সবাইকে রেখে যায় মদীনায়। হজ্জের জন্য জাবালা যে ইহরাম বাঁধে সেটা তার টাখনুর নিচে চলে যায়। এজন্য তাওয়াফের সময় এক লোকের পা গিয়ে পড়ে জাবলার ইহরামের ওপর। তার ইহরাম খুলে যায় এতে। যেমনই হোক জাবলার দেহে তো বাদশাহী রক্ত। সে এটাকে নিজের অপদস্থতা মনে করলো এবং পেছন ফিরে সে লোকটির নাকে একটি ঘুষি মেরে বসলো। এতে লোকটির নাক রক্তাক্ত হয়ে গেলো।

হযরত উমর (রা) ঘটনা জানতে পেরে প্রথমে আহত লোকটিকে ডেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করলেন। লোকটি নিজেই অভিযোগ করলো, জাবালা তাকে ঘুষি মেরে রক্তাক্ত করে দেয়ায় সে তাওয়াফ পূর্ণ করতে পারেনি। এ

অভিযোগের পর উমর (রা) এর রূপ পাল্টে গেলো। তিনি আর এখন জাবালার মেযবান নন; খলীফার রূপে ফিরে এলেন তিনি। তার হাতে এখন ন্যায় বিচারের মানদন্ড উঠে এসেছে। জাবালাকে তিনি তলব করালেন। জাবলা সেখানে পৌঁছলো শাহী ভঙ্গিমায় এবং উমর (রা) এর পাশে বসতে গেলো। অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ মেহমানকে খলীফা এ সম্মান দিতেন। জাবলাকেও তিনি এ সম্মান দিয়েছিলেন।

'তুমি এখানে নয় সামনে গিয়ে বসো। তুমি এখন আমার মেহমান নও। অপরাধী'– উমর (রা) জাবালাকে তার পাশ থেকে উঠাতে উঠাতে বললেন।

জাবালা কিছুটা ক্ষুব্ধ কিছুটা হয়রান হয়ে এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় উমর (রা) এর সামনে গিয়ে বসলো।

'জাবালা বিন আইহাম! তুমি কি এই লোকের নাকের ওপর ঘুষি মেরেছো?'– উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, আমি ওর নাকের ওপর ঘুষি মেরেছি। কারণ, সে আমার ইহরামের ওপর পা রেখেছিলো– জাবালা বললো।

'সে বলেছে, তার পা তোমার ইহরামে ভুলবশত লেগেছে। তাওয়াফের সময় এমন হয়েই থাকে। সে যদি ইচ্ছে করেও তোমার ইহরামে পা দিয়ে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? তুমি ওকে ওর এই আচরণের কারণ কেন জিজ্ঞেস করে নিলে না?'– উমর (রা) বললেন।

'এখানে তো এই লোককে শুধু ঘুষি মেরেছি। আমার এলাকায় হলে ওকে এমন শাস্তি দিতাম যে, অন্যদের জন্য তা হতো অত্যন্ত ভয়ংকর দৃষ্টান্ত।

'সেখানে তোমার আইন চলতো। কিন্তু তুমি এখন ইসলাম গ্রহণ করেছো। এর অর্থ হলো, ইসলামের ন্যায় বিচারের আইন মেনে নিয়েছো। ইসলামী আইন অনুযায়ী তোমাকে এর শাস্তি পেতে হবে– উমর (রা) বললেন।

'আমি আপনাকে আমীরুল মুমিনীন মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি আপনি কেমন আমীরুল মুমিনীন যে, ছোট বড়র মধ্যে পার্থক্যও বুঝেন না। আমি আমার এলাকার বাদশাহ আর এ লোক সাধারণ একজন নাগরিক। এটা কি আমার জন্য অপমানজনক নয় যে, আমাকে সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসিয়েছেন এবং আমার সঙ্গে আচরণ করছেন এক আসামীর মতো।

'ইসলাম তোমাদের উভয়ের অবস্থান এক করে দিয়েছে। শুধু ইবাদত ও তাকওয়ার কারণেই কেউ কারো ওপর মর্যাদাবান হতে পারে। ধনসম্পদ ও

রাজত্ব ছোট বড় হওয়ার মানদণ্ড এ নীতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এক মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন.... তোমার এক অপরাধ হলো তুমি কাবার সামনে বেয়াদবী করেছো। দ্বিতীয় অপরাধ হলো এক লোককে মেরে তুমি রক্তাক্ত করেছো। যে কারণে সে তাওয়াফ পুর্ণ করতে পারেনি– উমর (রা) বললেন।

'মনে হচ্ছে আমি কোন ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। আমি তো ভেবেছি মুসলমানরা তেমন ধনী বা আমীর শ্রেণীর সম্প্রদায় নয়। এখানে অধিকাংশই গরিব। এ কারণে এখানে আমার সম্মান মিলবে অনেক– জাবালা বললো।

'সম্মান চাইলে পথ একটাই আছে। তুমি এ লোকের কাছে মাফ চাও। সে তোমাকে মাফ করে দিলে আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবো না।'

'তাহলে কি ইসলাম ছেড়ে আমার খ্রিস্টান ধর্মে চলে যাওয়াটাই ভালো না এর চেয়ে? ওরা তো কখনো আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেনি।

'আমি তোমাকে ইসলামের এ বিধানও শুনিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি শাস্তি এড়ানোর জন্য যদি ধর্মত্যাগী হও তাহলে তোমাকে হত্যার হুকুম দেয়া হবে– উমর (রা) বললেন।

'তাহলে এটাও ভেবে দেখুন আমীরুল মুমিনীন– জাবালা ঔদ্ধত সুরে বললো– আমার সঙ্গে আপনি এমন আচরণ করলে আমার ও আমার এত বড় কবীলার বন্ধুত্ব থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। আমার কবীলা এতই ধনবান যে, হীরা জহরাতের পালংকে তারা ঘুমায়। তাছাড়া এরা বিরাট এক যুদ্ধ শক্তিও। এত বড় ক্ষতি কি আপনি মেনে নেবেন?'

'আমরা শুধু ইসলামের ক্ষতি মানতে পারবো না। আমাদের ধনসম্পদ স্ত্রী সন্তান এবং নিজেদের প্রাণও ইসলামের জন্য বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবো না। আমাদের বন্ধুত্ব তো শুধু আল্লাহর সঙ্গে... এ ব্যাপারে আমি আর বেশি কথা বলতে চাই না। ওর কাছে মাফ চাও। সে মাফ করে দিলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে– উমর (রা) বললেন দৃঢ় গলায়।

জাবালা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো।

'আমীরুল মুমিনীন! আমাকে একটি রাতের সুযোগ দিন। সকাল হলে আমি বলবো, আমি ওর কাছে মাফ চাইবো না শাস্তি মাথা পেতে নেবো?– জাবালা অবশেষে মাথা উঠিয়ে বললো।

উমর (রা) এটা মেনে নিলেন এবং তাকে তার তাঁবুতে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ব্যাপারটা এতই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিলো যে, উমর (রা) যখন বাইরে বের হলেন, দেখলেন লোকজনের বড়সড় একটা ভিড়। সবাই ন্যায় বিচারের দাবী তুলছিলো। ফয়সালা কাল হবে এই বলে তাদেরকে শান্ত করা হলো।

পরদিন সকালে জাবালা বিচার মজলিসে এলো না। ফজরের নামাজেও তাকে দেখা গেলো না। শেষ পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন হুকুম দিলেন জাবালাকে ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু জাবালাকে তার তাঁবুতে পাওয়া গেলো না। তাবু খালি পড়েছিলো। জাবালা ও তার সঙ্গীদের ঘোড়াগুলোও পাওয়া গেলো না।

তাদের পিছু ধাওয়া করাটাও এখন অর্থহীন। কারণ পালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এক রাতেরও বেশি সময় পেয়েছে। জাবালা খুব দ্রুত মদীনায় পৌঁছে তার কাবীলার লোকদের নিয়ে মদীনা থেকে পালিয়ে যায়।

হেরাক্লিয়াস তখন কস্তুন্তুনিয়ায় ছিলো। জাবালা তার কাছে গিয়ে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়। হেরাক্লিয়াস তাকে ক্ষমা করে দিয়ে আরো কিছু জায়গীর দান করেন।

সবার জন্য সমান বিচার- সবার জন্য সমান মর্যাদা- ইসলামের এই একটি বৈশিষ্ট্যের কারণেই মুসলমানরা একের পর এক জয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলো।

✪ ✪ ✪

হেরাক্লিয়াস নিজের শক্তিমত্তার ওপর এতই আস্থাবান ছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন কখনো তার পতন হবে না এবং রোমের সালতানাত ক্রমে আরো বিস্তৃতি লাভ করবে। কিন্তু মুসলমানরা তার জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো, তিনি পিছু হটতে হটতে যে শহরেই পৌঁছতেন সেখানেই মুসলমানরা পৌঁছে যেতো এবং শহর অবরোধ করতো। শেষ পর্যন্ত তিনি ছোট একটি শহর 'রাহায়' গিয়ে আশ্রয় নেন। তার আশা ছিলো তার বিক্ষিপ্ত ফৌজকে একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমে মোকাবেলা করা যাবে। এতে হয়তো মুসলমানদের পরাজিত করা সহজ হবে। কিন্তু যেখানেই তার পয়গাম পৌঁছতো সেখান থেকেই তার জন্য হতাশার জবাব আসতো।

রাহাতে হেরাক্লিয়াস এর সঙ্গে তার পুরো শাহী খান্দানও অবস্থান করতে থাকে। তার দুই যুবতী মেয়েসহ তার অসংখ্য স্ত্রীও তার সঙ্গে ছিলো। এছাড়াও তার সব শাহী আসবাবপত্র তো সব সময় তার সঙ্গেই থাকতো। এ অবস্থাতেও তিনি ফেরআউনী চরিত্রের বাদশাহ ছিলেন। হেরাক্লিয়াস সবসময় নিজের সঙ্গে জ্যোতিষী রাখতেন। প্রতিটা কদম উঠানোর আগে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করে নিতেন, এজন্য কোনদিন কোন সময় উপযুক্ত। রাহাতে তিনি একদিন তার শাহী দরবার বসালেন এবং জ্যোতিষীকে উপস্থিত করার হুকুম দিলেন। জ্যোতিষী খবর পেয়ে এই ভেবে দৌড়ে এলো যে, এখন তাকে কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবে আর সে ভবিষ্যদ্বাণী করে নগদ কিছু পুরস্কার পেয়ে যাবে। কিন্তু হেরাক্লিয়াস এর চোখ ততদিনে খুলে গেছে।

হে জ্যোতিষী! এখন বলো, তোমার নক্ষত্রের গণণা কি বলে ?'– হেরাক্ল্ শাহী গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি সব সময় আমাকে বলেছো এখন এই কারণে এই হবে এবং মুসলমানরা অন্ধ হয়ে পালিয়ে যাবে। আমাকে কেন বললে না, আমার ভাগ্যে এই লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়ানোই লেখা আছে এবং কোথাও আমার আশ্রয় হবে না। .... এখনি আমি এর জবাব চাই।'

সেই জ্যোতিষী বা গণক তার গণকী ভাষায় হেরাক্লিয়াসকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, তার এসব ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সে দায়ী নয় বরং সূর্য ও নক্ষত্রের আবর্তনীয় ভুল নির্দেশনাই দায়ী।

'তোমার একটি কথাও আমার বুঝে আসছে না'– হেরাক্লিয়াস বললেন– তুমি কেন আমাকে বললে না, আমার নিজের সালতানাতেই পালিয়ে বেড়ানো আমার ভাগ্যলিপিতে রয়েছে। এ সত্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমি যেভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছি সেভাবে তোমার ঐ গণকী নক্ষত্ররাও কক্ষ পথে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আরেকটা সত্য বুঝতে পারছি যে, আমাকে ধোকা দিয়ে দিয়ে এবং আত্মতৃপ্তিতে ডুবিয়ে রেখে তুমি অর্থের পাহাড় গড়ে নিয়েছো।

জ্যোতিষী হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। হেরাক্লিয়াস এক ঝটকায় উঠে ধীরে ধীরে হেটে জ্যোতিষীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুরো দরবারে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। হেরাক্লিয়াস আচমকা তার কোমরে ঝুলানো খঞ্জরটি কোষ থেকে বের করেই জ্যোতিষীর পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। জ্যোতিষী দু' এক কদম পিছু হটে মাটিতে আছড়ে পড়লো। হেরাক্লিয়াস তার খঞ্জরটি এক দিকে ছুড়ে মারলেন। এর অর্থ হলো খঞ্জর

পরিষ্কার করে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হোক।'

'শাহে মারদীনকে নিয়ে এসো। আজ আমি এদের উভয়ের ভাগ্যের ফয়সালা করতে চাই। যারা আমার ভাগ্যকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ধ্বংসের দারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে– হেরাক্লিয়াস তার সিংহাসনে বসতে বসতে হুকুম দিলেন।

ততক্ষণে নিহত জ্যোতিষীকে কয়েকজন উঠিয়ে নিয়ে গেলো। একটু পরই হেরাক্লিয়াস এর বয়সী প্রৌঢ় এক লোককে আনা হলো। সব দরবারীর দৃষ্টি এখন তার দিকে। সবার দৃষ্টিই তার জন্য করুণার্ত। একমাত্র হেরাক্লিয়াস এর চোখেই কোন করুণার ছায়া ছিলো না। হেরাক্লিয়াস প্রতিটি লড়াইয়ে নামার আগে এর কাছ থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিক নির্দেশনা নিয়ে নিতেন। আর হেরাক্লিয়াস একে দিয়েছিলেন শাহী জ্যোতিষীর মর্যাদা।

'হে আমার ভাগ্য নির্ধারণকারী জ্যোতিষী! আজ তোমার ভাগ্যে কি আছে তুমি কি বলতে পারবে ?– হেরাক্লিয়াস শাহ মারদীনকে জিজ্ঞেস করলেন।

'সেটাই , যা আমি চেয়েছি– শাহ মারদীন বললেন – আজ যখন আমাকে মৃত্যুর দহলীজে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে তখন আর আমার সত্য বলতে কোন দ্বিধা নেই। হে রোমের প্রতাপশালী বাদশাহ! যখনই তুমি আমাকে ভাগ্য যাচাই করতে বলতে আমি তাই লিখে দিতাম যা তোমার প্রবৃত্তি চাইতো। আমি তোমাকে আত্মতৃপ্তিতে রাখতাম। আর গান গেয়ে যেতাম তুমি মানুষ নও তুমি এক দেবতা। তোমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।'

'এর অর্থ তুমি আমাকে ধোকা দিয়ে দিয়ে অর্থকড়ি ও ইনআম হাতিয়ে নিয়েছো। তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে তোমাকে শাহী মর্যাদা দেয়া হয়েছে আর তোমার পেছনে রাজকোষ লুটানো হয়েছে। তুমি সেই সম্পদ আর মর্যাদার লোভে আমাকে ধোকা দিয়ে এসেছো।'

'অর্থ সম্পদের জন্য নয়...... প্রতিশোধের জন্য..... আমি তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। তোমাকে এমন অবস্থানে পৌছে দিয়েছি যেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব নয় এবং তুমি সালতানাতে রোমে বাদশাহীর জন্য আর যেতে পারবে না।'

'প্রতিশোধ! কিসের প্রতিশোধ ? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি– হেরাক্লিয়াস হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, প্রতিশোধ – শাহে মারদীন নির্ভীক কণ্ঠে বললেন– সাতাশ আটাশ বছর আগের একটি দিনের কথা স্মরণ করো.. অবশ্য তোমার এত সহজে মনে

পড়বে না। কারণ তোমার শাহানা যিন্দেগীর প্রতিটি দিনই এমন কেটেছে... তুমি বড় সড় এক দল নিয়ে এক বনে শিকার করতে গিয়েছিলে। আমি আমার ছোট বোন নিয়ে সেই বন পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম।খুব রূপবতী ছিলো আমার বোনটি। বোনটিকে অসম্ভব ভালোবাসতাম আমি। তোমার দুই মুহাফিজ অমার বোনকে দেখে ফেললো এবং তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। অমি ওদেরকে বাঁধা দিলে আমাকে মেরে কেটে বললো, বাদশাহ হেরাক্লিয়াস এর জন্য এ ধরনের সুন্দরী মেয়ে খুব প্রয়োজন। দু' তিন দিন তিনি জঙ্গলে থাকবেন। ওরা আমার আর্তনাদ ও বিলাপে জর্জিত বোনকে তোমার কাছে নিয়ে গেলো। তোমার দরবারে আমি আসতে চাইলাম। আমাকে আসতে দিলো না কেউ ........

আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। যখন তুমি তাঁবু থেকে শিকারে যাওয়ার জন্য বের হলে আমি তোমার পায়ের ওপর গিয়ে পড়লাম এবং আমার বোনকে ভিক্ষা চাইলাম। আমাকে তুমি তোমার পা দিয়ে সজোরে লাথি মারলে এবং হুকুম দিলে, ওকে দূরে কোথাও ফেলে আসো। তোমার লোকেরা আমাকে পশুর মতো মেরে অনেক দূরে নিয়ে ফেলে আসলো। ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে আমি সেখানেই পড়ে রইলাম। শিকার থেকে তুমি চলে গেলে পরে আমি তোমার তাঁবু পল্লীতে গেলাম। সেখানে আমার বোনের উলঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত লাশ পড়েছিলো....

তখনই আমি শপথ করলাম এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। আমার বাবা গণক ও জ্যোতিষি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পয়সা নিয়ে লোকদের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। আমাকেও তিনি এ বিদ্যা শিক্ষা দেন। কিন্তু এর প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিলো না। আমার বাবা এই দুঃখ নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তারপর যখন তোমার বদলা নেয়ার সংকল্প করলাম নতুন একটি বুদ্ধি এলো মাথায় তখন....

বাবার কারণে লোকদের কাছে আমি বেশ সম্মানের পাত্র ছিলাম। তাই আমি এলাকায় ছড়িয়ে দিলাম, আমি আমার বাবার গদিতে বসে গেছি এবং গণকী ও জ্যোতিষীর কাজ শুরু করে দিয়েছি। এ বিষয়ে আমি আমার বাবার মতো পারদর্শী ছিলাম না। তাই কিছু কৌশল ও ধোকাবাজি শিখে নিলাম। এর ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমি বসে গেলাম খ্যাতির চেয়ারে। এক সময় তোমার মহল পর্যন্ত আমার নাম পৌঁছে গেলো। তারপর আমাকে মহলে শাহী জ্যোতিষী করে রেখে দেয়া হলো। আর আমি শুরু করলাম বদলা নেয়া।'

হেরাক্‌ল্‌ অত্যন্ত হিংস্র মেজাজের শাসক ও জেনারেল ছিলেন। তাই দরবারীদের উৎকণ্ঠা ক্রমেই এই উত্তেজনায় রূপ নিতে লাগলো যে, এই বুঝি হেরাক্‌ল্‌ উঠে শাহে মারদীনের পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! হেরাক্‌ল্‌ তার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইলো। দরবারে কয়েকজন শাহজাদী ও কানিয ছিলো। তারা শাহে মারদীনের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো।

'হে হেরাক্‌ল্‌! – শাহে শারদীন বলে গেলেন– নিজেকে আর দেবতা মনে করো না। আর এটাও ভুলে যাও যে, প্রজাদের মেয়ে বা বোনেরা তোমার দাসী-রক্ষিতা এবং সবাই তোমার গোলাম। আজ তুমি তোমার পাপেরই শাস্তি পাচ্ছো। তোমাকে আমি বড়ই আকর্ষণীয় তেলেসমাতী জ্যোতিষপত্র দিয়ে বশ করে আমার বোনের বেইজ্জতীর বদলা নিয়েছি। আরেকটি কাজ করেছি, এই মাত্র যে জ্যোতিষীকে তুমি হত্যা করেছো ওকেও আমার দলে ভিড়িয়ে নিয়েছি। আমি যে ধন দৌলত পেতাম তার অর্ধেক তাকে দিতাম। তাই সেও তোমাকে ধ্বংসমুখী সব ভবিষৎদ্বাণী শোনাতো। আজ নিজেই নিজের পরিণতি দেখে নাও .....

আমি জানি আজ আমার জীবনের শেষ দিন। তাই তোমাকে কমপক্ষে একটি সত্য কথা বলে যেতে চাই। এটা শুনলে হয়তো তোমার সামনের দিনগুলো অন্যরকম হবে। সেটা হলো, প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার কৃতকর্মের মধ্যেই নিহিত থাকে। গণক আর জ্যোতিষীরা মানুষকে কেবল ধাঁধাঁর নেশা ধরিয়ে দেয়। এ নেশা মানুষের দিল দেমাগ এমনকি তার অস্তিত্বকেও শেষ করে দেয়। সফল হয় সেই যে তার সৃষ্টিকর্তা ও তার নিজের অস্তিত্বের ওপর ভরসা রাখে। জ্যোতিষ আর গণকদের কথায় যারা চলে তাদের পরিণতি তাই হয় যা আজ তোমার হয়েছে। দেখে নাও, আরবের বুদ্ধু আর বেদুইনরা আজ এক শক্তি হয়ে তোমার মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তিকে পরাজয়ের পর পরাজয়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে...

উঠে এসে আমাকে নিজ হাতে হত্যা করো। এর আগে একটা কথা শুনে নাও। জীবনের প্রথম এ একটি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করছি। যার মধ্যে মিথ্যার কোন গন্ধও নেই। আমার গণনা বলছে তুমি আর কখনো সিরিয়ায় ফিরে যেতে পারবে না। তোমার ঠিকানা হবে মিসর। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আরবের মুসলমানরা তোমাদের ওপর আকাশের বজ্রনিনাদ হয়ে আছড়ে পড়বে। এত রক্ত

ঝরবে যে, নীল দরিয়া গাঢ় লাল হয়ে যাবে। তোমার রোমী বাদশাহী ইতিহাস হয়ে যাবে। রোম উপদীপ ধ্বংস হয়ে যাবে। মিসর সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এমন রক্ত- স্পন্দনীয় কাহিনী জন্ম নিবে যে, দুনিয়ার মানুষ তা শুনে শিউরে উঠবে। তুমি ইচ্ছে করলে এখনই আমাকে কতল করে দিতে পারো কিংবা আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য আমাকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখতে পারো। আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে। আর সত্য হলে মুসলমানরা আমাকে কয়েকদখানা থেকে মুক্ত করবে।

শাহে মারদীন কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগলেন। আর পুরো দরবারে নেমে এলো পিন পতন নিরবতা। হেরাকল্‌ও বসে রইলেন বিমূঢ় হয়ে। মনে হচ্ছিলো এখানে যতগুলো মানুষ ছিলো সবাই পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

শাহে মারদীন!— হেরাকল্ নিঃশব্দতা ভেঙ্গে বললেন— আমি কখনো কারো কাছে ক্ষমা চাইনি। যাও, তুমি মুক্ত।'

শাহে মারদীন অবিশ্বাসের চোখে হেরাকল্ এর দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন হেরাক্‌ল্ তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। হেরাকল্ আবার বললেন 'যাও, চলে যাও।

শাহে মারদীন নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে দরবার কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন।

✪ ✪ ✪

একটু পর হেরাক্‌ল তার মুহাফিজ দলের কমাণ্ডারকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন। মহাফিজ কমাণ্ডার দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। ইতিমধ্যে হেরাকল্ বিভিন্ন হাকিম ও প্রশাসককে পালা করে বিভিন্ন লোক মাধ্যমে পয়গাম পাঠাতে শুরু করলেন। তার এখণ একটাই চিন্তা— কি করে রাহাতে বিক্ষিপ্ত ফৌজ একত্রিত করা যায়।

বেশি সময় অতিবাতি হয়নি। দরবার চলছে। মুহাফিজ কমাণ্ডার এক কয়েদীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো। তার হাতে পায়ে শিকল। কয়েদী একজন মুসলমান যুবক। বেশ সুদর্শন -সুঠামদেহী। মুখের চার পাশের লতানো দাড়ি তার পুরুষালী বৈশিষ্ট্যকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কয়দী হলেও লেবাস

পোশাকসহ তার অবয়বটা বেশ পরিচ্ছন্ন লাগছে। হেরাকল্ এর হুকুমে তাকে দরবারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

এ পর্যন্ত রোমকদের সঙ্গে মুসলমানদের যতগুলো লড়াই হয়েছে এর মধ্যে অসংখ্য রোমক সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মুসলমানরাও বন্দী হয় তবে সংখ্যায় খুবই কম। হেরাকল্স এর হুকুমে কয়েকজন মুসলমান কয়েদীকে একটু যত্নের সঙ্গে রাখা হয়। আর বাকী কয়েদীদের সঙ্গে এমন নির্মম আচরণ করা হতো যেন ওরা মানুষ নয়। এই কয়েকজন কয়দীর সঙ্গে হেরাক্ল কেন এত ভালো ব্যবহার করছেন সেটা কারো জানা ছিলো না।

'তুমি একজন যুদ্ধবন্দী– হেরাকল্ সেই যুদ্ধ বন্দীকে বললেন– তুমি হয়তো জানো, যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে এখানে কেমন ব্যবহার করা হয়। অর্ধেকের চেয়েও বেশি কয়েদী মরে গেছে এখানে। আর যারা আছে তারা তো কংকালসার দেহ প্রদর্শনীর জন্যই বেঁচে আছে। কিন্তু তোমাকে আমরা সম্মানিত মেহমান করে রেখেছি। কয়েদখানার কুঠরীতে এজন্য রাখা হয়েছে যাতে তুমি ফেরার না হয়ে যাও। আমার হুকুমে তোমাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে এর বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে আমি একটা তথ্য জানতে চাই। আশা করি তুমি সেটা বলে দেবে। তারপর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। আর না বললে আরো কয়দী আছে, তাদের কেউ নিশ্চয় বলে দেবে। পরিণামে তোমাকে কতল করা হবে। আমি জানি তুমি এক জানবায দলের কমাণ্ডার। তাই তুমি যা জানো অন্যরা তা জানবে না।'

'তুমি রোমের বাদশাহ হও বা সিপাহসালার হও যত বড় ক্ষমতাবানই হও আমার ওপর এর কোন প্রভাব পড়বে না– মুসলমান কয়েদী বললো– তোমার জল্লাদের তলোয়ার আমার গর্দানের ওপর রাখলেও কোন তথ্য পাবে না। তুমি ঐ নজড়কাড়া সুন্দরী শাহজাদী এবং এর সঙ্গে ধনভাণ্ডারও যদি আমার পায়ে এনে রাখো তবুও তোমাকে হতাশ হতে হবে। আমার মুজাহিদ সঙ্গীদের সঙ্গে আমি গাদ্দারী করতে পারবো না। কতলকে আমরা ভয় পেলে তোমার মতো এমন পরাক্রমশালী বাদশাহ আমাদের কাছে পরাজিত হতো না। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের প্রাণ সমর্পণ করে রেখেছি। আমাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের প্রাণ লড়তে থাকবে।'

'আমি তোমার কাছে কোন ফৌজী বা সামরিক তথ্য জানতে চাচ্ছি না। আমাকে শুধু বলো তোমাদের ফৌজে এমন কোন্ গুণ আছে যা আমার ফৌজে নেই এবং আমার ফৌজে কোন জিনিসের কমতি আছে যে, এত বিশাল

সেনাবাহিনী সামান্য কিছু সেনাদলের কাছে পরাজিত হচ্ছে। অথচ আমার এই ফৌজই পৃথিবীতে সেরা যুদ্ধ শক্তি পারস্যকেও নাস্তানাবুদ করে পরাজিত করেছে।

'হ্যাঁ, এ তথ্য তোমাকে দেয়া যাবে। আমরা এক ঐক্য প্রিয় দীনদার জাতি। আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান একটি দেহের মতো। সেই দেহে শুধু একটিই মস্তিস্ক আছে। যার হুকুম পুরো দেহ মানে। তুমি যদি কখনো আমাদের নামায পড়তে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে, আমরা যে আল্লাহর সামনে সিজদা করি তখনও আমাদেরকে একটি দেহের মতোই মনে হয়। বিশাল এক জামাত মাত্র একজন ইমামের পেছনে নামায পড়ে। তুমি হয়তো জানো না, রনাঙ্গণে ইমামতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন আমাদের সিপাহসালার। আমরা জীবনের তুলনায় মৃত্যুকেই শ্রেয়তর মনে করি। ঔদ্ধত্য ও অহংকারকে আমরা ঘৃণা করি। বিনয় ও নম্রতাকে আমরা বিজয়ের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে জানি। তোমার ফৌজের মতোই আমাদের ফৌজে মর্যাদার স্তর ভাগ করা আছে। সিপাহসালার, তাদের অধীনে দলীয় কমান্ডার এবং আরো ছোট ছোট পদাধিকার আছে। কিন্তু আমরা যখন এক সঙ্গে বসি তখন আর কেউ অধিনায়ক বা অধীনস্ত থাকে না। তখন আমাদের পদাধিকার আড়ালে পড়ে থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ রাজা নয় কেউ প্রজা নয়। সবার আগে আমরা আল্লাহর বিধানের দিকে তাকাই ....

... তুমি তোমার ফৌজের দুর্বলতার কথা জিজ্ঞেস করেছো। তোমার ফৌজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তোমার অস্তিত্ব। তুমি তোমার মাথা থেকে ক্ষমতার দম্ভ বের করে ফেলো। দেখবে তোমার ফৌজও আমাদের মতো এক প্রাণ– শক্তিতে ভরে উঠেছে। আমরা লড়াই করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর তোমার ফৌজ লড়ে তোমার সন্তুষ্টির জন্য। তুমি পিছু হটলে পুরো ফৌজের শৃংখলা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মাবুদ আল্লাহ কখনো পিছু হটেন না। আমরা তার নামে শুধু অগ্রগামী হতে জানি। আমাদের কেউ শহীদ হলে তার স্থানে আরেকজন মুজাহিদ এসে যায়। কোন সিপাহী ময়দানে একলা রয়ে গেলে সে নিজেই তখন নিজের সালার বনে যায় এবং কখনো নিজেকে এ হুকুম করে না যে, তুমি এখনি পালিয়ে যাও।'

মুসলমান কয়েদীর এসব কথায় হেরাকল খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। তার কাছ থেকে তিনি অন্যান্য তথ্য আদায় করতে চাইলেন। একবার জিজ্ঞেস

করলেন, তোমাদের সিপাহসালারের পরবর্তী পরিকল্পনা কি ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মুসলমান কয়েদী সরাসরি অস্বীকার করলো।

'এর অর্থ হলো তুমি এখনো কয়েদখানায় পড়ে থাকতে চাও- হেরাকল বললেন- যে পর্যন্ত না এ প্রশ্নের উত্তর দিবে সে পর্যন্ত কয়েদ খানাতেই পড়ে থাকবে। আর তোমার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করা হবে যেমন দুশমন কয়েদীর সঙ্গে করা হয়।

হেরাকল তখনই হুকুম দিলেন- ওকে এখনো সেই কুঠরীতেই রাখো। দুই দিন পর তাকে আবার দরবারে পেশ করবে।

✪ ✪ ✪

পর দিন সকালে হেরাকল এর এক যুবতী শাহজাদী ঘোড় সওয়ার হয়ে কয়েদখানায় হাজির হলো। শুনে কয়েদখানার হাকিম দৌড়ে এসে শাহজাদীর সামনে ঝুকে দাঁড়ালো। সেখানে তো শাহী খান্দানের নগন্যতম সদস্যেরও হুকুম চলে। আর এতো এক শাহজাদী।

শাহজাদী সেই মুসলমান কয়েদীর ব্যাপারে বললো, তাকে সে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহর দরবারে পেশ করবে। কয়েদীর ব্যাপারে হাকিমের অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিলো। কিন্তু এক শাহাজাদীকে সে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলো না।

হাকিম শাহজাদীকে মুসলমান কয়েদীর কুঠরীতে নিয়ে গেলো এবং কুঠরীর দরজা খুলে কয়েদীকে বাইরে বের করে শাহাজাদীর কাছে সমর্পণ করে দিলো। 'এ আজ শাহেনশাহে হেরাক্‌ল্‌ এর মেহমান হবে- শাহজাদী হাকিমকে বললো- হেরাকল এর হুকুম হলো এর হাত পায়ের শিকল যেন মুক্ত করে দেয়া হয়।'

হুকুম পালিত হলো। শাহজাদী তাকে নিয়ে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এলো। নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কয়েদীকে বললো, তার সঙ্গে যেন পায়দল চলতে থাকে। কিছু দূর এভাবে গেলো ওরা। বেশ কিছু দূরে গিয়ে শাহজাদী ঘোড়া থামালো।

'ঘোড়ায় আমার পেছনে সওয়ার হয়ে যাও- শাহজাদী কয়েদীকে বললো- তারপর ঘোড়াকে তার মতো চলতে দাও। সামনে গিয়ে তুমি আরেকটি ঘোড়া পেয়ে যাবে। আর আমাকে জিজ্ঞেস করো না, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।'

কয়েদী কোন উচ্চ বাচ্চ না করে শাহাজাদীর পেছনে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। সামনে এসে পড়লো ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ি পথ। লোকালয় থেকে অনেক দূর যাওয়ার পর কয়েদী শাহজাদীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো না বরং আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তোমার ফৌজে আমাকে নিয়ে চলো। আমি ফিরে আসার জন্য যাচ্ছি না। এজন্যই তোমাকে কয়েদখানা থকে বের করে এনেছি। – শাহাজাদী বললো।

✪ ✪ ✪

শাহজাদীর নাম শারীনা। শারীনার মা জানতো, তার মেয়ে সকালে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। এজন্য তার ফিরতে কিছুটা দেরী হবে। তাই মা দুপুর পর্যন্ত শারীনার জন্য কোন চিন্তা করলো না। তাছাড়া হেরাকল এমনিই ফেরাউনি মেজাজের লোক। আর এখন তো তার পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই হেরাকল সবসময়ই এখন উন্মাদের মতো আচরণ করে। কখন যে কাকে সামান্য কারণে কতলের হুকুম দিয়ে দেয় তার কোন ঠিক নেই। এজন্য তার স্ত্রীরা এবং রক্ষিতারাও মহলের মধ্যে তার ভয়ে লুকিয়ে থাকতো। তাই শরীনার মা যখন সন্ধ্যার দিকেও শারীনার কোন খোঁজ পেলো না তখন পেরেশান হয়ে উঠলো। কিন্তু হেরাকল্ এর সামনে যেতে ভয় পাচ্ছিলো।

সেদিন সূর্যাস্তের একটু আগে হেরাকল্ তার গোয়েন্দা দফতরে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ফৌজী কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় তার এক স্ত্রীকে সে কামরায় ঢুকতে দেখে রাগে লাল হয়ে উঠলেন।

'কেন এসেছো ? – হেরাকলের শাহী কণ্ঠ যেন বিস্ফোরণ ঘটালো– তুমি কি জানো না.....

'সব জানি– শারীনার মা হেরাকলের পুরো কথা শেষ করতে না দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো– আপনার ব্যস্ততা ও আপনার পেরেশানীর কথা ভালো করেই জানি। পেরেশানী শুধু আপনারই নয় আমাদেরও.... আমি কখনো এভাবে আসতাম না। কিন্তু আমি এক মা' .....

'যা বলার বলে ফেলো'– হেরাকলের গর্জনে যেন ঘরের ছাদও কেঁপে উঠলো।

শারীনা সকালে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। এখনো ফিরে আসেনি।'

'তাহলে কি আমি গিয়ে তাকে খুঁজে বের করবো ?– হেরাকল বিরক্ত হলেন খুব এবং শারীনার মার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন– তোমরা প্রত্যেকেই কেন প্রত্যেকের সন্তানের প্রতি নজর রাখো না ? মহলের কর্মচারী ও মুহাফিজরা কি তোমাদের হুকুম পালন করা ছেড়ে দিয়েছে ? আমার কাছে আসা তোমার উচিতই হয়নি।'

'আপনি জানেন ও আমার এক মাত্র মেয়ে' – শারীনার মা ভিখারীর মতো বললো– কে জানে কোথায় আছে ও। সালতানাতেরও এ অবস্থা......

'এক মেয়েকে নিয়ে তুমি গলা ফাটাচ্ছো। অথচ পুরো সালতানাত আজ কাঁদছে তার অস্তিত্ব নিয়ে' – হেরাকল বললেন।

হেরাকলের যদি মেয়ে একটি বা দুই চারটি সন্তানও থাকতো তবুও তার পেরেশান হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু তার স্ত্রীই যে কতজন আছে তারই হিসাব নেই তার কাছে। সুতরাং নিজ মেয়ের হিসাব না জানাটা আর আশ্চর্যের কিছু নয়। তাই এক মেয়ে হারিয়ে তিনি বিচলিত হওয়ার লোক নন। শারীনার মা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতেই কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

মহলের এক লোক শারীনার মাকে জানালো তার মেয়েকে কে নাকি কয়েদখানার দিকে যেতে দেখেছে। কয়েদখানা আবাদী থেকে বেশ দূরে। এর আশপাশের এলাকায় কোন আবাদীও নেই এবং সেখানে দেখার মতোও কিছু নেই। তাই শারীনার মা ভেবে পেলো না, তার মেয়ে কয়েদখানার দিকে কেনই বা যাবে। তখনই এক কর্মচারীকে খোঁজ নেয়ার জন্য কয়েদখানার হাকিমের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

কয়েদখানার হাকিম হুকুম পেয়েই ছুটে এলো শারীনার মার কাছে। হাকীমকে শারীনার ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই হাকিম শারীনার মার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যার মধ্যে প্রশ্নও ছিলো পেরেশানীও ছিলো। সকালে গিয়ে এখনো শারীনা ফিরেনি একথা শুনে তো হাকিমের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

'মালিকায়ে আলিয়া ! – হাকিম অপরাধী কণ্ঠে বললো– কাল সকালে শাহেনশা যে এক মুসলমান কয়েদীকে তলব করেছিলেন। আজ সকালে শাহজাদী কয়েদখানায় এসে সেই কয়েদীকে বের করে তার সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বাইরে শাহজাদীর ঘোড়া দাঁড় করানো ছিলো, তিনি তাতে সওয়ার হন এবং কয়েদী তার সঙ্গে পায়দল হেটে যায়।'

শারীনার মা সে কয়েদী সম্পর্কে ভালো করেই জানতো। ফেরারীর সঙ্গে তার মেয়ের সম্পর্ক আছে শুনে সে অনুভব করলো, এটা কোন ষড়যন্ত্র হতে পারে এবং এ ঘটনা হেরাকলকে জানানো উচিত। না হয় তার কাছে এটা গোপন করলে পরে যখন তিনি অন্য কোন মাধ্যমে জানতে পারবেন তখন শারীনার মা ও হাকিমকে কতল করে দেয়াও বিচিত্রের কিছু হবে না।

একথা ভেবে হাকিমকে নিয়ে শারীনার মা হেরাকলের সেই কামরায় গিয়ে উপস্থিত হলো। তাকে দেখেই হেরাকলের চোখ গজবের আগুন ভরে উঠলো। কিন্তু যখন আসল ঘটনা জানতে পারলেন তার চোখের আগুণ চোখেই মিশে গেলো। তিনি যেন স্তব্দ হয়ে গেলেন। তার দৃষ্টিতে এ মুসলমান কয়েদী ছিলো অতি মূল্যবান এক সংগ্রহ। অবশেষে তিনি নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন।

'এক শাহজাদীর কথায় তুমি তাকে ছেড়ে দিলে- হেরাকল হাকিমকে বললেন- এক কথায় তুমি তার শিকল হাতকড়া খুলে দিলে ... এতো আমাকে গ্রেফতার বা কতলের ষড়যন্ত্রও হতে পারতো।'

হাকিম বুঝে গেলো এখনই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকী আছে তার জীবনের।

'হে দারোগা! তোমাকে কি এখন কতল করা উচিত নয়- হেরাকল হাকিমকে বললেন- শাহজাদীর মদদে ফেরারী কয়েদী যদি কোন খ্রিষ্টান হতো আমার জন্য তা কোন আশংকার কিছু হতো না। ফেরারী হলো মুসলান। তুমি দেখছো না মুসলমানরা আমাদেরকে কোথায় পৌছে দিচ্ছে? তুমি এমন একটা কারণ হলেও বলো যার ভিত্তিতে তোমার একাজটা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।'

যেভাবে জ্যোতিষী শাহে মারদীন মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে নির্ভীক হয়ে উঠেছিলো। কয়েদখানার দারোগারও সে অবস্থা হলো। দারোগা বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

'শাহেনশাহে রোম! -দারোগার কণ্ঠে নির্ভীকতা ফুটে উঠলো- শাহজাদীর হুকুম যদি আমি না মানতাম তিনিও আমাকে মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। আর তার হুকুম মানার কারণে আপনিও আমাকে মৃত্যুর বাণী শুনাচ্ছেন। এ শাস্তি আমি শিরোধার্য করে নিলাম। শিরোধার্য না করলেও আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমি শাহেনশাহের হেরেমের নেমক খেয়েছি। তাই মরার পূর্বে আমার নেমক হালাল করে যেতে চাই। এ একটি প্রতিকারই আপনার কদমে

পেশ করতে পারি। এ কোন সোনা রূপার খাযানা নয়। কয়েকটি শব্দ মাত্র। যা আপনার সালতানাতের জন্য মূল্যবানও হয়ে উঠতে পারে।'

হেরাকল তার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে রইলেন। এর অর্থ হলো তিনি দারোগাকে ক্ষমা করবেন না। এ দৃষ্টি যেন দারোগাকে আরো দৃঢ়কণ্ঠ করে দিলো।

'আমি জীবন ভিক্ষা চাইবো না– দারোগা বলে গেলো– হুকুম মানা আমাদের জন্য ফরয। আর এখানে হুকুমদাতা একজন নয়। বরং শাহী খান্দানের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা নানান ধরনের হুকুম পাই। আমরা কারো হুকুমই প্রত্যাখ্যান করার সাহস রাখি না। আপনি যে তিন চারজন মুসলিম কয়েদীকে অতিথির মতো সম্মান দিচ্ছেন তাদের কাছে আপনি জানতে চান যে, ওরা সামান্য কিছু সংখ্যক নিয়ে রোমের মতো এত বড় জঙ্গী শক্তিকে কি করে নাস্তানাবুদ করে চলেছে! আপনি হয়তো ওদেরকে অন্যকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি তাদেরকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তারা যা বলেছিলো আপনার খেদমতে তা পেশ করছি। ....

'তারা বলেছে, ইসলামে কোন বাদশাহ নেই এবং শাহী খান্দানও নেই। বাদশাহী শুধু আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। আর মুসলমানরা তার হুকুমই মানে, তার পথেই চলে। লড়াইয়ের ময়দানে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে তার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে। দু' তিনজন মুসলমান কোথাও একত্রিত হলে অথবা সফরে বের হলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয় এবং তার হুকুমেই তারা পথ চলে। তাদের সালার লশকরের আমীরও হন এবং ইমামও হন। তাদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও) তার সঙ্গীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে ফয়সালা করতেন। তাদের খলীফার হুকুমও তারা জান-প্রাণ দিয়ে মানে। সেই খলীফাও পরামর্শ ছাড়া কোন হুকুম প্রয়োগ করে না। কোন খলীফা, আমীর বা সিপাহসালারের স্ত্রী সন্তান কাউকে কোন হুকুম দিতে পারে না। তারা কোন অপরাধ করে বসলে তাদেরকেও অন্য সাধারণ প্রজার মতোই শাস্তি দেয়া হয়...

'শাহেনশাহে মুআযযম! আপনার শাহী খান্দানের সদস্য দেখুন কত অগণিত। তাদের কারো হুকুম উপেক্ষার নির্দেশ আমাদের দেয়া হয়নি। অথচ তাদের যে কোন একজনের হুকুম যদি অমান্য করি তাহলে আমাকে সেই কয়েদ খানার কালো কুঠুরীতে বন্দী করা হবে আজ আমি যার দারোগা। তাছাড়া আপনি

তো সে কয়েদীকে অতিথির মতো  যত্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাকে শাহজাদী শারীনা তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। আর হুকুম শোনালেন, শাহেনশাহ তাকে তলব করেছেন। আমি তার হুকুমের বরখেলাফ কি করে করি।

'বাকী তিন মুসলমান কয়েদীর সব সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দাও– হেরাকল নির্দেশ দিলেন– ওদেরকে পাতাল কুঠুরীর কোন একটায় ফেলে রাখো। সেখানে পঁচে গলে শেষ হয়ে যাক ওরা।'

হেরাকল হুকুমগুলো এমন কণ্ঠে শোনালেন যেন তিনি তন্দ্রা থেকে কথা বলছেন।

'আপনি কি ওদেরকে ধরে আনার হুকুম দিবেন না?' শারীনার মা জিজ্ঞেস করলো।

'না, ওরা এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে।  আর কোথায় গেছে তাও তো জানা নেই' – খাপ ছাড়া কণ্ঠে বললেন হেরাকল।

ইতিমধ্যে হেরাকল ইশারায় দারোগাকে চলে যেতে বললেন। দারোগাও বুঝে গেলো এবার অলৌকিকভাবে তার প্রাণ বেঁচে গেছে। দারোগা উল্টো পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

'ওতো চলে গেলো। ওকে জীবিত রাখবেন না'– শারীনার মা হা হা করে উঠলো।

'ওকে যেতে দাও। আমি আগন্তুকদের অপেক্ষায় আছি'– হেরাকল বললেন কেমন দূরাগত গলায়।

✪ ✪ ✪

ফেরারী কয়েদীর নাম হাদীদ বিন মুমিন খাযরাজ। শারীনা হাদীদকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বেই রাহা থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

কয়েদখানা থেকে যাওয়ার সময় লোকালয় থেকে বেশ দূরে আসার পর শারীনা হাদীদকে বলেছিলো, তুমি আমার ঘোড়ার পেছনে  উঠে বসো। একটু পর তুমি আলাদা ঘোড়া পেয়ে যাবে।  ওরা যে পথে যাচ্ছিলো সেটা পাহাড়ি হওয়াতে সমতল ছিলো না। কোথাও কোথাও ছিলো অবরোহ নিম্নরোহ। এর সামনে ছিলো পর্বতশৃঙ্গের সারি। মাঝে মধ্যে পড়ছিলো গাছগাছালির ঝোপঝাড়। পায়ে হাটার রাস্তাও ছিলো না সেখানে। তাই মুসাফিরদের যাতায়াত এ পথ দিয়ে কমই হতো।

আরো কিছু দুর যাওয়ার পর মধ্য বয়সী এক লোককে একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। শারীনা তার সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

'তুমি ঐ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও'— শারীনা হাদীদকে বললো।

হাদীদ ঘোড়ায় চড়ে বসলো। ও দিকে শারীনার সেই মধ্যবয়সী নওকরটি শারীনার সামনে এমনভাবে ঝুকে কুর্ণিশ ভঙ্গিতে রইলো যেন রুকূতে রয়েছে। এর অর্থ হলো, তাকে মোটা অংকের বখশিশ দেয়া হোক। কিন্তু শারীনা এক ঝটকায় তার কোমর থেকে একটি খঞ্জর বের করে বিদ্যুৎ বেগে কুর্নিশরত লোভী নওকরের পিঠে পর পর দু'বার বিদ্ধ করলো। লোকটি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। সে অবস্থাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

শারীনা লাশের পিঠ থেকে খঞ্জরটি নিয়ে লাশের কাপড় দিয়েই সেটি পরিষ্কার করে কোষবদ্ধ করে রাখলো। লোকটির কোমরে যে তলোয়ার ছিলো সেটি নিয়ে হাদীদকে দিয়ে বললো,

'এখন আর তুমি নিরস্ত্র থাকবে না। আর আমার কাছে তো খঞ্জর আছেই।'

'কিন্তু তুমি ওকে কোন অপরাধের শাস্তি দিলে ?' – হাদীদ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'এখানে দাঁড়ানো যাবে না। – শারীনা তাড়া দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বললো— এ লোক আমাদের জন্য অনেক বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সে এখান থেকে ছুটে গিয়ে আমার মাকে খুশি করার জন্য এবং বখশিশ হাতিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের কথা বলে দিতো। মা সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে আমাদের পিছু ধাওয়া করতো। তখন ধরা পড়লে আমার তো কিছু হতো না। কিন্তু তোমাকে কতল করা হতো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কে ? কি তোমার পরিচয় ? আর অমাকে নিয়েই বা যাচ্ছো কোথায় ?'

'আমার নাম শারীনা। আমি শাহে হেরাকলের শাহী খান্দানের শাহজাদী। আমার মা শাহেনশার স্ত্রী, কিন্তু আমি তার ঔরসের মেয়ে নই। তার আগের বাদশাহ ফূকাসের মেয়ে আমি। আর তোমাকে আগেও বলেছি, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না বরং তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি। আরেকবার শুনে নাও। আমাকে তোমার ফৌজে নিয়ে চলো।'

'কিন্তু  কেন ? তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? আমি কি এমন সন্দেহ করতে পারি না যে, তুমি আমাকে আমার জন্য বিপদজনক কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছো।'

'তুমি পুরুষ। তোমার কাছে তলোয়ার আছে– শারীনা মুচকি হেসে বললো– বিপদ দেখলে আমাকে কতল করে দেবে– একথা বলে শারীনা তার ঘোড়ায় হালকা খোঁচা দিয়ে বললো– কিছু দূর ঘোড়াকে এমনই দৌড়াতে দাও। সামনে এমন এলাকা আসছে যেখানে ঘোড়া ঠিকমত দৌড়াতে পারবে না। তোমাকে দৌড়ে নিতে হবে। আর সামনের কোন এক মনযিলে গিয়ে বলবো  আমি কে। তারপর তুমি ঠিক করবে, আমি পাগল না সুস্থ– শারীনার ঠোঁটে ঝুলে রইলো এক টুকরো রহস্যময় হাসি।

✪ ✪ ✪

পথ ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আশেপাশে যেমন নেড়া পাহাড় পড়ছে তেমনি ফল ফুলের গাছগাছালিতে মুড়ানো সবুজবর্ণা পাহাড়ের মুগ্ধকর দৃশ্যও ওদের মনে সজীবতার ছোঁয়া এনে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর শারীনা ঘোড়া থামিয়ে পেছন দিকে তাকালো, হাদীদও তাই করলো।

'হাদীদ! ঐ দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করো– শারীনার গলায় আবেগের ইংগিত– কী সুন্দর জায়গা দেখো। এখন তুমি তোমার এলাকায়। রোমের সীমানা শেষ হয়ে গেছে। রোমের শাহেনশাহ ও তার এক শাহজাদী অতীত কাহিনী হয়ে যাবে। হাদীদ! আমাকে বুঝতে চেষ্টা করবে না ? তুমি হয়তো আমাকে রোমের শাহেনশার শাহজাদীই ভাবছো। কিন্তু জেনে রেখো, শাহে হেরাকলের বিজয়ে আমি এতটুকু খুশী হইনি যতটুকু খুশী তার পরাজয়ে হচ্ছি। চলো এখানে বেশি সময় দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

পাশাপাশি দুটি ঘোড়া মৃদু গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো।

'এখন তুমি আমার পথের রাহবার। দেখো অনুমান  করতে পারো কি না। তুমি কোথা থেকে ধরা পড়েছিলে এবং তোমার ফৌজ কোথায় থাকতে পারে। এখন তুমি আমাকে দাসী বাদী কয়েদী বা সফরসঙ্গী যাই মনে করো আমার জীবন-সফরের ভাগ্য তোমার সঙ্গেই জুড়ে গেছে।'

ওরা এখন উঁচু পাথুরি এলাকায় ঢুকে গেছে।

'মহলে অনেকে আমাকে ভালো চোখে দেখতো না– আবার বলতে শুরু করলো শারীনা – কেউ কেউ আমাকে আধ পাগলীও মনে করে। অবশ্য আমার কথাবার্তা ও আচার আচারণও অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমি শাহজাদী হলেও সেই রূপকথার শাহজাদীর মতো না, যারা মানুষের গল্পের খোরাক হয়। হয়তো আমার রক্তে খারাপ কিছু আছে।'

'তুমি যা বলতে চাও সেটা বলো। তারপর দেখবো দোষ তোমার রক্তে না দেমাগে'– হাদীদ তাড়া দিলো।

'আমার মাকে তো তুমি দেখোনি, অসম্ভব রূপবতী মহিলা। আমি তার একমাত্র সন্তান। তিনি মূলত শাহীখান্দানের মেয়ে নন। তিনি ছিলেন আরবের বড় এক সর্দারের মেয়ে। আমার নানা প্রায়ই বাণিজ্য সফরে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াতেন। আমার মার বয়স যখন ষোল বছর তখন এমনই এক সফরে নানা আমার মাকে নিয়ে বের হন। নানাদের কাফেলা অনেক বড় ছিলো এবং কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলো লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায়ী পণ্য। কাফেলা সিরিয়ার এক জনবিরল অঞ্চলে পথ অতিক্রম করছিলো। হঠাৎ বিরাট এক দস্যু দল কাফেলার ওপর আক্রমণ চালালো। সবাইকে মেরে কেটে সবকিছু ছিনিয়ে নিল। ....

'আমার মার সেই ষোড়ষী রূপের দিকে যারই চোখ পড়তো সে দুনিয়ার সবকিছুই ভুলে যেতো। এক ডাকাত সরদার তাকে দেখে ফেলে এবং উঠিয়ে নেয়। আমার মার রূপ দেখে ডাকাত সরদার হীরার মূল্য উসুল করতে চাইলো। সে জানতো ওর মূল্য কোন আমীর উমরা নয়। কোন বাদশাহই দিতে পারবে। তখন সিরিয়া ও মিসরে হুকুমত চলতো রোমকদের। তাদের বাদশাহ ছিলো ফুকাস। ফুকাস ছিলেন চরম ভোগবিলাসে মত্ত এক বাদশাহ। তিনি প্রজাদেরকে তার সামনে সিজদা করতে বাধ্য করতেন...

'যে কোনভাবেই হোক ডাকাত সরদার বাদশাহ ফূকাস পর্যন্ত আমার মাকে নিয়ে যতে সামর্থ হয়। মার এক ঝলকেই ফূকাস কাবু হয়ে যান এবং অজস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে মাকে ডাকাত সরদার থেকে কিনে নেন। এ ধরনের রাজা বাদশাহরা কোন মেয়েকে ভোগ করতে চাইলে বিয়ে শাদীর ঝামেলায় যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাকে রক্ষিতা বানিয়ে শাহী মহলে রেখে দিতেন। কিন্তু আমার মার রূপ যৌবনে শাহে ফূকাস এমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, বিশাল এক শাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে বিয়ে করে ফেললেন...

'কিন্তু বাদশাহর মালিকা হয়েও তিনি খুশী হতে পারলেন না। মা বাবা ভাইবোন হারানোর শোকে তার চোখ সব সময় অশ্রুতপ্ত থাকতো। তা ছাড়া আমার নানা ছিলেন মুসলমান এবং আমার মাকেও খাঁটি ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে না মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন...

'আমার জন্মের পর অন্যান্য শাহজাদীর মতোই আমাকে লালনপালন করতে লাগলেন.... আমার বয়স যখন চার, মনে আছে মাকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু ছয় বছর বয়সকালে মাকে আমি শরাব পান করতে দেখেছি। তখন আর তিনি নামায পড়তেন না। শাহী মহলের পাপে ঘেরা পরিবেশ তাকে ক্রমেই নীতি নৈতিকতাহীন পাপসিদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত করে তুললো। আমি তোমাকে শাহী মহলের সেসব ষড়যন্ত্রের কথা শোনাবো না যা শাহী মহলের নিত্য দিনের ব্যাপার। মা আমাকে শাহী মহলের সব ইবলিসী আচার-প্রথা এবং নিজের ও শাহে ফূকাসের অগণিত স্ত্রীর কথা শুনিয়েছেন......

'তুমি তো জানো রোম ও পারস্য বিশ্বের দুই পরাশক্তি পরস্পরের প্রতি সব সময়ই মারমুখো ছিলো। একবার পারসিকরা আচমকা রোমী সালতানাতের ওপর হামলা করে বসলো। দেখতে দেখতে সিরিয়া ও মিসর তারা দখল করে নিলো। আর শাহে ফূকাস প্রাণ নিয়ে পালালেন ...........

'রোমীয় ফৌজের মধ্যে তখন সবচেয়ে প্রভাবশালী জেনারেল ছিলেন হেরাকল। শাহী খান্দানের সঙ্গে ছিলো তার সম্পর্ক। তিনি এ পরাজয় মেনে নিতে পারলেন না। তিনি জানতেন এ পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হলো শাহে ফুকাসের বেপরোয়া ভোগমত্ত জীবন। তিনি সব সময় পারসিক এবং নিজের সালতানাতের ব্যাপারে বেখবর ছিলেন....

'আমার বয়স তখন প্রায় সাত। এ বয়সেও এ পরাজয় আমার মনে হেরাকলের চেয়ে কম দাগ কাটলো না। আমার মার সঙ্গে হেরাকলের ঘনিষ্ঠতা ছিলো আর হেরাকল্ সে কারণে আমাকে খুব আদর করতেন। মা যখনই তার সাথে সাক্ষাতে যেতো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। কিছু দিন পর যখন তাদের ঘনিষ্ঠতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেলো, মা ও হেরাকলের মাঝখান থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। শাহী মহলে এ ধরনের অবৈধ সম্পর্ক হওয়া কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। আর শাহে ফূকাসের মতো পাড় মাতাল লোক এত অগনিত স্ত্রীর মধ্যে কয় জনের খোঁজ রাখতে পারতেন....

'শাহে ফুকাসকে হেরাকল অনবরত চাপ দিতে লাগলেন, পারসিকদের ওপর জবাবী হামলা করা হোক। কিন্তু ফুকাস গড়িমসির মধ্যেই রইলেন। হেরাকল খুব চটে গেলেন এবং সিংহাসন উল্টানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। এজন্য তিনি তার অধীনস্ত জেনারেলদের তার দলে ভেড়াতে লাগলেন। তারাও বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে গেলো। কারণ শাহে ফুকাস পরাজয়ের-সব দোষ এসব জেনারেলদের ওপর চাপাতে লাগলেন....

'হেরাকল্ জানতেন এত সহজে সিংহাসন উল্টানো যাবে না। তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর পথ একটাই। সেটা হলো, কৌশলে শাহে ফুকাসকে হত্যা করা....

ইতিমধ্যে হেরাকলের সঙ্গে আমার মার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হলো। কিন্তু হেরাকল কখনো শাহে ফুকাসের ব্যাপারে তার মনোভাবের কথা মাকে জানাননি। তবে আমার মা হেরাকলের এ মনোভাব আঁচ করে তাকে এ ব্যাপারে একদিন জিজ্ঞেস করে। হেরাকল সরাসরি অস্বীকার করেন। কিন্তু মা তার ক্ষোভের কথা তাকে জানান। বলেন, রাজা বাদশাহদের ব্যাপারে তার মন এমন বিষায়িত হয়ে আছে যে, শাহে ফুকাসকে কতলের ব্যাপারও তিনি ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য তার প্রয়োজন কারো সহযোগিতা। এ কথা শুনে হেরাকল তার মনের কথা উগড়ে দেয় এবং বলেন, যে কোনভাবেই হোক শাহে ফুকাসকে তিনি হত্যা করবেন....

'হেরাকল ও মা সিদ্ধান্ত নেন যে, বাদশাহকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে হবে। তবে এমন বিষ যা ধীরে ধীরে একজন মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন ডাক্তারই এর উৎস খুঁজে পাবে না। মার জন্য এটা সহজ ছিলো। যে কোন খাবারে বা পানীয়তে এ বিষ মিশিয়ে তাকে খাওয়ানো মায়ের জন্য ছিলো অনায়াস সাধ্য.....

'এক রাতে মা শরাবে বিষ মিশিয়ে শাহে ফুকাসকে পান করিয়ে দেয়। পর দিনই হেরাকল ফৌজের একাংশ নিয়ে বাদশাহর মহল অবরোধ করেন। দুইজন জেনারেল ছিলো শাহে ফুকাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাদের অধীনস্ত ফৌজরা বাদশাহর ব্যক্তিগত ফৌজ বনে যায়। এরা অবরোধকারীদের ওপর হামলা করে বসে। হেরাকলের বাহিনীও এদেরকে সমুচিত জবাব দিতে থাকে .........

'এ দিকে শাহে ফুকাসের মধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার সমস্ত শরীরে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। হেরাকল শাহে ফুকাসকে বলেন, আর বেশি

দিন তিনি বাঁচবেন না। সম্মানের মৃত্যু চাইলে তিনি যেন শাহী ফরমান জারী করে দেন যে, তিনি ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং হেরাকলকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর যদি তিনি এটা না করেন তার লাশ সারা শহরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসা হবে। হেরাকল এভাবে তাকে শ্বাসিয়ে যান.......

'অন্য দিকে হেরাকল শাহে ফূকাসের দলের দুই জেনারেলকে ডেকে বললেন, বাদশাহ এমন এক রোগে ভুগছেন যে, এর কোন চিকিৎসা নেই। আট দশদিন পর মরে যাবেন। তাই তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলে যাও। অযথা পরস্পরের রক্তপাতের দরকার কী ? কিন্তু এই দুই জেনারেলের আশা ছিলো, বাদশাহকে সহযোগিতা করে তার মনোতুষ্টি অর্জন করতে পারলে খাযানার পর খাযানা লাভ করতে পারবে। তারা হেরাকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে....

'তারা হয়তো ভুলে গিয়েছিলো, হেরাকলের মাথা চলে বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগতিতে। তার বিছানো জালে কেউ ফাঁসার পরও কেউ টের পায় না সে কোথায় পা দিয়েছে। হেরাকল এমন চাল দেন যে, সেই দুই জেনারেল ওতে ফেসে যায় এবং দুজনকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়। এ জেনারেল দু'জনের অধীনস্ত ফৌজও নিরূপায় হয়ে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে...

'তিন চার দিন পর শাহে ফূকাসের অবস্থা এমন হলো যে, বিছানা থেকে তিনি আর মাথা উঠাতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হেরাকল তাকে বাধ্য করলেন, তার পক্ষে যেন শাহী ফরমান জারী করে দেন.....

'শাহে ফূকাস তার সুস্থতা ও জীবন ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। লোভী ও ভোগে অন্ধ লোকেরা এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে চায় না। ফূকাস হেরাকলের কাছে হাত জোড় করে বললেন, তার যেন চিকিৎসা করা হয়। কারণ শাহী হাকিমরা তার রোগের চিকিৎসা কি করবে তার রোগ ধরতেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। হেরাকল তাকে বললেন, দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হবে এবং তিনি সুস্থও হয়ে যাবেন। শর্ত হলো শাহী ফরমান জারী করতে হবে ...

'আরো একদিন কেটে গেলো। সেদিন শাহে ফূকাসের মনে হলো তার দেহের ভেতর কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় রেখেই হেরাকল তার কাছ থেকে ফরমান লিখিয়ে নিয়ে শহরে শহরে প্রচার করিয়ে দেন। হেরাকল সিংহাসনে আরোহন করেন এবং শাহে ফূকাসকে রাজকীয় মর্যাদা দিয়ে মহলেই

তার চিকিৎসা চলতে থাকে। তিন চারদিন পর শাহে ফুকাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কিছু দিন পর ফুকাসের পুরো পরিবারকে শাহী মহল থেকে বের করে দেয়া হয়...

'আমার মার সঙ্গে কৃত ওয়াদা হেরাকল পূর্ণ করেন এবং বিয়ে করেন তাকে। এই বিয়ের মাধ্যমে হেরাকলের জীবনে শুধু এতটুকু পরিবর্তন আসে যে, তার অসংখ্য স্ত্রীদের মধ্যে আরেকজন স্ত্রী যোগ হয়। কিন্তু আমার মা তার এ বিয়ে নিয়ে গর্ব করতেন। হেরাকলও তাকে কিছু দিন স্ত্রী হিসেবে গুরুত্ব দেন। আসলে এ ছিলো আমার মার প্রতি হেরাকলের প্রতিদান। কারণ তার কারণেই হেরাকল আজ কায়সারে রোম– রোমের বাদশাহ...

'আমার মা নিজেকে হেরাকলের মালিকায়ে আলিয়া ডাকতে শুরু করলেন। আর উঠতে বসতে পারস্যের বিরুদ্ধে জবাবী হামলা করে মিসর ও রোম ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। মার কথা শুনতে শুনতে আমার মধ্যেও দেশাত্মক চেতনার স্ফুরণ ঘটে। আমি স্বপ্ন দেখতে থাকি, আমিও বড় হয়ে আমার মতো যুবতী মেয়েদের নিয়ে শক্তিশালী ফৌজ বানিয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো...

'আমি যখন কৈশোর অতিক্রম করছিলাম হেরাকল তখন ইরানীদের ওপর হামলা চালান। কয়েক বছরের অনবরত যুদ্ধের পর ইরানীরা মিসর ও সিরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে আরো একবার মিসর ও সিরিয়া সালতানাতে রোমের অন্তর্ভুক্ত হয়.........

'ইতিমধ্যে হেরাকলের যে আকর্ষণ মার প্রতি ছিলো তা শেষ হয়ে গেছে। হেরাকলের শুধু এতটুকুই মনে রইলো যে, এ মহিলার সঙ্গে তার কোন এক সময় বিয়ে হয়েছিলো। এছাড়া যুদ্ধের কল্যাণে রোমীয়দের হাতে পারসিকদের অনেক সুন্দরী মেয়ে চলে আসে। হেরাকল এ থেকে বেশ কয়েকজনকে তার হেরেমে নিয়ে আসেন। আর এই যুদ্ধের কারণে হেরাকলের নাম সারা দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, বড় বড় যুদ্ধ শক্তির কাছে তিনি এক ভয়ংকর লড়াকু হিসেবে পরিচিতি পান। তাই আমার মার মতো প্রায় বিগত যৌবনা এক মহিলার প্রয়োজন তার কাছে খুবই গৌণ হয়ে যায়। তখন থেকেই মাকে আমি দেখতে থাকি, বড় একা ও জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়ছেন। মার এ অবস্থা দেখে আমার মধ্যেও এক অচেনা অজানা অনুভূতি জেগে উঠতে থাকে এবং এ থেকে ক্রমেই আমার ভেতর রোষায়িত হতে থাকে এক লড়াকু মনোবৃত্তি। মুখের ভাষায়

পুরোপুরি বলতে পারছি না যে, তখন আমার মধ্যে যেন আগুণের এক লেলিহান শিখা উদগত হচ্ছিলো'.....

✪ ✪ ✪

মাঝারি গতিতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে সরে যাচ্ছে শ্যামল কান্তিময় টিলার সারি। শারীনার আবেগদীপ্ত শব্দগুলো হাদীদের কানে জলতরঙ্গ হয়ে বাজছে। হাদীদ বুঝতে পারছে, শারীনার ভেতর এক বিপ্লব জেগে উঠেছে। এ বিপ্লবই হয়তো তাকে একদিন আল্লাহর মহান নেয়ামত ইসলামের সজীব ছায়াতলে নিয়ে যাবে।

দুপুরের দিকে ওরা এক জায়গায় থেমে ঘোড়াকে ছেড়ে দিলো। নিজেরা কিছু খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। তখনো শারীনার কাহিনী শেষ হয়নি। এই সামান্য বয়সেই সে কালের কয়েকটি উত্থানপতনের সঙ্গীনী হয়েছে। বলতে বলতে শারীনা মুসলমানদের কাছে হেরাকল ও রোমীয়দের একের পর এক পরাজয়ের প্রসঙ্গে চলে আসলো।

'হাদীদ জানো, হেরাকলের পরাজয়ের আসল কারণ কি ? – অক্লান্ত গলায় শারীনা আবার শুরু করলো– 'হেরাকল সিংহাসনে বসার পর লোকেরা খুব খুশী হলো। কারণ শাহে ফুকাসের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। অনেকে দেশ ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়। এ কারণেও লোকেরা খুশী হয়েছিলো যে, হেরাকল এখন ইরানীদের শায়েস্তা করে রোমের শ্রেষ্ঠত্ব আবার ছিনিয়ে আনবেন। এছাড়াও শাহে ফুকাস তার আয়েশী জীবনের ভোগ মত্ততার জন্য প্রজাদের ওপর অকল্পনীয় কর আরোপ করে তাদের রক্ত চুষতে শুরু করেছিলেন। দিন দিন মানুষ পথের ভিখারী হচ্ছিলো। এক একটি রুটির টুকরোর জন্য চারদিক থেকে হাহাকার উঠছিলো। তাই হেরাকলের বিদ্রোহের সময় ফৌজের সঙ্গে অসংখ্য জনসাধারণও সশস্ত্র হয়ে লড়াইয়ে যোগ দেয়। তাদের বিক্ষুব্ধ আক্রমণের সামনে শাহে ফুকাসের ফৌজ পালাতে বাধ্য হয় ...

'যাহোক হেরাকল সিংহাসনে বসে নানান সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রজাদের দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দেন। এ কারণে লোকেরা স্বেচ্ছায় দলে দলে তার ফৌজে যোগ দেয়। তুমি তো জানো, মোটা অংকের বেতন ও মালেগণীমতের লোভে লোকে ফৌজে যোগ দেয়। ফলে এরা দুমশনের সামান্যতম চাপও সহ্য করতে না পেরে ময়দান ছেড়ে পালায়। কিন্তু হেরাকল যখন ইরানের ওপর হামলা চালান

ফৌজ তখন জানের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের মনে বেতন ও মালেগণীমতের লোভ ছিলো না। ছিলো নিখাদ দেশপ্রেম...

' হেরাকল যখন মিসর ও সিরিয়া জয় করে নিলেন তখন তিনি মনোযোগ দিলেন দেশের অর্থনীতির দিকে। এখন তো তার সিংহাসন ও বাদশাহী আজীবনের জন্য পাকাপোক্ত হয়ে গেছে আর বিগত যুদ্ধে তার শাহী ধনভাণ্ডার অনেকটা শূন্য হয়ে গেছে।

শাহী খান্দানের ভোগ বিলাসের উপকরণও যোগাড় করতে হয়। তাই তিনি এবার নির্মম অত্যাচারী শাসকের প্রতিমূর্তি বনে যান। জনগণের ওপর মোটা অংকের করের বোঝা চাপিয়ে দেন। এত দিন রোমের মতো মিসর ও সিরিয়ার লোকেরাও হেরাকলকে পছন্দ করতো। কিন্তু হেরাকল্ তাদের ওপর এমন করের বোঝা চাপিয়ে দেন যে, লোকেরা আবার হতদরিদ্র অবস্থায় পৌছতে থাকে.....

'এরপর হেরাকল মনোযোগ দেন খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি। খ্রিষ্টানরা এতদিন যার যার পছন্দমতো বিভিন্ন ফেরকায় ও দলে বিভক্ত ছিলো। সব ফেরকার লোকেরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের ধর্মকর্ম পালন করতো। অবশ্য মাঝে মধ্যে এক ফেরকার লোকেরা আরেক ফেরকার সঙ্গে লড়াইয়েও অবতীর্ণ হতো। এতে অনেকেই হতাহত হতো। হেরাকল এই সমস্ত ফেরকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক সরকারী খ্রিষ্টীয় ধর্মের রূপ দেন এবং সমস্ত ফেরকাকে এক ফেরকার বিধানমতে ধর্মকর্ম পালনের নির্দেশ দেন। এছাড়া অন্য যে কোন ফেরকার অনুসরণকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেন...

'তুমি নিশ্চয় জানো মানুষ কখনো তার আদি আকীদা বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না। তাই লোকেরা তার সরকারী খ্রিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করলো না। এতে হেরাকল ক্ষেপে গিয়ে পুরো সেনাবাহিনীকে জনগণের ওপর লেলিয়ে দেন। তারা জোরপূর্বক লোকদেরকে সরকারী ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলো। কেউ ঝামেলা করলে তাকে হয় কয়েদ করতো না হয় কতল করতো। শুধু তাই নয়, কোন ঘরে সুন্দরী মেয়ে থাকলে সে ঘরে হামলা চালিয়ে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো। আর অজুহাত স্বরূপ বলতো, এরা এখনো নিষিদ্ধ ফেরকা ত্যাগ করেনি........

'একদিকে অযৌক্তিক করের বোঝা অন্যদিকে তাদের প্রিয় ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত এ দুই অবিচারে জনগণ হেরাকলের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মানুষ হেরাকলকে ঘৃণা করতে থাকে। এ অবস্থাতেই তোমরা শাম– সিরিয়ার

ওপর হামলা করো। আমাদের মহলে কখনো মুসলমানদের নাম উঠলে সবাই বিদ্রূপে হেসে উঠতো। বলতো, আরে আরবের বুদ্ধুরা আবার হামলা করতে জানে নাকি? এরা তো শুধু লুট করতে জানে। অথচ আমরা দেখলাম, হেরাকলের ফৌজ মুসলমানদের প্রথম আঘাতই সহ্য করতে পারলো না। আমি কখনো মানতে পারতাম না, মুসলমানরা এত বড় শক্তি হয়ে গেছে যে, পারসিকদের পর রোমীয়দেরও পা উপড়ে দেবে.....

'আমি প্রায়ই সেনা ছাউনিতে গিয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতাম। সবাই বলতো মুসলমান শুধু আল্লাহর হুকুম মান্য করে। তারা মানবজাতির নির্ভেজাল কল্যাণকামী। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন অফিসার আমাকে বলেছে, মুসলমানরা যখন কোন এলাকা জয় করে তখন তারা সেখানে লুট পাটের রাজত্ব কায়েম করে না। যত সুন্দরী মেয়েই হোক তার দিকে হাত বাড়ানো তো দুরের কথা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তারা বিজিত এলাকার লোকদের ওপর নামমাত্র কর আরোপ করে । এর বিনিময়ে তাদের জানমালের মুহাফিজ বনে যায়। মুমলমানদের এ পবিত্র চরিত্র মাধুরী দেখেই লোকেরা তাদেরকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিচ্ছে।

কিন্তু শারীনা! – হাদীদ তাকে বাঁধা দিয়ে বললো– তোমাদের ফৌজের পরাজয়ের কারণ এই নয় যে, প্রজারা হেরাকলকে ঘৃণা করে আর তাদের মন মুসলমানদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। তুমি হয়তো মুসলমানদের বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং লড়াইয়ের অসম্ভব ক্ষিপ্রতার কথা শোনোনি। প্রত্যেক ময়দানেই আমাদের সেনা সংখ্যা দুশমনের চেয়ে কয়েক গুণ কম থাকে।'

'অবশ্যই শুনিনি এসব। শুধু অনুপম চরিত্র মাধুরীর জন্যই মুসলমানদের আমি পছন্দ করি না ; বরং তাদের লড়াইয়ের অদম্য জযবা, অসম সাহসিকতাও আমাকে মুগ্ধ করে। তোমার সঙ্গে এ কারণে আমার আসা। আসলে ঐ হেরাকলকে আমি এতই অপছন্দ করতে শুরু করেছিলাম যে, শাহী মহল আমার জন্য জাহান্নাম হয়ে উঠেছিলো। আশা করি তোমার কাছ থেকে আমি কোন ধোকা বা অপ্রীতিকর আচরণ পাবো না।'

'ধোকা দেয়া আমাদের কাছে এক মহাপাপ। আর যে কোন মেয়েকে ধোকা দেয়া তো নির্লজ্জতা আর কাপুরুষতা। আরেকটি কথা শুনে রাখো, আমরা কোন মেয়েকে ভালোবাসতে পারি ঠিক ; কিন্তু সেই ভালোবাসার জন্য নিজের ফরয দায়িত্ব জলাঞ্জলী দিতে পারি না।

'তোমাকে আগেও বলেছি। আমাকে শুধু শাহজাদীই মনে করো না।'– শারীনা বললো নির্মল কণ্ঠে– তোমাকে আমি বলে বুঝাতে পারবো না, তোমাকে দেখেই আচমকা আমার মনের ঘরে যেন ভালোবাসার এক অচিন পাখি জুড়ে বসেছে। কিন্তু এজন্য মনে করো না, ভালোবাসার খেলায় মেতে উঠতে তোমার সঙ্গে এসেছি। হেরাকলের সামনে তুমি যে দূর্দমনীয় মনোভাব নিয়ে কথা বলেছো সেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে। হেরাকল তোমাকে হত্যাও করতে পারতো। কিন্তু তুমি যা করতে চাও তাই তার মুখের ওপর বলে দিয়েছো। মুসলমানদের চরিত্র সম্পর্কে আমি যা শুনেছি সেটা তুমি সত্য বলে প্রমাণ করে দিলে।'

✪ ✪ ✪

চারিত্রিক দৃঢ়তা ছাড়াও হাদীদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের সুদর্শন পুরুষ। শুধু মেয়েদের কেন যে কাউকে কাছে টানার মতো বৈশিষ্ট্যই হাদীদের চেহারায় সবসময় সমুজ্জল ছিলো। সুতরাং এ ধরণের পুরুষের প্রতি শারীনার আকর্ষিত হওয়া খুব বিস্ময়ের কিছু নয়।

ওরা এখন যে এলাকা দিয়ে যাচ্ছে সে এলাকা ওদের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। কারণ রণাঙ্গণ থেকে পালিয়ে আসা রোমীয় ফৌজরা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলে বিভিন্ন জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। এ এলাকাও তেমনি পাহাড়ি ও বনাঞ্চলীয় এলাকা। আর ওরা যে ইন্তাকিয়া শহরের দিকে যাচ্ছে সে এলাকার আশে পাশেও অসংখ্য রোমীয় চৌকি আছে।

সূর্যের স্বর্ণাভ আভা দিগন্ত রেখা প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। এখন কোথাও থেমে ওদের বিশ্রাম নেয়ার সময়। এমন সময় হাদীদের কান খাড়া হয়ে গেলো। সে ঘোড়ার চিহি শব্দ ও কয়েকজন লোকের কথার আওয়াজ শুনছে। ওরা একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে সামনের দিকে লক্ষ্য রাখলো। সামনের মাঠ পেরিয়ে কয়েকটি নুড়ী পাথরের ঢিবির ওপাশে তিন ঘোড়সওয়ারের মুখসহ কাঁধ পর্যন্ত দেখা গেলো। ঘোড়ার কানও ওদের নজর এড়ালো না। ঐ তিন সওয়ারের রুখ পশ্চিম দিকে আর হাদীদদের রুখ পূর্ব দিকে। ওরা অনেক দূর চলে যাওয়ার পর হাদীদরা আবার চলতে শুরু করলো। মাইলখানেক যাওয়ার পর একটি চমৎকার ঝর্ণা বাহিত জায়গায় ওরা নেমে পড়লো। এখানেই ওরা রাতটা কাটাতে চায়।

'হাদীদ! এখন বেফিকির থাকতে পারো। আমাদের পেছনে এখন আর কেউ আসবে না। আরামে শুয়ে পড়ো– শারীনা ওকে আশ্বস্ত করলো।

'কেউ আসলেও কোন অসুবিধা নেই। অস্ত্রের মাধ্যমে তাকে জবাব দেয়া হবে'– হাদীদ দৃঢ় গলায় বললো।

'যে তিন সওয়ারকে আমরা দেখেছি ওরা আমাদের ফৌজের। এতদূর থেকে চেনা তো সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয় ওদের একজনকে আমি চিনি। সে সবার সামনে ছিলো এবং তার মাথা ঝুকানো ছিলো।'

'যে কেউ হোক ওরা অনেক দূরে চলে গেছে। ওরা নিশ্চয় কোন ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছে এবং কোন শহরের দিকে যাচ্ছে।'

ওরা শুতে যাবে এ সময় ওদের কানে ছুটন্ত পদশব্দ গেলো। চমকে উঠে দু'জনেই সামনের দিকে তাকালো। ওদের সামনে এক রোমী সিপাহী দৌড়ে এসে দাঁড়ালো।

'তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো?' শারীনা জিজ্ঞেস করলো। সতর্ক গলায়।

'আমি বড় ভূখা– সিপাহী ভিখারীর মতো বললো– মুসলমানরা আমাদের ফৌজকে মেরে কেটে শেষ করে দিয়েছে। যারা বাঁচতে পেরেছে তারা যে যার মতো পালিয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছিলো এরা আরবের বুদ্ধু, লুটপাট ছাড়া আর কিছুই জানে না। ওদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ঐ সামান্য কয়েকজন মুসলমান যখন হামলা চালালো মনে হলো এরা মানুষ নয় জিন বা দৈত্য দানবের দল। এত বড় ফৌজকে ওরা রক্তে ভাসিয়ে দিলো। আমি আর থাকতে পারছি না ক্ষুধায়। মরে যাচ্ছি।'

'লড়াই থেকে পলায়নকারী এ ধরনের বুযদিলের মরে যাওয়াই উচিত। ওখানেই বসে যাও'– শারীনার কণ্ঠ ঘৃণায় রি রি করে উঠলো।

হাদীদ ওকে কয়েক ধরনের খাবারের জিনিস দিলো। সিপাহী সেখানেই বসে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

'এখানে বসবে না। দূরে গিয়ে অন্য কোথাও বসো'– শারীনার গলায় শাহজাদীদীপ্ত গাম্ভীর্য ফিরে এলো।

হাদীদ শারীনাকে বাঁধা দিলো, একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে এভাবে বলতে নেই। সিপাহী সেখানে বসে খেতে লাগলো যেন তার কানে কোন কথাই যায়নি।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে তখনই ধীর গতির ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শোনা গেলো। হাদীদের হাত সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের বাটের ওপর চলে গেলো। যেদিক থেকে

আওয়াজ আসছে সেদিকে দুটি ছোট টিলার চূড়া এক সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে, এর নিচ দিয়ে একটা পথ তৈরী হয়ে গেছে। সে পথ দিয়ে এক রোমী সিপাহী একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার ওপর এক সওয়ার। ওদেরকে দেখেই এই ক্ষুধার্ত রোমী সিপাহী সেদিকে দৌড়ে গেলো।

হাদীদ তলোয়ার হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। শারীনাও ওঠে দাঁড়িয়েছে। দুই সিপাহী মিলে ঘোড়সওয়ারকে নামিয়ে সেখানে নিয়ে এলো যেদিকে শারীনা ও হাদীদ কম্বল বিছিয়ে ছিলো। সিপাহীরা সওয়ারকে একটি কম্বলের ওপর বসালো।

'আমি নিশ্চয় স্বপ্নে দেখছি না শারীনা – সওয়ার বললো– আমি তো হয়রান হচ্ছি একারণে যে, আমাদের সাক্ষাত কোথায় এসে হলো। আমরা তোমাদেরকে আগেই দেখেছিলাম।

'হ্যাঁ কৈলাশ! – শারীনা নিরাবেগ কণ্ঠে বললো– তোমার আরো বেশি হয়রান হওয়ার কথা। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হোক এটা আমি কখনোই আশা করিনি... তুমি কি যখমী ?'

'হ্যাঁ, শারীনা! পা দুটো মারাত্মকভাবে যখম হয়েছে। এক পায়ের হাড় বোধহয় ভেঙ্গেই গেছে.....

'তুমি এখানে কি করে এলে ? এই লোক কে ? '–কৈলাশ জিজ্ঞেস করলো।

'আমি যদি বলি তোমার সন্ধানে বের হয়ে ঠোকর খেতে খেতে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি তা কি তুমি মানবে ?' – শারীনার গলায় বিদ্রুপ।

'না, তা মানবো না– কৈলাশের মুখ কঠিন হয়ে গেলো– তোমার সঙ্গে দু'তিনজন রোমী সিপাহী থাকলে হয়তো তা মানতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গের লোকটি তো আরবী। ওকে তোমার মুহাফিজও মনে হচ্ছে না..... তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারবো না। আমার তো দাঁড়ানোরই ক্ষমতা নেই। তুমি সত্য কথা বললে তোমার পথ আমি রুখবো না..... আমার সে হিম্মতও নেই।'

কৈলাশ অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। শাহী খান্দানের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। সে রোমকদের নৈশ হামলাকারী ফৌজের কমাণ্ডার। হেরাকলের ফৌজে নৈশ হামলাকারী হিসেবে তার অনেক নাম ডাক। সে বাঘের মতো অতর্কিত হামলা করে অতি ক্ষিপ্রতায় অদৃশ্য হয়ে যেতো। সেই শৈশব থেকেই তার এ গুণ শারীনার খুব ভালো লাগতো। তাকে তার লড়াকু চিন্তাভাবনার আদর্শ মনে

করতো। শারীনা যৌবনে পৌঁছলে তার শৈশবের পছন্দ খানিকটা গাঢ়তায় রূপ নিলো। একে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসাও বলা যাবে না। কিন্তু কৈলাশ শারীনার এই আবেগকে শুধু নারী পুরুষের হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলো না। শারীনার প্রতি সে অন্ধ হয়ে উঠলো এমনকি শারীনাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিলো। শারীনা তাকে পরিস্কার বলে দিল, যেদিন তুমি মুসলমানদের কোন লশকরকে পরাজিত করে আসতে পারবে সেদিনই তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে।

কিন্তু এরপর থেকে কৈলাশ যুদ্ধে যেতে কালক্ষেপণ করতে শুরু করলো। যে কোন বাহানায় কৈলাশ যুদ্ধ এড়িয়ে থাকতে চাইলো। কৈলাশের এ মনোভাব শারীনার কাছে বেশ অপছন্দনীয় ছিলো। শারীনা বলতো, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। আমিও পুরুষদের মতো লড়বো। কিন্তু শারীনার একথা কৈলাশের ভালো লাগতো না। সে বলতো, তুমি একটি ফুটন্ত গোলাপ, তোমাকে আমি এভাবেই দেখতে চাই......

শারীনার মনে কৈলাশের যে বীরদর্পী ছবি এতিদন লালিত হচ্ছিলো সে ছবি ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগলো। এর বদলে এক কাপুরুষের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। অবশেষে হেরাকলের চাপের মুখে যখন কৈলাশ যুদ্ধে যেতে বাধ্য হলো ততদিনে শারীনার মন থেকে কৈলাশের নাম মুছে গেছে। সেখানে মুসলমানদের সশ্রদ্ধ নাম স্থান করে নিয়েছে। আজ যখন দূর থেকে কৈলাশ শারীনাকে দেখলো, সে সংকল্প করে নিলো, শারীনাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে। তার আশা শারীনা তাকে আগের চেয়ে বেশি ভালো না বাসলেও আগের মতোই ভালোবাসে। কিন্তু তাকে এক মুসলমানের সঙ্গে দেখে সে পেরেশানীর শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলো।

'আমাকে এর চেয়ে বেশি পেরেশানীতে রেখো না শারীনা! – কৈলাশ রাগে বিরক্তিতে অধৈর্যগলায় বললো– এখন বলো এ কে এবং এর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছো? সে যদি জোরপূর্বক তোমাকে নিয়ে যেতো তাহলে আমাদের তিনজনকে দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হতে এবং দৌড়ে আমাদের আশ্রয়ে চলে আসতে।'

'হ্যাঁ আমিই তার সঙ্গে যাচ্ছি এ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না কৈলাশ! – শারীনা বড় শক্ত গলায় বললো– আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে যাচ্ছি। ভুলে যাও আমাকে কৈলাশ! আমাদের রাস্তা পৃথক হয়ে গেছে।'

'তোমাকে মেয়েরা পাগল বলতো ঠিকই বলতো। তুমি তো শাহী খান্দানের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছো'– কৈলাশ বললো।

'তোমাদের শাহী খান্দানের কোন সম্মান এখনো অবশিষ্ট আছে ? – হাদীদ এক চিলতে হেসে জিজ্ঞেস করলো এবং তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললো– অন্যের সম্মান নিয়ে যারা খেলে তাদের পরিণাম এমনই হয় যেমন তোমাদের শাহী খান্দানের হয়েছে।'

'তোমাদের শাহী খান্দানের বাদশাহদের বিবিদের গুণে দেখো– শারীনা বললো সখেদে– গুণে দেখো তাদের রক্ষিতাদের। গুণে শেষ করতে পারবে না। শাহী খান্দানের কারো কোন সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মহলে তুলে আনা হয়। মা বাবা থেকে অবুঝ নিষ্পাপ মেয়েদের ছিনিয়ে আনা হয়। তোমরা কোন এলাকা জয় করতে পারলে বিজিত এলাকার মেয়েদের ওপর টুটে পড়ো। আমার মাকেও অপহরণ করে বাদশাহ ফূকাসের কাছে বিক্রি করে ডাকাত সরদার। বাদশাহর জন্য তো ফরয ছিলো, ডাকাত দলের বিচার করে যাদের মেয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া.... এ কারণেই আমি ঐ শাহী খান্দানকে এতো ঘৃণা করি।'

'কৈলাশ ভাই! – হাদীদ বড় নরম গলায় বললো– আজ তোমাদের শাহী খান্দানের একটি মেয়ে চলে যাচ্ছে বলে তুমি বলছো শাহী খান্দানের ইজ্জত চলে গেছে। অথচ এ মেয়েকে আমি জোর করেও নিয়ে যাচ্ছি না। সে আমার বা অন্য কারো আনন্দসামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হবে না। কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইলেও সিপাহসালারের অনুমতি লাগবে। আবার স্বয়ং সিপাহসালারও মনমতো তাকে ব্যবহার করতে পারবে না। আমাদের এখানে সে ততটুকু ইজ্জতই পাবে যতটুকু ইজ্জত পায় খলীফার অন্দরমহলের মেয়েরা। ইজ্জত ও মর্যাদা দেখতে চাইলে আমার সঙ্গে চলো। সেখানে তোমার চিকিৎসাও করা হবে। আর মুসলমান হয়ে গেলে লড়াইয়ের যোগ্যতা অনুযায়ী সেনাদলে যে কোন পদমর্যাদাও পেয়ে যেতে পারো।'

'তুমি সৌভাগ্যবান যে, আমি যখমী। না হয় তোমাকে এতগুলো কথা বলতে দিতাম না আমি' – কৈলাশ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো।

হাদীদ প্রতি উত্তরে কিছুই বললো না। তার মুখে শুধু এক টুকরো শীতল হাসি খেলে গেলো। কৈলাশ বড় অস্বস্তিতে হাদীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এরপর কৈলাশ শারীনার সঙ্গে আরো অনেক কথা বললো। কিন্তু শারীনা এতে মোটেও প্রভাবান্বিত হলো না। কৈলাশ মুসলমানদেরকে লুটেরা, ডাকাত, ধর্মহীন, মূর্খ ইত্যাদি বলে অনেক অপমান করার চেষ্টা করে শারীনাকে তার দলে ভেড়াতে চাইলো। এতে শারীনা এক চুলও নড়লো না।

'আমি সৌভাগ্যবান নই যে, তুমি যখমী– হাদীদ তিক্ত গলায় বললো– কিন্তু তুমি সৌভাগ্যবান যে, তুমি যখমী, নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছো না। আমরা যখমী, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর হাত উঠাই না। তুমি আমাকে অপমান করছো। আমার ধর্মকে অপদস্থ করেছো। এরপরও তোমার ওপর আমি হাত উঠাতে পারবো না। এটা ইসলামের হুকুম। যা বুঝার মতো যোগ্যতা এখনো তোমার হয়নি।'

'শারীনা! তুমি কিছু মনে না করলে আমি ও আমার সিপাহীরা রাতে এখানেই থেকে যেতে চাই'– কৈলাশ আর তর্কে না গিয়ে বললো।

'না, মনে করার কি আছে। যেখানে ইচ্ছে শুয়ে পড়ো'– শারীনা বললো।

'আর খাবারের প্রয়োজন হলে নিয়ে যাও। আর কোন কষ্ট হলে বা কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলো'– হাদীদ বললো ।

'না, প্রয়োজন নেই কোন কিছুর– কৈলাশ একথা বলে শারীনাকে ডেকে বললো– শারীনা তুমি তো চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছো। আমার শুধু একটা কথা রাখো। আমার কাছে এসে কিছুটা সময় বসো।'

'ঠিক আছে। তবে তোমরা এখান থেকে অনেক দূরে সরে ঘুমানোর ব্যবস্থা করো।'

কৈলাশ তার সিপাহীদের ঐ টিলার কাছে গিয়ে বিছানা পাতার নির্দেশ দিলো। তারপর শারীনা কৈলাশের বিছানার কাছে গিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, সে কি বলতে চায়। কৈলাশ তাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে লাগলো যে, তার সঙ্গে যাতে সে ফিরে যায়। মুসলমানদের ব্যাপারে অনেক ভয় দেখালো যে, মুসলমানরা অতি হিংস্র জাতি। তাকে ছিড়েখুড়ে শেষ করে দেবে। শারীনা তার সব কথাই প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে তাকে হতাশার মধ্যে রেখে হাদীদের পাশে এসে শুয়ে পড়লো। ওরাও শুয়ে পড়লো।

✪ ✪ ✪

হঠাৎ এক নিশি পাখির ডাকে শারীনার চোখ খুলে গেলো। শারীনার সামনে হাদীদ শোয়া। হাদীদের মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। শারীনার চোখ চলে গেলো ঐ টিলার দিকে, যে দিকে কৈলাশ ও তার সঙ্গীদের শুয়ে থাকার কথা ছিলো। সেদিকে চোখ পড়তেই শারীনা সাবধানী হয়ে উঠলো। কারণ ঐ তিনজন এখন শায়িত নয় সিপাহী দু'জন কৈলাশের ডানে বামে বসা। কৈলাশ ফিস ফিস করে ওদেরকে কিছু একটা বলছে। শারীনা বুঝে গেলো, ওদেরকে নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে। শারীনার দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সে সজাগ রাখছে। হাদীদ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিছু করতে হলে তাকেই করতে হবে। শারীনার প্রতিটি অঙ্গ এজন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও নিজেকে শান্ত রাখলো। যে কাতে শুয়ে ছিলো সে কাতেই স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

শারীনা এক কাতে আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলো না। পাশ বদল করে ধীরে ধীরে চিত হয়ে শোল। তখনই দেখলো, কৈলাশের দু' পাশ থেকে দুই সিপাহী উঠে দাঁড়ালো। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার ঝুলছে। ওরা নিঃশব্দ পায়ে হাদীদ ও শারীনার দিকে আসছে। চাঁদের স্পষ্ট আলোয় সবকিছুই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। শারীনা চোখ বন্ধ করে ফেললো। হালকাভাবে কৃত্রিম নাক ডাকতে লাগলো।

একটু পর শারীনা অনুভব করলো দুটি ছায়া ওদের খুব কাছাকাছি চলে আসছে। আরো খানিক পর শারীনা বুঝতে পারলো দুই সিপাহীর এক সিপাহী শারীনাও হাদীদের মাঝখানে এসে শারীনার দিকে মুখ করে বসেছে। সে ঝুঁকে শারীনাকে দেখলো এবং নিশ্চিত হয়ে গেলো, এ গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। আরেকজন সিপাহী হাদীদের এক পাশে গিয়ে হাদীদকেও এভাবে পরীক্ষা করলো। সিপাহী দু'জন একজন আরেকজনের দিকে মুখোমুখি হয়ে আছে। এক সিপাহী ফিস ফিস করে বললো, 'দেরী করো না।'

শারীনা নিজের চেয়েও হাদীদের জন্যই বেশি ভয় পাচ্ছে। সে নিশ্চিত হাদীদকে কতল করে তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। দু'জনের কাছে একটিই মাত্র তলোয়ার আছে। তলোয়ার হাদীদের কাছে। আর শারীনার কাছে আছে একটি খঞ্জর। শারীনা চোখ পিট পিট করে দেখলো, ওর ও হাদীদের মাঝখানে যে সিপাহী ছিলো সে ঝুকে হাদীদের তলোয়ারটি উঠাচ্ছে।

আর সময় নেই। শারীনা আস্তে আস্তে তার হাত তার কাপড়ের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো। যে সিপাহী হাদীদের পাশে দাঁড়ানো ছিলো তার সামনে তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে থাকায় সে শারীনার নড়াচড়া টের পেলো না। শারীনা হাদীদের মুখে 'আল্লাহ' শব্দটি বার কয়েক শুনেছিলো। সে 'আল্লাহ' শব্দ মুখে আওড়াতে লাগলো। এ সিপাহী যেই হাদীদের তলোয়ারটি উঠাতে ঝুকলো, শারীনা ওমনিই বিদ্যুৎ বেগে উঠে খঞ্জর বের করে ঝুঁকে থাকা সিপাহীর পিঠে পলকে গেঁথে দিলো পূর্ণ শক্তি ব্যায়ে। খঞ্জর নিয়েই সিপাহী ঘুরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শারীনা আরেকবার একই জায়গায় খঞ্জর মারলো।

সামনের সিপাহীটি ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেলো। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না, শারীনাকে তলোয়ার মারবে না হাদীদকে। শারীনার দেহের মতো তার মাথাও বিদ্যুৎবেগে চলছে। সে সিপাহীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগটি নিলো। যে সিপাহীকে খঞ্জর মারা হেয়েছে সে যন্ত্রণায় একটু সোজা হয়ে এক দিকে পড়ে যাচ্ছিলো। শারীনা তার পেছনে দু' হাত দিয়ে তাকে পুর্ণ শক্তিতে সামনের দিকে ঠেলে দিলো। সিপাহীটি তার ভারী শরীর নিয়ে অন্য সিপাহীর ওপর গিয়ে পড়লো। সে সিপাহী এ যখমীকে নিয়ে হাদীদের ওপর গিয়ে পড়লো।

হাদীদ তো হড়বড় করে উঠে বসলো। যখমী সিপাহীর তলোয়ারটি পড়ে গিয়েছিলো। শারীনা সে তলোয়ার উঠিয়ে হাদীদ উঠার আগেই এক লাফে অক্ষত সিপাহীর কাছে গিয়ে তার গর্দানে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। তার অর্ধেক গর্দান কেটে গেলো। শারীনা তাতেই ক্ষান্ত হলো না। তলোয়ারটি বর্শার মতো করে সজোরে সিপাহীর পেটে মারলো। উভয় সিপাহীর দেহ অল্পক্ষণেই নিথর হয়ে গেলো।

হাদীদ তো কিছুই ঠাহর করতে পারছিলো না। সে কিছুক্ষণ শারীনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, এসব কি হয়ে গেলো। 'আমার সঙ্গে এসো– শারীনা কৈলাশের দিকে হাটা দিয়ে বললো– ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

এই পুরো ঘটনা ঘটতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র লেগেছে। কৈলাশ আগেই জেগেছিলো। এ অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে সে উঠে বসলো।

'এই নরাধম!– শারীনা তলোয়ারের অগ্রভাগ কৈলাশের পাঁজরে ঠেকিয়ে বললো– তুই কি আমাকে এভাবে তোর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতি?'

কৈলাশের ঠোঁট দুটি মাত্র একটু ফাঁক হলো। সে যেন এই মাত্র জানতে পারলো, যে শারীনাকে অবলা ভেবে সে যা ইচ্ছে তাই করতে চেয়েছিলো সেই মেয়েই এখন তার মৃত্যুর পরওয়ানা হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'সত্য বলো, হয়তো তোমাকে মাফ করে দেয়া হবে– হাদীদ বললো– তুমি কি আমাকে না আমাদের দু'জনকে কতল করাতে চেয়েছিলে ?'

'সত্য বল্'– শারীনা এবার তলোয়ার তার বুকে ঠেকিয়ে বললো।

'আমাকে মাফ করে দাও শারীনা– কৈলাশ কাঁদতে কাঁদতে বললো– তোমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছি যে, তুমি চিরদিনের জন্য চলে যাবে এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।'

'আমার এই সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তর দে– শারীনা তাকে ধমক লাগালো– এখন তোর দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে তখন আমার ভালোবাসাও গায়েব হয়ে যাবে। এখনি বল্ তোর মতলব কি ছিলো ? হাদীদ ! – শারীনা হাদীদের দিকে ফিরে বললো– ওর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। সে তোমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিলো। তুমি ওকে খতম করে দেয়ার অধিকার রাখো।'

'তোমাদের দুজনের কাছে আমি মিনতি করছি– কৈলাশ হাতজোড় করে বললো– আমাকে হত্যা করার পাপ কেন তোমাদের মাথায় নেবে ? আমি তো এমনিই মরে যাচ্ছি। আমাকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দাও। অলৌকিক কিছু ঘটলে হয়তো মনজিলে পৌছে যেতে পারবো। যা প্রায় অসম্ভব। আর এতো নিশ্চিত যে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ঘোড়ার পিঠেই মরে যাবো। ঘোড়া থেকে নামতেও পারবো না। আর নামতে পারলেও কারো সাহায্য ছাড়া ঘোড়ায় উঠতে পারবো না।'

'হাদীদ!– শারীনা ঝাঝালো গলায় বললো– তুমি চিন্তা করছো কিসের ? একে তো আমিই কতল করতাম কিন্তু সে দুশমন তোমাকেই মনে করছে। এজন্য তুমিই ওকে হত্যা করো।'

'আমার একটা কথা হয়তো তোমার ভালো লাগবে না শারীনা! – হাদীদ গম্ভীর হেসে বললো– যারা আমাকে কতল করতে এসেছিলো তাদেরকে তো তুমিই কতল করে দিয়েছো। আমার ধর্ম এই অক্ষম ব্যক্তির ওপর হাত উঠাতে নিষেধ করে, যে নিজ পায়েই দাঁড়াতে পারছে না এবং নিজের অক্ষমতার জন্য করুণা ভিক্ষা চাইছে। আরেকটা ব্যপার হলো, এই সমস্ত এলাকায় আমার ও ওর ফৌজ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত। এজন্য এর পুরো এলাকা যুদ্ধের ময়দানের মতো। যদি এ লোক আমার সঙ্গে লড়তো তাহলে হয় আমি কতল হতাম না হয়

সে। কিন্তু এখানে ব্যাপার দাড়িয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তোমাকে পাওয়ার জন্য সে আমাকে কতল করতে চেয়েছিলো। অথচ আমি অন্য এক আকীদা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছিলাম। সেই আকীদা ও উদ্দেশ্যের পটভূমিতে এ অক্ষম ব্যক্তিকে হত্যা করা আমার জন্য কবীরাহ গুনাহ। ওকে এ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও। এসো বিশ্রামের এখনো অনেক সময় রয়ে গেছে।'

হাদীদের কথাগুলো শারীনার মোটেও মনোপুতঃ হলো না। 'ঠিক আছে ওকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দাও– শারীনা বললো গম্ভীর মুখে– তুমি গিয়ে ঘোড়ার ওপর জিন চাপিয়ে ঘোড়া এখানে নিয়ে এসো।'

ঘোড়া একটু দূরে কয়েকটি গাছের পেছনে বাঁধা। একটু ঘোর পথে যেতে হয়। হাদীদ কৈলাশের ঘোড়ায় জিন বেধে ঘোড়া আনতে চলে গেলো। ভালো করে জিন বেঁধে ঘোড়া এনে দেখলো, কৈলাশ শুয়ে আছে। চারপাশ রক্তে ভেজা। মাথাটি দেহ থেকে দূরে। তিক্ত চোখে শারীনার দিকে তাকালো হাদীদ।

'এজন্যই আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে?'– হাদীদের গলায় ঝাঝ।

'ধর্মবিশ্বাসের বিধান তাদের সঙ্গেই চলে যাদের মধ্যে ধর্ম আছে– শারীনা তার কাজের ব্যাখ্যা দিলো– তুমি তোমার ধর্মের কাছে দায়বদ্ধ। আমি তো আর দায়বদ্ধ নই। ওকে কতল করে আমি তো ওর ভালোই করেছি। ওকে যদি ঘোড়ায় বসিয়ে ছেড়েও দিতাম তবুও সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় খুব কষ্ট পেয়ে মরতো।'

'এমনিই যখন মরতো তাহলে তুমি মারলে কেন?'

'তুমি একথাটাও বুঝতে পারছো না হাদীদ! ওকে যদি আমরা ঘোড়ায় তুলে ছেড়ে দিতাম সে আমাদের জন্য ভয়ংকর বিপদ হয়ে উঠতো। লড়াই থেকে পালিয়ে আসা রোমী ফৌজের সঙ্গে তার অবশ্যই দেখা হতো। তখন সে প্রথম যে কাজটা করতো তাহলো, সে আমাদের পেছনে ওদেরকে লেলিয়ে দিতো। তাই ওকে কতল না করে উপায় ছিলো না।'

✪ ✪ ✪

মুসলমানদের কাছে পরাজিত রোমী ফৌজরা পুরো সিরিয়া অঞ্চল খালি করে দিয়ে কিছু বড় বড় কেল্লা বেষ্টিত শহরে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। যেগুলো এখনো রোমকদের দখলে ছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইন্তাকিয়া, হলব (আলেপ্প), মুরিস এবং বৈরুত।

হেরাকল্ এসব স্থানে ফৌজদের ভাগ ভাগ করে মোতায়েন করেন এবং হুকুম দেন এখন থেকে ফৌজ একত্রিত না থেকে ছোট ছোট দলে চারদিক ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম ফৌজের সংখ্যা যেহেতু কম তারা রোমীয়দের পেছনে এভাবে দলে দলে ধাওয়া করতে যেয়ে আরো কমে যাবে। তখন তাদেরকে শায়েস্তা করা সহজ হবে।

এরপর হেরাকল 'রাহায় পৌঁছে ভিন্ন হুকুম দেন যে, তার সমস্ত ফৌজ একত্রিত করা হোক। তারপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের ওপর হামলা করা হোক। তিনি সবখানে পয়গাম পাঠিয়ে দেন। সমস্ত ফৌজ যাতে রাহায় এসে সমবেত হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও কোন কাসেদ সন্তোষজনক কোন সংবাদ নিয়ে আসেনি। হেরাকল যে শারীনার মার সাথে সেদিন রহস্য করে বলেছিলেন– তিনি আগন্তুকদের অপেক্ষায় আছেন– এ আগন্তুক মানে হলো তার কাসেদ।

হেরাকলের এ চাল ছিলো একজন শ্রেষ্ঠ রণাঙ্গণবিদের চাল ; এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলিম সিপাহসালার তার এ চাল গোড়াতেই ধরে ফেলেন। যেসব স্থানে রোমী ফৌজ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেসব স্থানে মুসলিম সিপাহসালার মুজাহিদদেরকেও ছোট ছোট দলে মোতায়েন করেন। এর অর্থ হলো, বিক্ষিপ্ত রোমীয় ফৌজের পথ মুজাহিদরা বন্ধ করে রেখেছে। তাদের কাছে শত পয়গাম পৌঁছলেও তারা রাহা বা অন্য কোথাও সমবেত হতে পারবে না। এসব ফৌজি এলাকার কোথাও কোথাও লড়াই হচ্ছে এবং রোমীয়রা মার খেয়ে পালিয়েও আসছে। রণাঙ্গণ থেকে পলাতক ফৌজের অধিকাংশের গন্তব্য ইন্তাকিয়ার দিকে। ইন্তাকিয়া সিরিয়ার বড় বড় শহরগুলোর একটি। প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে শহরটি অসম্ভব মজবুত। এর উঁচু উঁচু দেয়ালগুলো পর্যটকদের জন্যও দেখার মতো বস্তু। এছাড়াও শহরটির চারদিকে পাহাড়। পাহাড়গুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন শহরকে পাহাড়ের কোলে আগলে রেখেছে পরম মমতায়। এ ধরণের শহর জয় করা তো দূরের কথা অবরোধ করাও শত্রু পক্ষের জন্য আত্মহত্যার শামিল। এ কারণেই মুজাহিদীনে ইসলামের তলোয়ারের রোষানল থেকে বেঁচে যাওয়া রোমী ফৌজদের গন্তব্য এখন ইন্তাকিয়ার দিকে।

ইন্তাকিয়ায় রোমী ফৌজের সংখ্যা দিন দিন এতই বেড়ে চলেছে যে, শহরের সেনা ছাউনিতেও তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এসব খবর সিপাহলার আবু উবাইদা (রা) এর কাছে নিয়মিতই আসছিলো। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)

সহ অন্যান্য সালারদের পররামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন, ইন্তাকিয়া অবরোধ করা হবে। তা যতই ঝুকিপুর্ণ হোক। না হয়, এদেরকে দম ফেলার সুযোগ দিলে এরা বিষাক্ত নাগের মতো ছোবল মারবে এবং জবাবী হামলা করে পশ্চাদপদতাকে ক্ষীপ্রতায় রূপ দেবে। আবু উবাইদা (রা) তার লশকরকে সমবেত করে একটি ভাষণ দিলেন–

'ইসলামের সৈনিকরা! এটা নবী আলাইহিমুসসালামের পবিত্র ভূমি। আল্লাহর রমহমতের অমীয় ধারা এ যমিনকে সিক্ত করে যাচ্ছে এবং সিক্ত করবেও। শর্ত হলো, এ পবিত্র এলাকাকে নাপাক লোকদের থেকে দখলমুক্ত করা। ওদিকে তোমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা অগ্নিপূজকদের এলাকা পবিত্র করে দিয়েছে। অথচ এদিকে এখনো আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করতে পারিনি। নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করো, কার বাদশাহী কল্যাণকর ? আল্লাহর বাদশাহী না পাপিষ্ঠ বান্দাদের....... আমাদের ঈমানের দাবী, আমরা আল্লাহর বাদশাহী চাই। একমাত্র এর মাধ্যমেই মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করা যাবে....

'এটা মনে করো না যে, এরা রোমীয় খ্রিস্টান বলে এরা আহলে কিতাব। হযরত ঈসা (আ) এর অনুসারীর দাবীদার হলেও তারা হযরত ঈসা (আ) এর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে। রোমের এক শাহী খান্দান আল্লাহর এ পবিত্র ভূমিকে তার বাদশাহীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহর দীনের সবচেয়ে বড় দুশমন এরাই। তোমরা ওদেরকে এতদিন একের পর এক পরাজয় উপহার দিয়ে এসেছো। কিন্তু এরা এখন এমন এক আশ্রয়স্থল বেছে নিয়েছে যা সত্যিই এক অপরাজেয় দুর্গ– শহর। আমি নিজে তোমাদেরকে এমন ভয়ংকর বিপদজনক অবরোধে যাওয়ার কথা বলতে পারবো না। কারণ, এ অবরোধ খুন ও জানের নজরানা চাইছে। কিন্তু তোমরা জেনে রাখো, মহান আল্লাহ সরাসরি তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, ঐ পাহাড়সমূহকে টুকরো টুকরো করে দাও আল্লাহর দীনের দুশমনদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছে।'

মুজাহিদরা আরেকবার জীবন মরণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

সেদিনই সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) তার তাবুতে এসে সালারদের সঙ্গে ইন্তাকিয়ার অবরোধ বিষয়ে সলা পরামর্শ করছিলেন। এ সময় এক সিপাহী এসে জানালো, হাদীদ ইবনে মুমিন রাহা থেকে এসেছে। সঙ্গে একজন রোমী মেয়েও আছে। আবু উবাইদা তখনই তাদেরকে ডাকলেন। হাদীদ শারীনাকে নিয়ে

তাঁবুতে প্রবেশ করলো। শারীনা তার কাপড় দিয়ে নিজেকে কোনরকমে পর্দাবৃত করে নিয়েছিলো।

মুজাহিদদের মাঝে হাদীদের যে পরিচিতি আছে সেটাকে পরিচিতি নয় প্রসিদ্ধি বলা যায়। নৈশ হামলাকারী হিসেবে হাদীদ বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তার বিচক্ষণতা, ক্ষিপ্রতা, অদম্য দুঃসাহস সম্পর্কে সবাই ভালো করেই জানতো। এছাড়াও সে গুপ্তচরবৃত্তিতে দারুণ সুখ্যাতি অর্জন করে। শত্রুর কলিজায় ঢুকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য আদায় করে নেয়ার দুর্লভ গুণও তার মধ্যে আছে। সে বন্দী হওয়ার মতো মুজাহিদ ছিলো না। কিন্তু নৈশ হামলায় সে এমন বেপরোয়া যে, দুশমনের পেটের ভেতর ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ে আসতো। এভাবেই সে রোমীদের হাতে বন্দী হয়। সিপাহসালার ও সালারদের কাছে হাদীদ এজন্য অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্র। হাদীদ তাঁবুতে ঢুকে সিপাহসালার ও সালারদের সঙ্গে মুসাফাহা করলো।

'এ মেয়ে কে ? আর তোমার সঙ্গে কেন এসেছে ?' আবু উবায়দা (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

হাদীদ তার বন্দী হওয়া থেকে নিয়ে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা শোনালো। আবু উবাইদা যখন শুনলেন শারীনা এভাবে স্বেচ্ছায় তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেছে তখন আবু উবাইদার সন্দেহ হতে লাগলো, এ মেয়ে যেমন সুন্দরী আবার শাহী খান্দানের, এ নিজে কোন গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্যে আসতে পারে অথবা নাশকতামূলক কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিন্তু এ সন্দেহের কথা তিনি প্রকাশ করলেন না।

শরীনাও মুসলমানদের ব্যাপারে তার জযবা অনুভূতি ইত্যাদি বিস্তারিত সবাইকে শোনালো। সে এও জানালো যে, সে শাহী খান্দানের মেয়ে নয়। তার মাকে এক কাফেলা থেকে অপহরণ করে রোম বাদশাহ বিয়ে করেন।

'একটু দাঁড়াও, তোমরা কি বলছো ?... হেরাকল এখন রাহায় ? – আবু উবাইদা (রা) হঠাৎ করে বলে উঠলেন।

তিনি ওদের কাহিনী শোনায় এতই বিভোর ছিলেন যে, প্রথমে হেরাকলের তথ্যের প্রতি কোন খেয়ালই করেননি। পরে মনে পড়তেই তিনি চমকে উঠেন। কারণ তার মতো অন্যান্য সালাররাও হয়রান হয়ে পড়লেন যে, হেরাকলের এখন তো রাহায় না থেকে ইন্তাকিয়ায় থাকার কথা ছিলো। এ খবরটি সালারদের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক ছিলো। কারণ ইন্তাকিয়ায় যে রোমী জেরারেল আছে তার রণাঙ্গণীয় বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা মাঝারি পর্যায়ের।

ঐতিহাসিক ও যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন, হেরাকল যেমন অত্যন্ত শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন তেমনি ছিলেন অসম্ভব বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ জেনারেল। যেদিকেই তিনি রুখ করতেন বিজয় তার পদতলে এসে চুমু খেতো। কিন্তু মুসলমানরা একের পর এক পরাজয়ের এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছে যে, তিনি মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেছেন। সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এজন্য হেরাকলের মানসিক অবস্থার কথা ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা আমাকে জিজ্ঞেস করুণ– শারীনা বললো– যে লোক নিজের সঙ্গে সব সময় একজন শাহী গণক ও শাহী জ্যোতিষী রাখে এবং সব ফায়সালা তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও কোষ্ঠীর বিচারে করে থাকেন তার মানসিক অবস্থা বুঝাটা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়– শারীনা একথা বলে হেরাকল যে এক গণককে তার হাতে হত্যা করেছেন এবং আরেক জ্যোতিষী তার সামনে কি বক্তব্য দিয়েছে এবং হাদীদের হেরাকলের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কথা ইত্যাদি সব বিস্তারিত শুনিয়ে বললো– মানসিক দিক দিয়ে হেরাকলের পা উপড়ে গেছে এবং মনে মনে পরাজয়কে তিনি মেনে নিয়েছেন। এখন বেকায়দায় পড়ে হাত পা মারছেন। এখন শুধু তিনি কোন মুজিযার অপেক্ষায় আছেন।'

হেরাকলের মানসিক অবস্থার এ তথ্য সিপাহসালারের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিলো। শারীনার ওপর থেকে তার সন্দেহের মাত্রা অনেকটাই কমে গেলো। শারীনার সঙ্গে সিপাহসালার অত্যন্ত মমতাপূর্ণ আচরণ করলেন এবং মহিলা ছাউনিতে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, তার মর্যাদার প্রতি যেন সবাই দৃষ্টি রাখে

✪ ✪ ✪

ঘটনাবহুল কত দিন রাতই চলে যাচ্ছে কিন্তু হেরাকলের জন্য কোন পয়গাম নিয়ে আসছে না কেউ। একদিন তাকে সংবাদ দেয়া হলো, ইন্তাকিয়া থেকে জেনারেল রাস্তীন এসেছে। হেরাকল যেন লাফিয়ে উঠলেন। তিনি তাকে ভেতরে আসার নির্দেশ না দিয়ে নিজেই বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু তার সামনে যে জেনারেল রাস্তীন দাঁড়িয়ে আছে তাকে যেন তিনি চিনতে পারলেন না। তার চোখ মুখ কেমন হলদেটে। যেন দেহে এক ফোটা রক্তও নেই।

'তুমি কি যখমী রাস্তীন ? – হেরাকল তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

'না কায়সারে রোম! দেহে কোন যখম নেই, যখম মনে'– রাস্তীন ক্লান্ত গলায় বললো।

হেরাকলের হুকুমে রাস্তীনকে দু'জন প্রহরী ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে বসলো। হেরাকল তাকে শরাব দিলো। এক ঢোক শরাব পান করে সে বললো,

'কায়সারে রোম! ইন্তাকিয়া আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে।'

হেরাকল হা করে রাস্তীনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার বা আমার সঙ্গী অন্য জেনারেলদের ওপর এ পরাজয়ের দায়িত্ব চাপানোর আগে আমার পুরো কথা শুনে নিন– রাস্তীন অনুনয় করলো– আমি এখন মুসলমানদের বীরত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। ওরা আমাদের চেয়ে একেবারেই কম ছিলো সংখ্যায়। আর আমাদের ফৌজ এত বেশি ছিলো, এর সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারবো না। কারণ চারদিক থেকে রোমী ফৌজ পালিয়ে ইন্তাকিয়ায় আসছিলো। আমার বিশ্বাস মুসলমানরাও জানতো, ইন্তাকিয়ায় এত অসংখ্য ফৌজ এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে ইন্তাকিয়া এতো মজবুত শহর যে, বাইরের কোন হামলাকারী এ শহর নিতে পারব না। এসব জানা সত্ত্বেও মুসলমানরা হামলা করেছে।'

'তোমরা কি আমার হুকুমের অনুসরণ করোনি ?– হেরাকল রোষভরা কণ্ঠে বললেন– আমি বলেছিলাম, মুসলমানরা ইন্তাকিয়ার দিকে এগুলে ওদেরকে ইন্তাকিয়া পর্যন্ত পৌছতে দেবে না। ফৌজকে বাইরে বের করে তাদের ওপর হামলা চালাবে এবং পাহাড় ও খোলা পাথরি এলাকা থেকে পুরো ফায়দা উঠাবে।'

'হ্যাঁ কায়সারে রোম! আমরা আপনার হুকুমেরই অনুসরণ করেছি। যখনই সংবাদ পেয়েছি মুসলমানরা ইন্তাকিয়ার দিকে রুখ করেছে তখন আমাদের ফৌজকে তৈরি করে বাইরে নিয়ে এসেছি। আপনার নিশ্চয় মনে আছে, পাহাড়গুলোর মাঝখানে প্রশস্ত একটি ময়দান আছে। আমরা ফৌজকে ঐ ময়দানে রণাঙ্গণীয় বিন্যাসে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ইন্তাকিয়ায় এ ময়দান দিয়েই যেতে হবে। এর আশে পাশে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়...

'মুসলমানদের দেখে তো খুশীতে আমরা গদগদে। সংখায় তারা নিতান্তই কম। কয়েকজন জেনারেল বললেন, মুসলমানরা জাহেল লোক। ইন্তাকিয়ায় আমরা কত ফৌজ একত্রিত করেছি এটা ওরা জানে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এমনটা মনে করি না। তবে আমি এ ভেবে খুশি হয়েছি যে, ওরা যেকোন ভুলের

মধ্যে থেকে আমাদের সামনে এসে গেছে। এ ময়দানেই ওদেরকে মিশিয়ে ফেলা কঠিন কোন কাজ নয়.......

'আমরা এ চাল দিলাম যে, মধ্য ভাগের সেনাদলকে আমরা হামলার হুকুম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উভয় পার্শ্বের সৈন্যদের ডান ও বাম দিক দিয়ে মুসলমানদের পেছনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে ঘিরে নেয়ার হুকুম দেয়া হলো। কিন্তু মুসলমানরা আমাদের প্রথম দলের হামলাই বরদাশত করতে পারলো না। লড়তে লড়তে তারা পিছু হটতে লাগলো। তাদের ওপর চাপ আমরা আরো বাড়িয়ে দিলাম। ওরা পাহাড়ের ভেতর চলে গেলো। আর আমাদের ফৌজ তাদের মাথার ওপর সওয়ার হয়ে রইলো। আসলে মুসলমানরা পালানোর চেষ্টা করছিলো...

'কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ফৌজ যখন পাহাড়ের ভেতর চলে গেলো তখনই আমাদের টনক নড়লো যে, মুসলমানরা আমাদেরকে একটি জালের মধ্যে ফাঁসিয়েছে। যার থেকে সহজে বের হওয়া সম্ভব হবে না। তাদের চালটা ছিলো, – তারা অল্প অল্প কয়েকজনের ছোট ছোট দল আমাদের সামনে ছেড়ে দেখাতে লাগলো তারা পিছু হটছে। আর আমরাও তাদের পিছু পিছু অধিকাংশ ফৌজ পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলাম। আর শ্লোগান দিতে লাগলাম, একজন মুসলমানও এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। মুসলমানরা পাহাড়ের ঢালে এবং ঘন পাহাড়ি বৃক্ষে তীরান্দায ও বর্শাধারীদের লুকিয়ে রেখেছিলো। হঠাৎ করেই আমাদের ওপর বর্শা ও তীর বৃষ্টি শুরু হলো। আমাদের ফৌজের খুব কম সৌভাগ্যবানই এ মরণ ফাঁদ থেকে বের হতে পেরেছে।.....

'এদিকে আমাদের এক জেনারেল ঘাবড়ে গিয়ে এ আহম্মকি কাজ করলো যে, অবশিষ্ট ফৌজকেও মুসলমানদের পিছু ধাওয়ার জন্য পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলো। আমরা কিছুসংখ্যক বড় কষ্টে তাদের বেষ্টনী থেকে বের হয়ে এলাম। আমাদের সেনা শৃংখলা তো অনেক আগেই চুরমার হয়ে গেছে। যারা বেঁচে ছিল তারা যার যার মতো বের হওয়ার চেষ্টা করছিলো ....

'লড়াইয়ে আমরা হারলেও ইন্তাকিয়া কোন মূল্যেই হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না। যতজনকে পারলাম একত্রিত করলাম। সংখ্যায় খুবই কম রয়ে গিয়েছিলো। মৃতের ও যখমীর সংখ্যা কেউ কখনো বের করতে পারবে না। যা হোক, যতজনকে পারলাম সঙ্গে নিয়ে ইন্তাকিয়ার দিকে গেলাম। আমরা কেল্লার দরজায় গিয়ে দেখলাম সমস্ত দরজা বন্ধ। দরজা খুলে দেয়ার জন্য অনেক

চিৎকার চেচামেচি করলাম। কিন্তু প্রাচীরের ওপর থেকে আমাদের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। তখনই বুঝলাম মুসলমানরা কেল্লা দখল করে নিয়েছে।'

'তাহলে কি ইন্তাকিয়া আমাদের হাত থেকে চলেই গেলো ! গর্ব করার মতো মজবুত কেল্লা তো আমাদের এটাই ছিলো। এটা তোমাদের অযোগ্যতার ফল। সবগুলো তোমরা বুযদিল – হেরাকল্ সামনে আর কথা খুঁজে পেলেন না।

'আমার সঙ্গের দুই জেনারেল নিহত হয়েছে। তৃতীয়জন হয়েছে যখমী। পরাজয়ের দোষ আমাদের ওপরই চাপাবেন এটা জানি। আপনার আক্রোশ ও গজব কিভাবে আমার ওপর পড়বে এও জানি। তবুও পরাজয়ের কারণ বলবো আপনাকে.... আপনি বলেছিলেন,মুসলমানরা যাতে ইন্তাকিয়া অবরোধ করতে না পারে। কারণ অবরোধ হলে কত দিন কেল্লাবন্দী হয়ে থাকতে হবে তা তো জানা নেই। আমাদের কাছে এত সময় নেই। আসলে এমন মজবুত কেল্লা থেকে বেরিয়ে লড়াই করা আমাদের চরম বোকামি ছিলো। এর শক্ত শাস্তি আমরা পেয়েছি ......

'কায়সারে রোম! একটা দিক আমরা সব সময়ই উপেক্ষা করেছি। আপনি শহরবাসীর ওপর করসহ অন্যান্য খাযনা এত বেশি চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, লোকেরা দারিদ্রের শেষ সীমানায় পৌছে গেছে। এরপর ধর্মীয় ব্যাপারে তো আপনার হস্তক্ষেপ ছিলোই। লোকদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, বাদশাহর শাহী খান্দান ও তার জেনারেলরা নিজেদের ভোগ বিলাসের উপকরণ পুরণের জন্য জনগণকে না খাইয়ে মারছে। আমাদের সব সম্পদ রোমে যাচ্ছে। আমি নিজেও দেখেছি। রোমের যেসব ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে তারা নিজেদেরকে এখানকার লোকদের বাদশাহ মনে করে।'

'অর্থাৎ ওখানকার লোকেরা তোমাদেরকে কোনরকম সহযোগিতা করেনি। কথা সংক্ষেপ করো। দীর্ঘ কথার সময় নেই'– হেরাকল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

'শহরবাসীরা সহযোগিতা তো করেইনি বরং আমাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলো– রাস্তীন শুরু করলো– অবরোধে থেকে আমরা লড়াই করলে শহরবাসীরা নিশ্চিত শহরের দরজা খুলে দিতো। আমি নিশ্চিত, শহরবাসীরা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়ে শহরে নিয়ে গেছে। অথচ সেখানে কোন মুসলমান লোকই ছিলো না।'

'আমি আরেকবার সুযোগ পেয়ে নিই' – হেরাকল বললেন– ওরা শাহী খান্দানের বদনাম করে। ওদের রগ রেষা থেকে রক্ত চিবিয়ে বের করবো।'

'কায়সারে রোম! – রাস্তীন বললো– আজ আপনি আমার রগ থেকেও রক্ত বের করুন তবুও আমি সে কথা বলবো লোকে যা বাদশাহর মুখের সামনে বলার দুঃসাহস দেখায় না। বাদশাহর সামনে ইনআম পাওয়ার লোভে শুধু বাদশাহর তোষামোদিই করে। কিন্তু আপনি আমাকে সেনাবাহিনীতে অনেক উঁচু পদাধিকার দিয়েছেন, তাই আমি যদি আপনার তোষামোদি করে বাস্তবতার ওপর পর্দা দিয়ে রাখি তাহলে বড় নিমক হারামী হবে।'

'তুমি কি সহসা আসল কথায় আসতে পরো না ?' – হেরাকল গর্জে উঠলেন।

'তাহলে শুনুন, শত্রুকে শত্রু বলে মন্দ বলা যাবে না। শত্রুরা আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করে আমাদের পিছু ধাওয়া করে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। তাই দেখতে হবে কোন শক্তি বলে দুমশন এ সফলতা পাচ্ছে আর আমরা কেন সে শক্তি থেকে বঞ্চিত। আমরা জনগণের রক্ত চুষে খাওয়ার সংকল্প করি, আর শত্রুদল তাদের রগ রেষায় রক্ত দান করে। আমাদের শত্রুদের ধর্ম হলো, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয়া।'

'তাহলে কি আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো ? তুমি কি খ্রিষ্টের চেয়ে ইসলামকে উত্তম মনে করো ? – হেরাকলের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ।

'বাদশাহে রোম! এখানে কোনটা উত্তম সেটা প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন হলো, তারা কে যারা মানব ও মানবতাকে পূর্ণ মর্যাদা ও মহিমা দান করে। তারা হলো মুসলমান। তারাই মানুষকে খোদার সৃষ্টি হিসেবে মানুষের মর্যাদা দেয়। এজন্য দেখা যায়, শামের এক শহরের লোক অন্য শহরে পৌঁছে লোকদের বলতে থাকে, এখনি মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। কারণ, তারা মানুষকে পূর্ণ মানবাধিকার দান করে। তারা রোমকদের মতো রক্তচোষা বাদশাহ নয়। আর মুসলমানরা যে এলাকাই জয় করে সেখানে লুটপাট চালায় না এমনকি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না।..... কায়সারে রোম! তারা বিজিত এলাকার লোকদের সঙ্গে এমন সশ্রদ্ধ আচরণ করে যে, লোকেরা তাদেরকে স্থান দেয় তাদের হৃদয় রাজ্যে। আর আমরা কি করি ? আমরা প্রথমে ঘরে ঘরে লুট পাট চালাই এবং সুন্দরী মেয়েদের ধরে ধরে কিছু নিজেরা ভোগ করি আর কিছু শাহী মহলে পাঠিয়ে দিই। আমার গুপ্তচররা জানিয়েছে, ইন্তাকিয়ার লোকেরা মুসলমানদের শুধু পছন্দই নয় তাদের অপেক্ষায় ছিলো। আমাদের পরাজয়ের এটাই কারণ।'

✪ ✪ ✪

সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা) ইন্তাকিয়া শহর অল্প সময়ই গুছিয়ে ফেলে লোকদের ওপর শুধু নিরাপত্তা কর আরোপ করে অন্যসব কর মাফ করে দেন। তারপর তিনি চলে যান 'হলবে।' কিছু দিন পর ইন্তাকিয়া থেকে তাকে জানানো হয় যে, কিছু উগ্র খ্রিষ্টান লোকদেরকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দিচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তা কর দিতেও অস্বীকার করছে। আবু উবাইদা (রা) তার নায়েবে সালার ইয়াজ ইবনে গনম (রা) কে বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন অপ্রয়োজনীয় কোন বাড়াবাড়ি যেন না হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হযরত উমর (রা)কেও ইন্তাকিয়ার বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়ে এখানকার বিদ্রোহীদের কথা জানালেন।

উমর (রা) ফিরতি পয়গামে লিখে পাঠালেন, লোকদেরকে প্রয়োজনীয় সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হোক। আর কিছু লোকের জন্য শুভেচ্ছা ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। এছাড়া শহরে এক ব্যাটালিয়ান সেনাবাহিনী রেখে দাও। যাতে লোকেরা এটা মনে না করতে পারে যে, মুসলমানদের কাছে এত ফৌজ নেই যে, তারা বিজিত এলাকার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ফৌজ মোতায়েন রাখতে পারে না। যা হোক খুব সহজেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। আরো কয়েকটি এলাকায় বিদ্রোহ হয়। সেখানেও বিদ্রোহ দমন করা তেমন কঠিন হয়নি।

ইন্তাকিয়া হামলায় আবু উবাইদা (রা) এর সঙ্গে কিংবদন্তী বীর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)ও ছিলেন। আবু উবাইদা তাকে আরেক দিকে পাঠিয়ে দেন যেদিকে রোমী ফৌজ একত্রিত হয়ে তাজাদম হওয়ার প্রয়াস নিচ্ছিলো।

এ দিকে হেরাকল জেনারেল রাস্তীনের কথা শুনে এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তিনি মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেন। যা হোক জেনারেল রাস্তীনকে অন্য আরেক অভিযানে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন কোন কাসেদ কোন পয়গাম নিয়ে আসে কিনা। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর দীর্ঘ হতাশার মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হয়।

অবশেষে হলব থেকে এক যখমী ফৌজি অফিসার এলো। সেও রাস্তীনের মতোই কাহিনী শোনালো। আরো শোনালো, সেখানকার ফৌজের ওপর মুসলমানদের এমন ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, তারা জমে লড়াইও করতে পারেনি। হেরাকল হলব বাসীর অবস্থা জানতে চাইলে অফিসার জানালো, রোমী ফৌজের বিরুদ্ধে ছিলো শহরবাসী। কিছু কিছু লোক তো মুসলমানদের সহেযাগিতাও করেছে। হেরাকল এর কারণ জানতে চাইলেন। রাস্তীন বড়

জেনারেল ছিলো বলে সত্য কথা বলার সাহস পেয়েছিলো। আর এ তো মামুলি অফিসার। উচিত কথা তো দূরের কথা যে কোন কথা বলতেই কলিজা কাঁপতো। হেরাকল ব্যাপার বুঝে বললেন, তুমি নির্ভয়ে এর কারণগুলো বলো, ভবিষ্যতে যাতে আমরা এ কারণগুলো দূর করতে পারি।

'শাহেন শাহে মুআজ্জম ! – অবশেষে অফিসার বললো– আমাদের পরাজয়ের সবেচেয়ে বড় কারণ হলো, যুদ্ধের ময়দান থেকে জান কুরবানীকারী সৈনিকরা তাদের শাহেনশাহের সামনে সত্য বলার সাহস পায় না। আপনি আমাকে সত্য বলার হুকুম দিয়েছেন। খুব সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলবো– ....

'জনগণ বলে, আমরা বাদশাহদের নয় শাসন চাই আল্লাহর প্রেরিত বান্দাদের। আমরা শুনেছি, মুসলমানদের ধর্মে কোন বাদশাহীর অস্তিত্ব নেই। বরং তারা নিজেদের মতোই যোগ্য কাউকে নিজেদের শাসক বানিয়ে নেয়। তারা প্রজাদের পেট থেকে সব কেড়ে নেয় না বরং প্রজাদের পেট ভরানোর চেষ্টা করে।'

হেরাকল তার উদ্ধত মাথা নামিয়ে ফেললেন। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো তিনি পরাজয়ের তিক্ততা মেনে নিয়েছেন।

এক দু দিন পরই মুরিস থেকে এক রোমী কাসেদ এলো। কেল্লাবেষ্টিত অত্যন্ত মজবুত শহর মুরিসেও অনেক ফৌজের সমাবেশ ঘটে। কাসেদ হেরাকলকে জানালো, বিখ্যাত সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলমানদের এক লশকর কেল্লা অবরোধ করতে এলে সেখানকার জেনারেল ফৌজকে হুকুম দিলো, এরা সংখ্যায় খুবই কম। এদেরকে অবরোধের সুযোগ না দিয়ে কেল্লার বাইরে গিয়ে হামলা করে শেষ করে দাও। রোমী ফৌজ হামলা করতেই মুসলমানরা পিছু হটতে হটতে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ছড়িয়ে পড়তে পড়তে রোমী ফৌজকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে সমানে কচুকাটা করতে লাগলো। যে মুসলমানরা রোমীদের পেছনে চলে গিয়েছিলো তারা কেল্লায় ঢুকে পড়লো।

এদিকে রোমীরা দৌড়ে কেল্লার দিকে পালিয়ে আসতেই তাদের ওপর কেল্লার প্রাচীর থেকে তীর বৃষ্টি আসতে লাগলো।

এভাবে সালার ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) এর নেতৃত্বে সীমান্ত শহর বৈরুতও হামলা করা হয়। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তখন ছিলেন দামেশকে। সিপাহসালারের হুকুমে বৈরুত গিয়ে বৈরুত শহর জয় করেন।

✪ ✪ ✪

হেরাকলকে রাহায় সংবাদ দেয়া হলো, ইন্তাকিয়া, হলব, মুরিসের পর বৈরুতও মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। অর্থাৎ সীমান্তের আর কোন শহরই রোমীদের হাতে নেই। মিসর থেকে যে হেরাকল সেনাসাহায্য আনবে সে পথও আপাতত বন্ধ। কারণ সীমান্ত এলাকাগুলোয় মুসলমানরা এখন খুব বেশি তৎপর।

হেরাকল তার উপদেষ্টাদের ডেকে বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে তাদের পরামর্শ চাইলেন। এ অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ফৌজকে কোথায় একত্রিত করা যায় এবং একত্রিত করা হলেও কি তারা লড়ার উপযুক্ত আছে কি না।

এক উপদেষ্টা পরামর্শ দেয়ার জন্য দাঁড়ালো। সে সর্বপ্রথম হেরাকলের স্তুতি জ্ঞাপন করে মুসলমানদেরকে গালমন্দ করলো। তারপর জানালো, রোমী ফৌজকে পৃথিবীর আর কোন শক্তি পরাস্ত করতে পারবে না।

'এই মিয়া উঠে দাঁড়াও– হেরাকল তার উপদেষ্টাকে বললেন মুখ কুচকে– এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও এখান থেকে। আর কখনো আমার সামনে আসবে না– এবার অন্য উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্যে বললেন– আমাকে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক পরামর্শ দাও।'

আমীর উমরা উপদেষ্টা সবার ওপর যেন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সত্য বলার মতো সাহস তাদের কারো মধ্যে নেই। ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে রইলো যে, এই বুঝি তাদের ওপর হেরাকল গর্জে উঠবে। হেরাকলও তাদের মনের অবস্থা টের পেলেন যে, এরা তোষামোদি করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, এরা বাস্তব কথা বলতে ভুলে গেছে।

'আমরা এখন আর কারো সঙ্গে লড়তে পারবো না– হেরাকল তার উপদেষ্টাদের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে যেন ফায়সালা শোনালেন– একটাই পথ খোলা রয়েছে। তাহলো শাম-সিরিয়া থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং মিসরে গিয়ে ফৌজকে সংগঠিত ও প্রস্তুত করে আবার শামে হামলা করা।'

'হ্যা, আরেকবার আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে– এক বর্ষীয়ান উপদেষ্টা বললেন– পারসিকরা আমাদের থেকে শুধু শামই নয় মিসরও ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তখন আপনি বাদশাহ ছিলেন না। কিন্তু বাদশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে সালতানাতের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেন এবং ফৌজ সংগঠিত করে পারসিকদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে শাম ও সিরিয়া কব্জা করে নেন। শাম

মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে এটা আমরা মেনে নিলাম। মিসর তো আছে আমাদের হাতে। তাই এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার ফায়সালাই সঠিক।

সব উপদেষ্টা একেই সমর্থন করলো এবং বললো, আমরা যদি এখানে এই আশায় ফৌজ সংগঠিত করি যে, সম্মিলিতভাবে হামলা করে মুসলমানদেরকে পরাস্ত করবো, এতে ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, যে ফৌজ এখনো জীবিত আছে তারাও মারা পড়বে।

হেরাকল কস্তুন্তুনিয়া (কন্স্টান্টনোপল) যাওয়ার হুকুম জারী করলেন। কস্তুন্তুনিয়া (কন্স্টান্টনোপল) রোমের বিশাল এক কেন্দ্রীয় শহর। যা শত্রুর শ্যান দৃষ্টি থেকে তখনো রক্ষিত ছিলো। কস্তুন্তুনিয়া যাওয়ার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাদরেল যুদ্ধ শক্তি হেরাকল হয়তো তখন ভাবছিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন থেকেই তিনি তলোয়ার ধরেছেন তখন থেকেই তার সালতানাতের পতন শুরু হয়ে গেছে।

হেরাকল তখন মুসলমানদেরকে আরবের বুদ্ধু ও মরু তস্কর বলতেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর যুগে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধেই হেরাকল তার এ দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশাল এক সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠান। তার এক বিখ্যাত জেনারেল তাযারুক ছিলো রোমীয়দের নেতৃত্বে। হেরাকল নিজে রইলেন শামের সীমান্ত এক শহরে। হেরাকল নিশ্চিত ছিলেন। এ যুদ্ধেই মুসলমানদেরকে চির দিনের জন্য খতম করে দেয়া যাবে। কিন্তু যুদ্ধে তার গর্বের জেনারেল তাযারুক নিহত হয় এবং তার অর্ধেক ফৌজ কচুকাটা হয়। আর বাকীরা জান নিয়ে পালায়। হেরাকল নিজেও মুসলমানদের ওপর চড়াও হতে পারতেন। কারণ মুসলমানরা তখন অনবরত লড়াইয়ে অসম্ভব ক্লান্ত। বাহ্যত রুখে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না। কিন্তু হেরাকলের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে তখন এমন ভীতি সঞ্চার হয় যে, তিনি আশংকা করতে লাগলেন, মুসলমানদের সামনে গেলে ইয়ারমুকেই তার দাফন হয়ে যাবে।

তার ভঙ্গুর স্মৃতিতে হয়তো আরো আগের ঘটনার কথা জেগে উঠতে পারে। যখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত দাহিয়া কলবী (রা) এর মাধ্যমে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। হেরাকল তখন এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে দাহিয়া কলবী (রা) কে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় ফেরত পাঠান। আজ হয়তো হেরাকল আফসোস করছেন, সেদিন তিনি মুসলমান হয়ে গেলে এখন তিনি

বিজয়ী সেনাদলের গর্বিত একজন জেনারেল হতে পারতেন। এমন অসম্মান অপদস্থতার শেষ সীমায় তাকে পৌছতে হতো না।

যা হোক, বিশাল এক কাফেলা নিয়ে হেরাকল (কনস্টান্টিনোপল) কস্তুন্তনিয়া রওয়ানা হলেন। তার হেরেমের যে অসংখ্য রূপসী মেয়ে ছিলো তারাসহ তার বিরাট মুহাফিজ বাহিনীও তার সঙ্গে তিনি নিয়ে নেন। এ কাফেলা সাধারণ পথ থেকে সরে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে। হেরাকল চাচ্ছিলেন না মুসলমান কোন ফৌজের সঙ্গে পথে তার দেখা হোক। এজন্য তিনি কিছু লোককে সাধারণ দরিদ্র মানুষের বেশে অনেক সামনে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে মুসলমান ফৌজ দেখলেই এসে খবর দেয়। তখন পথ বদল করা যাবে।

মুসলমানদের তিন চারশ সওয়ার খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) এর নেতৃত্বে দালুক নামক এক জায়গায় যাচ্ছিলো। হেরাকল তখন শামের প্রসিদ্ধ জায়গা শামশাতে যাত্রা বিরতি করেন সেখানে রাত যাপন করবেন বলে। তখনই তাকে জানানো হলো, মুসলমানদের একটি দল শামশাতের দিকে আসছে। পুরো কাফেলা তখন দূরের এক পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করলো।

দালুক নামক স্থানের কিছু রোমী ফৌজ লোকদেরকে নিয়ে বিদ্রোহ করতে চাচ্ছিলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) সেখানে পৌছে বিদ্রোহের সম্ভাবনা মিটিয়ে ফেলেন। পৃথিবী বিখ্যাত এই বীর জানতেও পারলেন না এর চেয়ে অনেক বড় এক শিকার তার হাত থেকে ছুটে গেছে।

ঐতিহাসিক হুসাইন হায়কাল লিখেছেন, হেরাকল ঐ পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হওয়ার সময় এক উঁচু স্থানে উঠে শামের দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে বলেন, আখেরী সালাম হে শামের পবিত্র ভূমি..... এখন আর কোন রোমী তোমার ভেজা মাটিতে পা রাখার সাহস পাবে না। আল বিদা হে শামের পবিত্র ভূমি!

কস্তুন্তনিয়ার পথ হেরাকলের জন্য নিরাপদ না থাকায় তিনি শামের সীমান্ত থেকে একটু দূরের এলাকা বযনতিয়া চলে যান। ঐতিহাসিক মাকরিযী লিখেছেন, হেরাকল বযনতিয়া প্রবেশ করেন এমনভাবে যেন তিনি নিজে নিজের শবদেহের শেষ কৃত্যানুষ্ঠান করতে এসেছেন।

✪ ✪ ✪

মানুষের অনেক কিছুই পাল্টায়! সে নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার রক্তের স্বভাব কখনো পাল্টায় না। অহংকার দম্ভ অহমিকা রোমীদের রক্তের সঙ্গে চলমান। এর প্রমাণ হেরাকল ও তার জেনারেলদের অবস্থা। খাদের কিনারায় ঝুলন্ত থেকেও তাদের চিরাচরিত আস্ফালন আরো বেড়ে উঠে।

মুসলমানরা যখন শামের প্রথম শহর দামেশক জয় করতে আসে তখন হেরাকল ও তার এক বড় জেনারেল সুক্কার মুসলমানদেরকে বেকুব, মূর্খ আর মরুর লুটেরা বলে গালি দিয়ে পাত্তাই দিতে চাইলো না। তারা দামেশকে পঞ্চাশ হাজার রোমী ফৌজ একত্রিত বারলো।

দামেশক নদীমাতৃক এলাকা। রোমীয় জেনারেল সুক্কার মুসলমানদের অগ্রগতি রোখার জন্য সব নদীর পাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়। মুজাহিদীনে ইসলাম তাদের চারদিকে অথৈ পানি দেখে বিকট শব্দে হো হা করে হাসতে লাগলো এবং রোমীয়দের কিছু বিদ্রূপও করলো। ভয় বা দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে দেখা গেলো না। তারা পুরো দমে হামলার প্রস্তুতি চালিয়ে গেলো। মুজাহিদদের এ দৃঢ় মনোবল দেখে রোমীরা ভড়কে গেলো।

রোমী জেনারেল তবুও মুজাহিদদের নগন্য ভেবে এক দূত পাঠালো। মুসলমানদের সাথে তারা সন্ধি করতে চায়। তাই যেন কোন প্রতিনিধি পাঠায়ে। সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা) কে তার দূত হিসেবে পাঠালেন।

হযরত মাআয (রা) ঘোড়া নিয়ে রোমীয়দের ক্যাম্পে ঢুকলেন এবং ঘোড়া নিয়ে জেনারেল সুক্কারের তাঁবুর সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। হযরত মাআয (রা) সাহাবাদের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। রোমীয়রা তাকে খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো। এক মুহাফিজ এসে তার ঘোড়ার দায়িত্ব নিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে তাঁবুর ভেতরে যান।

মাআয (রা) তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাইরে থেকে এটা তাঁবু মনে হলেও ভেতরে মনে হচ্ছিলো কোন বাদশাহর খাস কামরা।তিনি সবচেয়ে বেশি পেরেশান হলেন তাঁবুর ভেতরের বিছানো গালিচা দেখে। এমন দুর্লভ মূল্যের গালিচা কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারে তিনি কল্পনাও করতে পারছিলেন না। এর ওপর পা রাখতেই তিনি অস্বস্তিবোধ করছিলেন।

জেনারেলসহ ভেতরের সবাই সেই গালিচার ওপর বসা ছিলো। জেনারেল সুক্কার তাকেও সেখানে বসার অনুরোধ করলো। মাআয (রা) গালিচায় বসতে অস্বীকার করলেন। সেখানে একজন দোভাষী ছিলো।

'আপনি গালিচার ওপর বসতে পারেন। শুধু গোলামদেরই এর ওপর পা রাখার অনুমতি নেই–' সুক্কার বললো।

'অমি মুসলমান হয়ে এর ওপর বসতে পারি না– মাআয (রা) বললেন– এ গালিচা থেকে দরিদ্র প্রজাদের রক্তের গন্ধ আসছে । গরিব মজুর আর কৃষকদের প্রাপ্য ছিনিয়ে নিয়ে এ গালিচা তৈরি করা হয়েছে।'

মাআয (রা) গালিচার এক পাশে খালি মেঝেতে বসে পড়লেন।

'আমরা আপনাকে সম্মান করতে চাইছিলাম– সুক্কার বলল– আপনার নিজেরই যদি নিজের সম্মানের প্রতি খেয়াল না থাকে তাহলে তো করার কিছু নেই।'

মাআয (রা) রেগে গেলেন। তিনি তার হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে দু'ভাষীকে বললেন, 'তোমার ঐ জেনারেলের মাথায় আমার একথা ঢুকিয়ে দাও। এ গালিচার ওপর বসাকে যদি সে সম্মানের বিষয় মনে করে এতে আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করবো না। আমাদের কাছে সম্মানের ব্যাপারটি অন্যরকম। মাটিতে বসা যদি গোলামের কাজ হয় তাহলে আমিও গোলাম ; তবে আল্লাহর।'

মাআয (রা) আবার আগের মতো বসে পড়লেন। সেখানে উপস্থিত রোমী অফিসাররা হয়রান হয়ে গেলো তার কথায়।

'আপনাদের লশকরে আপনার চেয়ে বড় কেউ আছে ?' সুক্কার জিজ্ঞেস করলো।

'আল্লাহ মাফ করুন, এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমি কারো চেয়ে খারাপ নই।'

মাআয (রা) এর কণ্ঠে এমন বুদ্ধির ঝলক ও দৃঢ়তার ছোয়া ছিলো যে, তা সবার মনেই গভীরভাবে দাগ কাটলো। সব নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

'ওদেরকে আসল কথা বলতে বলো। কথা না থাকলে অমি চলে যাই'– দুভাষীকে তিনি বললেন।

'আমরা আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই– সুক্কার বললো– আবিসিনিয়াসহ আরো কয়েকটা দেশ আপনাদের খুব কাছে। তাহলে আপনারা এদিকে এলেন কেন ?' .... অপনি কি জানেন না, আমাদের বাদশাহ সবচেয়ে বড় বাদশাহ ? আমাদের ফৌজ আকাশের নক্ষত্র ও যমিনের ধূলিকণার সমান ? আমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবেন এই আশায় এখানে এসেছেন ? ...... কখনো তা সম্ভব নয়।'

'আমরা আল্লাহর এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও। আমাদের কেবলার দিকে ফিরে আমাদের মতো ইবাদত করো। শরাব

শূকর ছেড়ে দাও। আর সব ধরণের হারাম কাজ ও শাহী ভোগ বিলাস ছেড়ে দাও।' এগুলো হারাম।

'আমরা যদি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করি ?' – সুক্কার উদ্ধত সূরে জিজ্ঞেস করলো।

'তাহলে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) দেবে। যদি তাও না মানো তাহলে ফয়সালা করবে তলোয়ার... তোমাদের সংখ্যা যদি তারকারাজির মতো হয় তাহলে আল্লাহর এ ঘোষণার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, 'ছোট একটি দল আল্লাহর হুকুমে বিশাল এক দলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে।' তোমাদের বাদশাহী নিয়ে তোমাদের বড়ই গর্ব ও অহংকার। কিন্তু তোমরা এটা দেখো না যে, সেই বাদশাহ নিজেকে সব আইন থেকে উর্ধ্বের ব্যক্তিত্ব বলে মনে করে। তোমাদের জান মালের সব ইখতিয়ার তার হাতে থাকে। অথচ আমরা যাকে বাদশাহ বানিয়েছি তিনি নিজেকে একজন সাধারণ প্রজার মতোই মনে করে। তাকে আমরা বলি খলীফা। তিনি অপরাধ করলে সাধারণ নাগরিকের মতোই শাস্তি হবে।'

রোমী জেনারেল সুক্কার আসলে আশা করছিলো, এরা গরিব এক ধর্মের লোক। যাদের এত বড় সম্মানিত লোকও গালিচার ওপর বসতে সংকোচ করে। এদেরকে কিছু দিয়ে দিলে খুশি মনেই ফিরে যাবে। এই ভেবে সে শামের একটি জেলা ও সে পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে বিদায় হওয়ার প্রস্তাব দিলো মাআয (রা) কে। মাআয (রা) আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলেন।

সুক্কার পরে আবু উবায়দা (রা) এর কাছে এই পয়গাম পাঠায়ে যে, একজন দূত তার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে। আবু উবায়দা (রা) অনুমতি দিয়ে দিলেন।

রোমী দূত মনে করেছিলো, মুসলমানদের সিপাহসালারকে বিরাট শান শওকতের মধ্যে পাবে। আবু উবাইদা (রা) তখন হাতে একটি তীর নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। রোমী দূত সিপাহসালারের কথা মুজাহিদদেরকে জিজ্ঞেস করতেই মুজাহিদরা দেখিয়ে দিলো আবু উবাইদা (রা) কে। রোমী দূত হয়রান হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

'তুমিই কি এই লশকরের সিপাহসালার ?' – দূত তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ আমিই' আবু উবায়দা (রা) শান্ত গলায় বললেন।

'তাহলে আমার একটি কথা শুনে নাও– রোমী দূত অফিসার সুলভ কণ্ঠে বললো– আমরা তোমাদের ফৌজের সবাইকে দু'টি করে আশরাফী দেবো। তোমরা এখান থেকে চলে যাও।'

'আর কিছু বলবে ?'

'না'

'তাহলে চলে যাও।' – নিরাবেগ কণ্ঠে বললেন আবু উবাইদা (রা)।

তারপর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানরা দামেশক জয় করে।

✪ ✪ ✪

বযনতিয়া গিয়ে হেরাকল্ যখন মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন তখনই তার মধ্যে আবার কিছুটা প্রাচাঞ্চল্যদ দেখা গেলো। তার উপদেষ্টাদের পরামর্শে তিনি মিসরে পয়গাম পাঠালেন, যেন কমপক্ষে ৪০ হাজার ফৌজের একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠায়। এদিকে হেরাকল অপ্রত্যাশিতভাবে আরেকটি বড় ধরনের সাহায্য পেয়ে তার মনোবল আগের মতো আবার বলিয়ান হয়ে উঠলো।

হেরাকলের কাছে একদিন বিভিন্ন কবীলার বিশ পচিশজন সরদার দেখা করতে এলো। এরা এসেছে শামের সীমান্ত ও সীমান্ত সন্নিহিত এলাকা থেকে। এদের কিছু পারসিয়ান আর বাকী সব খ্রিষ্টান। পঁচিশজন যুবতী ও অসম্ভব রূপসী মেয়ে ওরা সরদারদের সঙ্গে আসে।

'আমার জন্য তোহফা হিসেবে নিয়ে এসেছো এই মেয়েদের ? – হেরাকল বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললেন– তোমরা কি আমাকে বিজয়ী মনে করে এসেছো ? আমার তো এখন এমন যুবকদের প্রয়োজন যারা আমার হাতকে করতে পারবে অপরাজেয়। এ যুবতী মেয়েদেরকে দিয়ে আমি কি করবো ? আমি তো চাই ঐ আরব অসভ্যদের এখান থেকে ধাক্কিয়ে সে জঙ্গলে পৌছে দিতে যে জঙ্গল থেকে ওরা এসেছে।'

'আমরা অপনার হাতকে শক্তিশালী করতে এসেছি– এক বুড়ো সরদার বললো– এই মেয়েদেরকে তোহফা স্বরূপ আনিনি। এরা আমাদেরই মেয়ে। এদেরকে এনেছি শুধু এটা দেখানোর জন্য যে, এরা আমাদের আবরু ইজ্জতের প্রতীক। লড়াইতে এদের হেফাজত কে করবে ? এদের মতো হাজারো মেয়ের

হেফাজতের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন আমরাও আপনাকে সাহায্য করবো। হাজারাধিক যুবকও দেবো আপনাকে।'

'আমাকে সাহায্য করার কথা এখন কেন তোমাদের মনে উদিত হলো ? এটা তখন কেন মনে হলো না যখন পারসিকরা মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে পালাচ্ছিলো আর এদিকে আমার বিক্ষিপ্ত ফৌজ পিছু হটছিলো।'

'তখন এবং এখনো তো আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আপনার ফৌজ আমাদের সব কৃষিকর্ম ফসলাদি নষ্ট করে দিয়েছে। এমনকি তারা আমাদের মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে বা ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে।'

'মুসলমানরা কি তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে এ ধরণের আচরণ করেনি ?'

'না, মুসলমানরা যখন কোন এলাকায় প্রবেশ করে তখন তারা ঘরে ঘরে লুটপাটও চালায় না এবং মেয়েদের ওপর হাতও উঠায় না। যেসব মেয়ে তাদের হাতে বন্দী হয় তাদেরকেও তারা বিয়ে না করে ভোগ করে না। কিন্তু শাহেন শাহে রোম! আমাদের একটি মেয়েও যদি কোন মুসলমানের ঘরে বৌ হয়েও যায় সেটাও আমাদের জন্য অপমানজনক। এ মেয়েদের নিয়ে এসেছি আপনার কাছে এদের কেউ যেন মুসলমানের হাতেও না যায়। আমাদের ফৌজও যেন নিজেদের সম্পদ মনে না করে...

'হে শাহেন শাহে রোম! আমার বয়স দেখুন। কালের অনেক উত্থানপতন দেখেছি আমি। আপনার চেহারায় আমি হতাশার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। নিজেকে পরাজিত মনে করবেন না আপনি। আজকের পরাজয় কাল বিজয়ের রূপ নিতে পারে। আরেকটা বিষয় হয়তো আপনি জানেন না, এ মুসলমানরা সমুদ্রের সবকিছুকে ভয় পায়। আমরা ওদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো যে, সমুদ্র থেকে ফৌজ আসছে।'

আরবের মুসলমানরা মরু এলাকার মানুষ। সামুদ্রিক যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নেই। মুসলমানদের এ দুর্বল দিকটি হেরাকলকে বেশ আশান্বিত করে তোলে।

যা হোক, হেরাকল কবীলা সরদারদের কথা শুনে বললেন, মিসর থেকে ফৌজ আসছে। তোমরাও তোমাদের যুবকদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করে সেনা ছাউনিতে পাঠিয়ে দাও। এক উপদেষ্টার পরামর্শে কবীলার ঐ মেয়েদেরকে শাহী মহলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

✪ ✪ ✪

মিসরের ইস্কান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) থেকে হেরাকলের ছেলে কস্তন্তীনের নেতৃত্বে মিসরী ফৌজ জাহাজে করে সামুদ্রিক পথে শামের সীমান্তে এসে পৌঁছে। এ ফৌজ যেখানে এসে পৌঁছে সে জায়গাটা 'হিমসের' খুব কাছাকাছি এলাকায়। কিন্তু আশপাশের মুসলিম সালাররা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় হেরাকলের এ জঙ্গী তৎপরতার কোন খবরই তাদের কানে গেলো না। হেরাকল আসলে চাইছিলেন, শাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে মুসলমানদের ওপর শেষ আঘাত হানতে।

হিমসের আশপাশের এলাকা পাহাড়ি ও ঘন বন জঙ্গলে হওয়ায় মুসলমানরা অনেক দিন রোমীয়দের এ ভয়ংকর তৎপরতার খবর জানতে পারলো না। সিপাহসালার আবু উবাইদা এখন হিমসের কেল্লাবেষ্টিত শহরে। তিনি একদিন অনেকটা উড়ো খবরের মতো শুনলেন যে, রোমীয়রা আবার বিশাল আকারে সেনা সমাবেশ করে হিমসের কাছাকাছি চলে এসেছে। তিনি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কারণ আহত সিংহের শেষ আঘাত সামাল দেয়ার মতো মুজাহিদ এখন তার হাতে নেই। মুসলিম ফৌজতো এমনিই শত্রুপক্ষের তুলনায় অনেক অনেক কম। তারপরও সবাই বিভিন্ন বিজিত এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

আবু উবাইদা (রা) রোমীয়দের এসব তথ্য উদঘাটনের জন্য হাদীদকে গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। হাদীদ সাধারণ কৃষকের বেশে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তার মিশনে বের হয়ে গেলো।

এদিকে হাদীদের সঙ্গে শারীনার দেখা নেই অনেক দিন। হাদীদকে এক পলক দেখার জন্য শারীনা ছটফট করে প্রতি মুহূর্তে। সে তখনো মুসলমান না হলেও মুসলমানদের রীতিনীতি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছে। তাই এতদিন হাদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করার তীব্র ইচ্ছা খুব কষ্টে দমন করেছে। কিন্তু আজ দূর থেকে ঘোড় সওয়ার হাদীদকে দেখে ফেললো। দেখেই হাদীদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ওর কাছে দৌড়ে গেলো। হাদীদ ঘোড়া থামিয়ে তাকে জানালো সে বিশেষ এক জরুরী কাজে যাচ্ছে। শারীনা যেন ফিরে যায়। কিন্তু শারীনা অভিমান ভরা গলায় অভিযোগ করতে লাগলো, হাদীদকে কেন সে দেখতে পায় না। এখানে আসা অবধি তাকে আর সে দেখিনি। এখন সে যেখানেই যাক শারীনাকে নিয়ে যেতে হবে।

হাদীদ শারীনার জযবা সম্পর্কে ভালো করেই জানে এবং তার প্রতি তার আস্থাও আছে। তবুও শারীনাকে সে তার গোপন মিশন সম্পর্কে কিছু জানাতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু শারীনার পিড়াপিড়িতে অবশেষে হাদীদ তাকে সব খুলে

বললো। আর তাকে বুঝিয়ে বললো, এ ধরণের ঝুকিপুর্ণ কাজে একজন মেয়ের যুক্ত থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। তাছাড়া সে এখানে এসে মুসলমানদের রীতিনীতি এতটুকু তো বুঝতে পারছে যে, একা একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে কোথাও যাওয়াটা অনুচিত। তাই সে যেন তার দায়িত্বে বিঘ্ন না ঘটায়।

অবশেষে শারীনা হাদীদের কথা মেনে নিয়ে চলে গেলো। হাদীদ লক্ষ্য করলো, শারীনা যাওয়ার সময় দৌড়ে যাচ্ছে। সে এটাকে শারীনার তরুণীসুলভ চপলতা হিসেবে দেখলো। হাদীদ অনুভব করলো, শারীনার এই আসা যাওয়ার দৃশ্যটা তার চোখে, তার স্মৃতিতে, তার বুকের অতি কোমল একটি জায়গায় আলোড়ণ তুলেছে। কিন্তু হাদীদ ইসলামের মুজাহিদ। একথা ভাবতেই সে খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো। স্বাভাবিক গতিতে ঘোড়া নিয়ে চলতে লাগলো।

হাদীদ একটি টিলার ঢালু পথে এগুচ্ছিলো। তখনই ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনলো। সেখানে কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিলো না। হাদীদ ভাবলো, সিপাহসালার হয়তো কোন সওয়ারকে জরুরী কোন পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। সওয়ারের চেহারা কাপড়ে আবৃত থাকায় হাদীদ অনুমান করলো কোন তরুণ মুজাহিদ হবে। সওয়ার মুখের কাপড় সরাতেই হাদীদ চমকে গেলো। তার সামনে শারীনা। হাদীদ চরম পেরেশান হয়ে তাকে চলে যেতে বললো। শারীনা বললো, সে ফিরে যেতে আসেনি এবং সে হাদীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে। শারীনা তার মাথা ও চেহারা কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, একেবারে কাছে না গিয়ে কেউ ওকে মেয়ে বলে চিনতে পারবে না। হাদীদ ভেবে দেখলো, এত দূর আসার পর ওকে আর ফেরত পাঠানো যাবে না। তাই ওকে সঙ্গে রাখাই সে ভালো মনে করলো।

✪ ✪ ✪

'এ এলাকা আমার জন্য নতুন নয়– শারীনার ঘোড়া হাদীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর সে কথা বলে যাচ্ছে– এখানে আমি কয়েকবার ভ্রমনে এসেছিলাম। সামনে একটি নদী আছে। জায়গাটি খুব সুন্দর। একেবারে নির্জন। ওখানে আমরা ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাবো। নিজেরাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নেবো।

আরো কিছুক্ষণ চলার পর ওরা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলো। ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়া দুটিকে ঘাস পানি খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলো এবং নিজেরা একটি টিলার নিচে গিয়ে নদীর দিকে মুখ করে বসলো। হাদীদ শারীনাকে তার মিশনের

গুরুত্ব বুঝাতে লাগলো। শারীনাও তাকে আশ্বাস দিলো, সে তাকে একজন পুরুষের মতোই সঙ্গ দেবে।

এখানে বসে শারীনা প্রথমেই তার মুখের কাপড় খুলে রেখেছিলো। কারণ তাদের ধারণা মতে এখানে রোমীয়দের কোন নাম নিশানাও নেই।

ছোট ছোট শব্দে ওরা কথা বলছে। এসময় টিলার পেছন থেকে কয়েকজন লোকের কথার আওয়াজ আসলো ওদের কাছে। দেখতে দেখতে সাধারণ গ্রাম্য পোষাকে তিনটি লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। হাদীদের মতো এরাও এদেরকে দেখে চমকে উঠেছে। ওদের মধ্যে বাদামী বর্ণের এক যুবকের চোখ শারীনার দিকে পড়তেই তার চোখ কপালে উঠলো। শারীনার চোখেও এ ধরণের প্রতিক্রিয়ার ছায়া দেখা গেলো।

'আমি তোমার নাম জানি না, তবে এতটুকু মনে আছে, তুমি শাহে হেরাকলের মুহাফিজ দলের কমান্ডার ছিলে'– শারীনা বাদামী বর্ণের লোকটিকে বললো।

'হ্যাঁ, শাহজাদী শারীনা! আমি শাহী মহলের মুহাফিজ দলের কমান্ডার ছিলাম। আমার নাম রোতাস...... কিন্তু আপনি এখানে ? আর এই বা কে ?' – লোকটি বললো।

'এ এক মুসলমান। ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি হয়তো জানো না। রাহার কেল্লা থেকে আমি এক দিন বের হলে দু'জন মুসলমান আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেখানে অবশ্য ওরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। এটা এ কারণে যে, হয়তো কোন সালার আমাকে বিয়ে করতো। তাছাড়া মুসলমানরা দুশমনের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের ফৌজের মতো হিংস্র আচরণ করে না। যা হোক, তুমি তো এক যুবক যুবতীর হৃদয়ঘটিত ব্যাপার বুঝবেই। এ ছেলেটি আমাকে ভালোবেসে ফেলে। এমনকি আমার জন্য সে তার ধর্মও ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে যায়। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে সে আমাকে কয়েদখানা থেকে ছাড়িয়ে ওখান থেকে পালিয়ে আসে। জানিনা ওকে আমি কোথায় নিয়ে যাবো। তোমাদের পেয়ে গেছি ভালোই হলো। তুমি নিশ্চয় বলতে পারবে আমাদের ফৌজ কোথায় ? ওকে আমি সেখানে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টান বানাবো। ও নিজেও এটাই চাইছে।

রোমী অফিসার রোতাস খুব খুশি হলো যে, শারীনা শুধু মুসলমানদের কয়েদখানা থেকে ফেরারই হয়ে আসেনি একজন মুসলমানকে খ্রিস্টান বানিয়ে

সঙ্গেও নিয়ে যাচ্ছে। সে জানালো, তার সঙ্গী দু'জন রোমী সিপাহী। ওরা এতক্ষণ কথা বলছিলো রোমক ভাষায়। শারীনা হাদীদকে আরবীতে জানালো, সে রোতাসদেরকে কিভাবে ধোকা দিচ্ছে।

শারীনা ওদেরকে টিলার পাশে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, হেরাকল ও তার ফৌজ এখন কোথায়। হেরাকল কোথায় এবং তার কর্ম তৎপরতা কি ইত্যাদি রোতাস শারীনাকে জানালো। আরো জনালো, বিভিন্ন কবীলার ফৌজ এবং নিজেদের ফৌজ ঐ পাহাড়গুলোর পেছনে একত্রিত হয়েছে। ওখানে মিসর থেকে আসা বিশাল বাহিনীও আছে। এরা হিমসকে অবরোধ করে জয় করবে। তারা এখন গ্রাম্য পোষাকে হিমসে যাচ্ছে মুসলমান ফৌজের অবস্থা ও কেল্লা সহজে কিভাবে জয় করা যায় তা জানতে।

শারীনা এ তথ্যগুলো হাদীদকে জানালো। এত মূল্যবান তথ্য পেয়ে হাদীদ ভেতরে ভেতরে খুব চাঞ্চল্যবোধ করলেও চেহারা রাখলো প্রতিক্রিয়াহীন।

কথা বলতে বলতে শারীনা একবার অলস ভঙ্গিতে উঠে রোমীয়দের পেছনে চলে গেলো। যেন ক্লান্তি দূর করার জন্য পায়চারী করছে। রোতাসও অন্য মনস্ক হয়ে নদী প্লাবিত প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্যে হারিয়ে গেলো। রোতাসের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরতে দেখে শারীনা খুব দ্রুত এবং নিঃশব্দে তার তলোয়ার বের করে এক সিপাহীর গর্দানে কোপ বসালো। সিপাহীর গলা থেকে বেরিয়ে আসা মরণ চিৎকার রোতাসের ধ্যানমগ্নতা ভাঙ্গলেও রোতাস ঘোরলাগা চোখে শারীনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ততক্ষণে শারীনা দ্বিতীয় সিপাহীর পাঁজরে বর্শার মতো তলোয়ার চালিয়ে দিলো।

এতক্ষণে রোতাস সম্বিৎ ফিরে পেলো। এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে তলোয়ার কোমর থেকে কোষ মুক্ত করতে গেলো। কিন্তু হাদীদের তলোয়ার তখন তার বুকে তাক করা হয়ে গেছে। শারীনাও তার তলোয়ার রোতাসের পাঁজরে তাক করে তাকে সতর্ক করে দিলো, লড়তে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। হাদীদ শারীনা থেকে নেকাবের অতিরিক্ত কাপড়টি দিয়ে রোতাসের হাত পিছমোড়া করে বাঁধলো এবং দু'জনে মিলে তাকে একটি ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে হাদীদ তার পেছনে নিয়ে বসলো। শারীনাও তার ঘোড়ায় চড়ে বসলো। তারা রোখ করলো হিমসের দিকে।

হাদীদ ও শারীনা রোতাসকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে এলো। তাকে বলা হলো, হেরাকলের সঠিক কর্মতৎপরতা ও পরিকল্পনার কথা যদি সে পুংখানুপুংখ

বলে দেয় তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং যুদ্ধের পর তাকে গোলাম না বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। রোতাস তো এটা জানতো যে, তার বাদশাহ এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ফৌজ যত বড় করেই সমাবেশ করুক এ ফৌজে মনোবল বলতে কিছুই নেই। তাই রোতাস সিপাহসালারকে জানিয়ে দিলো, সীমান্ত এলাকার সবগুলো কবীলার সরদাররা হেরাকলকে ফৌজ দিচ্ছে। মিসর থেকে ফৌজ এসেছে। আর রোমীয় ফৌজ তো একত্রিত হচ্ছেই। সব মিলিয়ে হেরাকল হিমসে সর্বশেষ আরেকটি আঘাত করতে চাচ্ছেন।

রোতাস থেকে জানা গেলো, কবীলাগুলোর লশকরসহ রোমীরা এবার পঞ্চাশ হাজার তাজাদম ফৌজ সমবেত করেছে। হিমসে তখন মুজাহিদের সংখ্যা মাত্র তিন চার হাজার। এ খবর শুনে সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর চেহারা পিৎবর্ণ ধারণ করলো। তিনি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠলেন এ কারণে যে, অন্যসব সালার বিশেষতঃ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, শুরাহবীল ইবনে হাসানা, আমর ইবনে আস তথা যে কোন অবস্থাতে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া সালাররা তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে ব্যস্ত।

সিপাহসালার হিসেবে সব সালারদের ডেকে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্রুতগামী এক কাসেদকে দিয়ে আমীরুল মুমিনের কাছে মদীনায় এ সম্পর্কে পয়গাম পাঠালেন যে, এখানকার মুসলমানরা এখন মৃত্যুবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সেনা সাহায্য পাঠানো হোক।

✪ ✪ ✪

হেরাকল্ শেষ ছোবল মারার জন্য হিমসের আশেপাশে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য জমায়েত করেছেন। আরো সৈন্য বিভিন্ন স্থান থেকে এসে জড়ো হচ্ছে, এখবর সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) কে অত্যন্ত বিচলিত করলেও তিনি আল্লাহর কাছে শুকিরয়া আদায় করলেন শারীনার মতো একটি মেয়ের কারণে আগেভাগে এ অমূল্য তথ্যগুলো জানতে পারার জন্য। অন্যথায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এই বিশাল রোমী ফৌজের পাহাড়ের নিচে পড়ে মুজাহিদরা চিরা-চ্যাপ্টা হয়ে যেতো। যতই অসম্ভব হোক এখন তো লড়াইয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেয়া যাচ্ছে।

শারীনা ছাড়া হাদীদ এ খবর আনতে গেলে আরো কয়েকগুণ সময় বেশি লাগতো। এজন্য সিপাহাসালার শারীনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন। কিন্তু যে মেয়ের কাছ থেকে ইসলামের জন্য এমন অলৌকিকীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাচ্ছে সে

মেয়েটি কেন ইসলাম গ্রহণ করছে না এখনো সেটা তিনি ভেবে পেলেন না। তাহলে তো তাকে হাদীদের সঙ্গে .... ভাবতে ভাবতে সিপাহসালার অন্য চিন্তায় ডুবে গেলেন।

একটু পর কয়েকজন মুহাফিজকে ডেকে রোতাসকে কয়েদখানায় রেখে আসার নির্দেশ দিলেন সিপাহসালার। রোতাস আবেদন জানালো যে, সে সব তথ্য বলে দেয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছিলো। তারপরও কেন তাকে কয়েদখানায় পাঠানো হবে ?

'মন থেকে তোমাকে আমরা সম্মান করি– আবু উবাইদা বললেন– তোমাকে জঙ্গী কয়েদী মনে করে কয়েদখানায় পাঠাচ্ছি না। যুদ্ধ শেষ হলেই পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।'

মুহাফিজরা রোতাসকে নিয়ে তাঁবু থেকে বের হলো। হাদীদও ওদের সঙ্গে ছিলো। ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ? – শারীনা রোতাসকে আটকিয়ে বললো।

'কয়েদখানায়।'

'কয়েদখানায় কেন ? ওকে কয়েদখানায় নিতে দিয়ো না।'

'সিপাহসলারের হুকুমে হস্তক্ষেপ করো না শারীনা! তার বুদ্ধির সমান তোমার বুদ্ধি নয়'– হাদীদ বললো।

'সিপাহসালারের সঙ্গে আমি কথা বলবো। তুমিও এসো আমার সঙ্গে। সিপাহসালারের সমান বুদ্ধি আমার নয় তা আমি জানি। কিন্তু আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে'– বলতে বলতে শারীনা সিপাহসলারের কাছে চলে গেলো।

'সালারে মুহতারাম ! – শারীনা ভেতরে গিয়েই বললো– আপনার ফয়সালায় আমি হস্তক্ষেপ করছি না। শুধু এতটুকু জিজ্ঞেস করতে ক্ষমাপ্রার্থী হচ্ছি যে, আপনি ঐ রোমী অফিসারকে কয়েদখানায় পাঠাচ্ছেন কেন ? তাকে তো ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন আপনি!'

'দেখো মা! – সিপাহসালার আদুরে গলায় বললেন– যদি এ কাজের কৃতিত্ব তোমার না হতো তোমার প্রশ্নের জবাব দিতাম না আমি। তোমার আবেগের আমি মনে প্রাণে প্রশংসা করি; কিন্তু তোমার বয়স কম বলে তুমি বুঝতে পারছো না যে, আবেগের লাগাম যুক্তির হাতে না থাকলে সে আবেগ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শোন, ওকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় সে সোজা হেরাকলের কাছে গিয়ে বলবে, মূসলানদের হাতে সে ধরা পড়ে এই এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। হেরাকল তখন তার যুদ্ধ পরিকল্পনা পাল্টে ফেলবেন। হতে পারে তিনি

হিমস বাদ দিয়ে আমাদের অন্য কোন শহর অবরোধে নিয়ে নেবেন। এখবর তো আমার কাছে আগেই পৌঁছেছে যে, হিমস থেকে কয়েক ক্রোশ দূরের ঐ পাহাড়ি এলাকায় রোমীয় ফৌজ ও কবীলার লশকর এমনভাবে একত্রিত হয়েছে যেন হিমস প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। যদি রোমীরা এ অবস্থাতেও হিমসের দিকে অগ্রসর হয় তবুও হিমস অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। আমাদের কেল্লাবন্দী হয়ে লড়তে হবে এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হবে তাহলো, সেনাসাহায্য আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আমি আমার ওয়াদার ওপর স্থির আছি। অবরোধ ভেঙ্গে যদি আমরা রোমীয়দের পিছু হটাতে পারি তাহলে রোতাসকে মুক্তি দিয়ে দেবো।'

'মুহতারাম সিপাহসালার! – শারীনা বললো– আমি আপনার তুলনায় কিছুই নই। তারপরও আপনি আমার কথা ধৈর্য নিয়ে শুনে জবাবও দিয়েছেন। আমাদের রোমীয়দের ওখানে তো উচ্চ পদস্থদের সামনে নিম্ন পদস্থরা বড় করে শ্বাসও ফেলতে পারে না। হেরাকলের সামনেও আমি এমন সাহস নিয়ে কথা বলতে পারি না। অথচ তিনি আমার পিতা।'

'বেটি শারীনা! – আবু উবাইদা (রা) বললেন– আমি এখন কিছু ব্যস্ত এবং পেরেশানও। যদি তোমার বিশেষ কিছু বলার থাকে বলো। নিজের প্রশংসা শোনার রেওয়াজ আমাদের এখানে নেই। প্রশংসা তো প্রাপ্য তোমার। যে মেয়ে এত বড় কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছে।'

'আমার বিশেষ কথা হলো, ঐ রোমী অফিসার রোতাসকে কয়েদখানায় না রেখে ভালো কোন কামরায় রাখুন। সে কয়েদী এটা যাতে বুঝতে না পারে। তারপর আমাকে প্রহরীদের তত্বাবধানে তার সঙ্গে পালা করে সাক্ষাতের অনুমতি দিন। আশা করি ওর বুক থেকে আমি আরো কিছু কাজের কথা বের করতে পারবো।'

'খোদার কসম! এই মেয়ের বুদ্ধিতে ধার আছে– অবু উবাইদা সেখানে উপস্থিত সালারদের দিকে তাকিয়ে উচ্ছসিত হয়ে বললেন– তোমরা সবাই কি বুঝতে পারছো না পেরেশানী আমার স্বাভাবিক বোধ কোথায় নিয়ে গেছে? .... একথা তো আমার মাথাতেই আসা উচিত ছিলো যে, রোতাসকে কয়েদখানায় না পাঠিয়ে অভিজাত কোন কামরায় রেখে তাকে এটা বুঝানো যে, সে কয়েদী নয়; আমাদের মেহমান।'

✪ ✪ ✪

শামের পুরো এলাকাই কখনো দখলে রয়েছে রোমীদের। কখনো রয়েছে পারসিকদের দখলে। তারা এজন্য জায়গায় জায়গায় নিজেদের জন্য বড় বড় শাহী মহল নির্মাণ করিয়েছে। হিমসের ভেতরের প্রতিটি দুর্গেই আলীশান শাহী মহল রয়েছে। রোতাসকেও এমনি একটি মহলের দক্ষিণ দিকের আলো ঝলমলে একটি কামরায় রাখা হলো। কামরার ভেতরের সব আসবাপত্রেই রাজকীয় ছাপ রয়েছে।

পর দিন শারীনা সে কামরায় চলে গেলো। কামরার সাজসজ্জা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট হলো। কামরায় সবসময় দু'জন করে প্রহরী পালা করে প্রহরায় থাকে।

'নিজেকে তুমি কয়েদী মনে করো না– শারীনা রোতাসকে বললো– তুমি এখানকার মেহমান। আমার ধারনামতে তোমাকে কোন কিছুর অভাবে রাখা হয়নি। তুমি কি এজন্য খোদার শুকরিয়া আদায় করবে না যে, তোমাকে কয়েদখানার কালো কুঠুরীতে পাঠানো হয়নি?'

'তোমাদের সিপাহসালার আমাকে ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। প্রহরা রাখার অর্থ হলো আমি কয়েদী– রোতাস বললো।

'তুমি ফৌজের একজন অফিসার। সবই জানো তুমি। তোমাদের কোন দুশমন কয়েদী যদি এভাবে তোমার মতো সব কিছু ফাঁস করে দেয় তাহলে তোমরা কি তাকে এ সুযোগ দেয়ার জন্য ছেড়ে দেবে যে, সে তার ফৌজে গিয়ে তার সব ফাঁস করে দেয়ার কথা বলবে আর শত্রু পক্ষ তাদের পরিকল্পনা পাল্টে ফেলবে।'

রোতাস একথার উত্তর দিতে পারলো না। তার মাথা নামিয়ে ফেললো।
'আমি প্রায়ই এখানে আসা যাওয়া করবো– শারীনা বললো– আমরা দু'জন রোমী। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।'

'কিন্তু তুমি এখন মুসলমান। তুমি আমার সঙ্গে যা করেছো এতেই প্রমাণ হয়, আমাকে এখন তুমি শত্রু মনে করো। তুমি এখানে কিভাবে পৌছলে আর তোমরা যাচ্ছিলেই বা কোথায় আমাকে কি এটা বলতে পছন্দ করবে? – রোতাস বললো।

'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তুমি ভাবছো, হেরাকলের মেয়ে হয়ে কি করে আমি সাধারণ একজন মুসলমানের সঙ্গে চলে আসলাম। এ ছেলেটি আমাদের যুদ্ধ বন্দী ছিলো। কিন্তু আমি ওর প্রেমে পড়ে রাহা থেকে ওকে উদ্ধার করে বের হয়ে আসি।'

শারীনা রোতাসকে হাদীদ ও তার পুরো কাহিনী শোনালো এমনভাব নিয়ে যেন এখন সে এ ঘটনার জন্য অনুতপ্ত। রোতাস তাকে জিজ্ঞেস করলো এখানে থেকে সে সন্তুষ্ট কি না।

'এখানে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে আসিনি– শারীনা মিথ্যা বললো– আমার পিতার বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ ছিলো না। আসলে ঐ ছেলে হাদীদের প্রেমে অন্ধ হয়ে আমি এ কাজ করেছি। ওকে আমার এত ভালো লাগলো যেন সে আমাকে যাদু করেছে। এখানে আমি ইসলাম নয় হাদীদের জন্যই এসেছি। তোমার দুই সিপাহীকে মেরে তোমাকে এখানে নিয়ে না আসলে হাদীদকে তোমরা হত্যা করতে। হাদীদকে খুশি করার জন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। হাদীদের সিপাহসালার তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট। সত্য বলতে কি এদেরকে আমার মোটেও ভালো লাগে না। ছিলাম শাহজাদী আর এখানে কোন জঙ্গলে তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছি। আজ তোমাকে দেখে তোমার পাশে বসে আমি মানসিক শান্তি পাচ্ছি। তাই আমাকে দুশমন মনে করো না। যতটুকু পেরেছি তোমার জন্য করেছি।'

'মুসলমানরা হেরে গেলে তুমি তখন কি করবে?'

'আমি তোমার কাছে আশা করবো, তুমি আমার এসব কথা মনের মধ্যে দাফন করে রাখবে। আমি তখন হাদীদকে এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবো এবং তাকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করবো। তারপর আমরা বিয়ে করবো।'

শারীনার কথা ও তার রূপযৌবন রোতাসকে একেবারে দিশেহারা করে ফেলেছে। তার মনে হতে লাগলো, তাকে যদি এখানে আটকে না রাখতো, পথে ওদের সঙ্গে দেখা না হতো তাহলে তো শারীনাকে এমন কাছে থেকে দেখতে পেতো না। শাহী মহলের সামান্য দাসী সখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেও রোতাসের মতো ফৌজী কমান্ডাররা বর্তে যেতো। আর এখানে স্বয়ং শাহজাদী! বন্ধুদেরকে গল্পের সময় বিশ্বাস করানোই কঠিন হয়ে যাবে।

পরদিন শারীনা রোতাসের কামরায় গিয়ে আগের চেয়ে আরো গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলো, তার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না! রোতাস তো সেই কাকভোর থেকেই তার অপেক্ষায় ছিলো। এবার সে ঝলমলে কণ্ঠে বললো।

'না, তুমি বরং আমার কাছে না এলে আমি কষ্টে পড়তাম।'

'আমি রোমী ফৌজের হামলার অপেক্ষায় আছি– শারীনা অস্থির ভাব দেখিয়ে বললো– এখন তো হিমস অবরোধ করার চমৎকার সময়। শহরের ভেতর ফৌজ খুব সামান্য। দু' চার দিনের বেশি এরা লড়তে পারবে না।'

'আরে, তুমি অল্প একটু সময় আমার সঙ্গে কাটাতে আসো। এ সময় আমি ধূলো আর রক্তের কথায় নষ্ট করতে চাই না। হেরাকল যখন ভালো মনে করবেন হামলা চালাবেন। এখন অন্য কথা বলো।'

শারীনা বুঝলো, রোতাস এখন তার মধ্যেই মজে আছে। আসল কথায় সে আসতে চাচ্ছে না। শারীনা তার সঙ্গে হালকা ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করলো।

'আমার একটা জিনিস ভীষণ দরকার– রোতাস বললো– শরাবের অভাবে আমি মরে যাচ্ছি। তুমি তো জানো আমরা শরাব পান করি পানির মতো। কিন্তু এখানে একটি ফোটাও দেখতে পেলাম না।'

'তুমি হয়তো জানো না, মুসলমানরা শরাব পান করাকে পাপের কাজ মনে করে। শরাব পানকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়।

শারীনার মাথায় একটি জিনিস উদয় হলো, এই এক শরাবের মাধ্যমেই ওর কাছ থেকে কথা বের করা যেতে পারে। কারণ নেশা মানুষের ভেতরের পর্দা খুলে দেয়। এটা ভেবে শারীনা শরাবের ব্যাপারে এমন আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে লাগলো যে, রোতাস আগের চেয়ে আরো বেশি নেশাকাতর হয়ে পড়লো।

'শারীনা তোমার পায়ে পড়ি, কিছু একটা করো। এ শহরের খ্রিষ্টানদের কাছে নিশ্চয় শরাব পাওয়া যাবে। যেভাবেই হোক এনে দাও না।'– রোতাস মরিয়া হয়ে উঠলো।

'এনে দেয়া যাবে। তবে ধরা পড়লে এরা আমাকে শাস্তি দেবে। তাই নিজেকে এ বিপদে ফেলতে চাচ্ছি না।'

রোতাস এবার প্রায় কেঁদে ফেলে-অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। অবশেষে শারীনা তাকে আশ্বাস দিলো, সে চেষ্টা করে দেখবে। তবে প্রতিদিন দিতে পারবে না। তাহলে বাইরের প্রহরীরা শরাবের গন্ধ পেয়ে সোজা ভেতরে চলে আসবে। তারপর দুজনকেই সিপাহসালারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। একথা বলে শারীনা চলে এলো সেখান থেকে ।

শারীনা সোজা চলে গেলো হাদীদের কাছে। হাদীদকে রোতাসের শরাবের ব্যাপারে সব খুলে বললো যে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় মুখ খুলতে চাচ্ছে না। শরাবের মাধ্যমেই মুখ খোলাতে হবে। আর শরাব ওদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।

'শরাবের বন্দোবস্ত করবো আমি- হাদীদ গুরুত্ব বুঝে বললো- তবে একটি কথা মনে পড়েছে। ওর কাছ থেকে জেনে নেবে হিমসে হেরাকলের কোন গুপ্তচর আছে কি না। যদি থাকে তাহলে কে কে ?'

হাদীদ সিপাহসালারের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি বিধর্মী ঘর থেকে কিছু শরাব সংগ্রহ করে শারীনাকে দিয়ে দিলো। তবে তাকে বলে দিলো, রোতাসকে বুঝাতে হবে শারীনা এ শরাব অতি গোপনে সংগ্রহ করেছে। কেউ একথা জানে না। জানলে তার গর্দান যাবে।

✪ ✪ ✪

পর দিন শারীনা তার চাদরে পেচিয়ে ছোট একটি পাত্র নিয়ে রোতাসের কামরায় প্রবেশ করে দরজা একটু ভেড়িয়ে দিলো। চার দিকে ভালো করে তাকিয়ে রোতাসকে পাত্রটি দিয়ে সতর্ক করে দিলো, কেউ জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

রোতাস তাড়াতাড়ি একটি গ্লাসে শরাব ঢেলে পান করতে লাগলো। শারীনাকেও সাধলো।

'চোখের সামনে শরাব দেখে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছি- শারীনা বললো নিচু আওয়াজে- এক ঢোক পান করেও হাদীদ বা অন্য করো পাশ দিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাকড়াও করবে। তখন আর কেউ দেখবে না এ মেয়ে কে ? শাহজাদী না অন্য কিছু। সিপাহসালার এমন শাস্তি দেবেন যে, আমি তখন শুধু মৃত্যুই কামনা করবো।'

হালকা হালকা কথা বলে রোতাস পান করতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে উঠলো নেশায়।

'আমি ফিরে যেতে চাই- শারীনা বললো- এখানকার কী যে নিয়ম কানুন, শরাবও পান করতে পারি না। শাহে হেরাক্ল যে কেন হামলা করছেন না। তুমিও তো বলছো না হামলা কেন এত দেরী করে করছেন। আমি তো ভাবছি, সুযোগ পেলে পালিয়ে হেরাকলের কাছে গিয়ে এখনই হামলা করতে বলবো। মুসলমানরা যদি সেনা সাহায্য পেয়ে যায়, তাহলে আর হিমস জয় করা সম্ভব হবে না।'

'এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো- রোতাস নেশাগ্রস্ত কণ্ঠে বললো- শাহে হেরাকল্ খুব সতর্ক হয়ে গেছেন। তিনি নিজে যত সাহসী আর লড়াকুই হোন না

কেন লড়তে তো হবে ফৌজেরই। কিন্তু পুরো ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে আছে মুসলমান ভীতি।'

'তা তো স্বাভাবিক। প্রতিটি লড়াইয়ে তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছে। ওদিকে পারসিকদের পরাজিত করে তাদেরকে দেশ ছাড়া করেছে মুসলমানরা। এসব খবরও ফৌজ পাচ্ছে।'

'শুধু ভীতিই নয় আমাদের ফৌজ বিস্মিতও এজন্য যে, এত অল্প সংখ্যা ফৌজ নিয়ে মুসলমানরা কি করে এত বড় ফৌজকে পরাজিত করে। তাদের ব্যাপারে আমাদের সিপাহীরা বলে বেড়ায়, মুসলমানদের কাছে জিন বা অশরীরি শক্তি আছে। তারাই আমাদেরকে পরাজিত করে..... শাহে হেরাকল তো আহত সিংহের মতো শেষ হামলা অবশ্যই করবেন। তিনি ফৌজ ও কবীলার লশকরদের প্রস্তুত করছেন। কিন্তু এখন তিনি পা ফেলার আগে চিন্তা করে নিচ্ছেন।'

'সীমান্ত ও দীপাঞ্চলের কবীলাগুলোর লশকর তো তাজা দম। হেরাকলের জন্য এতটুকু সাহায্যই কি যথেষ্ট নয়?'

'যথেষ্ট হলেও শাহেন শাহ এদের ব্যাপারে অনেক সাবধান। এদের প্রতি এমনিতেও ভরসা করা যায় না। শাহেনশাহ তার জেনারেল ও ফৌজি অফিসারদের বলে দিয়েছেন, এসব কবীলা নিজেদের ঘর বাড়ি, বৌ বাচ্চা ও নিজেদের রক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছে। এদের মধ্যে দেশাত্মক কোন চেতনা নেই। না ওদের কোন রাজত্ব আছে যা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এরা লড়াই করবে। এরা শুধু নিরাপত্তা চায়। মুসলমানরদের কাছ থেকে এটা পেয়ে গেলে নিশ্চিত এরা রোমীয়দের বিরুদ্ধে চলে যাবে.....

'এদের আরেকটি দুর্বলতা হলো, এরা একা। ব্যক্তিগতভাবে এরা বড় বড় লড়াকু ও শাহসওয়ার হতে পারে কিন্তু ফৌজের সেনা-শৃংখলায় থেকে লড়াই করা ভিন্ন ব্যাপার। ফৌজি প্রশিক্ষণ না দিয়ে এদেরকে ময়দানে আনলে এরা দুশমনের হাতে খুব সহজেই মরতে থাকবে। এটাও জানা গেছে, কবীলার লশকররা দেখবে, রোমীরা লড়ছে না পালাচ্ছে। রোমী ফৌজ জমে না লড়লে সবার আগে এরা পালাতে শুরু করবে। এও অসম্ভব নয় যে, ওরা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে মিলে যেতে পারে।'

রোতাস গলায় শরাব ঢালতে লাগলো আর রোমী ফৌজের ব্যাপারে অনবরত বকে যেতে লাগলো। সে যখন একেবারেই মাতাল হয়ে গেলো শারীনা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর হাদীদকে জানালো সে কি কি জানতে পেরেছে।

হাদীদ শারীনাকে সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর কাছে নিয়ে গেলো। শারীনা সিপাহসালারকে আবার সব শোনালো।

আবু উবাইদা (রা) তখনই তার গোয়েন্দা দলকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে সব জানালেন। তিনি বললেন,

'এখন যা করতে হবে তা হলো, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বিচক্ষণ মেধার কিছু গুপ্তচর পাঠাও। যারা বিভিন্ন খ্রিষ্টান গোত্রে (কবীলায়) গিয়ে নিজেদেরকে অন্য কোন গোত্রের বলে পরিচয় দেবে এবং তাদের লশকরে যোগ দেবে। তারপর ওদেরকে ধীরে ধীরে রোমীয়দের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে।'

দশ বারজন মুজাহিদকে বাছাই করে হাদীদের নেতৃত্বে ওদেরকে বিভিন্ন কবীলায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

✪ ✪ ✪

সিপাহসালার তড়িৎ পরামর্শের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কে হিমস আসার জন্য তার কাছে দ্রুতগামী কাসেদ পাঠালেন। তারপর সব সালারদের ডেকে ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন ঃ

প্রিয় সঙ্গীরা আমার! ঐ রোমী অফিসার রোতাস হেরাকল ও তার ফৌজ এবং খ্রিস্টান গোত্রগুলোর ব্যাপারে কি বলেছে সব শুনেছো তোমরা। হেরাকল কেমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে তাও তোমরা জানো। তবে এজন্য আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত হবে না যে, আমাদের দুশমন আমাদেরই সুবিধামতো হামলা করবে। আমরা এতটুকুই জানি, যে কোন সময় হিমস অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা অবরোধ ভাঙ্গার মতো শক্তিশালী নই। আমি কবীলাগুলোকে বিভ্রান্ত করার জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণ ও জানবাজ কয়েকজন মুজাহিদ পাঠিয়ে দিয়েছি। মদীনায় পাঠানো কাসেদ অর্ধেক পথ হয়তো অতিক্রম করেছে। নিজেদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলো। আর নিজেরা এবং মুজাহিদদেরকে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে বলো যাতে খুব দ্রুত সাহায্য পৌঁছে যায়।'

সিপাহসালার আবু উবাইদার অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, দিনে তো নয়ই রাতেও তিনি শোতেন না। প্রায়ই কেল্লার প্রাচীরে গিয়ে মদীনার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন কোন সাহায্য আসছে কি না তা দেখার জন্য। অথচ তিনি নিজেও জানেন এত দ্রুত সেনা সাহায্য পৌঁছা সম্ভব নয়।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তখন কুনসুরীনে ছিলেন। পয়গাম পেয়েই তিনি প্রায় উড়ে এসে হিমসে পৌঁছলেন। তাকে দেখে আবু উবাইদা (রা) অনেকটা স্বস্তিবোধ করলেন। আবু উবাইদা তাকে সব কিছু জানালেন যে, হিমস কেমন বিপদজনক অবস্থায় আছে। তিনি কি কি পদক্ষেপ এ পর্যন্ত নিয়েছেন তা খালিদ (রা) কে জানালেন।

'আমি যেটা ভেবে রেখেছি তাহলো, ইন্তাকিয়া, হুমাত, হলব ও নিকটস্থ অন্যান্য সেনা ছাউনি থেকে প্রায় অর্ধেক ব্যাটালিয়ান মুজাহিদ এখানে এনে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করবো– সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) বলেন।

'অবরোধ্য হয়ে নয়– খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পরামর্শ দিলেন– আমরা কেল্লার বাইরে গিয়ে দুশমনের মোকাবেলা করবো। এরা আমাদের নতুন দুমশন নয়। অনেক দূর থেকে ওদেরকে ধাওয়া করতে করতে শামের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। তাদের রণকৌশল ও ফৌজের গতিবিধি আমরা বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই ময়দানেও আমরা ওদেরকে পরাস্ত করতে পারবো।'

আবু উবাইদা (রা) খালিদ ইবনে ওয়ালিদের এই পরামর্শের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। তবে অন্যান্য সালাররাও আবু উবাইদার দ্বিতীয় মতের সঙ্গে একমত হলেন না। তারা বললেন, অন্যান্য সেনা ছাউনি থেকে সৈন্য সরিয়ে এখানে আনলে রোমীয়রা টের পেয়ে যাবে। তারপর ঐ সব স্থান দুর্বল দেখে হামলা করে বসবে। তাই আমাদের মদীনার সেনা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এর আগে যদি রোমীরা পৌঁছে যায় আমরা আল্লাহর মদদের আশায় দৃঢ়তার সঙ্গে লড়বো।

কুনসুরীন থেকে সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) চলে আসায় সেখানকার প্রতিরোধ শক্তি যাতে হুমকির সম্মুখীন না হয়ে পড়ে এজন্য আবু উবাইদা (রা) তাকে আবার কুনসুরীন পাঠিয়ে দেন। খালিদ (রা) সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় তার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো, তিনি এ কঠিন মুহূর্তে আবু উবাইদা (রা) কে একা ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন না।

'ইবনুল জাররাহ ! – খালিদ (রা) আবু উবাইদা (রা) কে বললেন– আমার প্রয়োজনবোধ করলে এমন কাসেদ পাঠাবেন, যে আমার কাছে উড়তে উড়তে যাবে। আর আমিও আরো দ্রুত এখানে পৌঁছে যাবো।'

✪ ✪ ✪

মদীনা বাসীদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যখমী, কিশোর প্রমুখ যারা জিহাদে যেতে পারেনি। তারা যুদ্ধের খবরের জন্য সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকতো। আর তাদের উদগ্রীবতা রণাঙ্গন থেকে আসা কোন কাসেদই মেটাতে পারতো। তাই আবু উবাইদা (রা) এর দুই কাসেদ ছুটন্ত উটে করে মদীনায় যখন পৌঁছলো মদীনার অলি গলি 'কাসেদ এসেছে' 'কাসেদ এসেছে, শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠলো।

'এই আওয়াজ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর কানে যেতেই তিনি ঘর থেকে দৌড়ে বের হলেন। কাসেদরা তাকে দেখে উটকে না বসিয়েই উট থেকে লাফিয়ে নামলো।

'কোন ভালো খবর এনোছো ? – উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ঘরের দিকে হাটা দিলেন।

'খবর মন্দ নয়, তবে দ্রুত সেনা সাহায্য' পৌঁছলে ভালো খবরও আসতে পারে'– এক কাসেদ চলতে চলতে বললো।

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন! – আরেক কাসেদ বললো– আমরা কোথাও থেকে এখনও পিছু হটিনি।'

দুই কাসেদকে তিনি তার ঘরে নিয়ে মেহমানদারী করালেন। তারপর বিস্তারিত শুনলেন, রোমীয় ফৌজ ও সীমান্তবর্তী কবীলার লশকরের সমন্বিত আশু হামলার আশংকায় হিমসের মুসলমানরা কেমন ভয়াবহ আতংকের মধ্যে আছে।

'আল্লাহর কসম! – উমর (রা) সব শুনে বললেন– আমিও আমার ভেতর থেকে ইংগিত পাচ্ছিলাম, এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। মহান আল্লাহর দরবারে আমি কেন শোকর গুজার হবো না, যিনি আমাকে এতটুকু সতর্ক অনুভূতি দান করেছেন। আমি তো আগ থেকেই এর বিকল্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

তিনি প্রতিটি ময়দানে ও অভিযানে সেনা সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে রাখেন এভাবে যে, বসরা ও কূফা শহর তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, শহরের চারপাশে অসংখ্য সেনা ছাউনি ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে প্রতি মাসে শত শত মুজাহিদ তৈরি হচ্ছে। এজন্য সেখানে কোন বিধর্মীদের থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যাতে মুসলমানদের এ সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির কথা শত্রুরা জানতে না পারে। এভাবে আরো সাতটি শহরে বিকল্প সেনাসাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। প্রত্যেক শহরে চার হাজার করে সওয়ার

সব সময় প্রস্তুত থাকে। যে কোন ময়দান থেকেই তাদের ডাক আসুক তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে বের হয়ে যেতে পারে।

উমর (রা) তখনই এক কাসেদকে এ পয়গাম দিয়ে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এর কাছে মাদায়েন পাঠালেন যে, কাকা ইবনে আমরের নেতৃত্বে চার হাজার সওয়ার হিমসে পাঠিয়ে দাও। এতে হিমসের পরিস্থিতিও জানানো হয়।

তখন হযরত উমর (রা) এর কাছে তার উপদেষ্টারা বসা ছিলেন। যে কোন ফয়সালার আগে তিনি তাদের পরামর্শ নিয়ে নিতেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, হিমসে যদি মুসলমানরা টিকতে না পারে, পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাহলে না জানি তাদের এই পিছু হটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়। না জানি এদিকে কায়সারে রোম আর ওদিকে কিসরায়ে ইরান আবার মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসে।

'বন্ধুগণ! – আমীরুল মুমিনীন তার উপদেষ্টাদের বললেন– আল্লাহর কসম! এ হামলার আসল চক্রান্ত সীমান্তবর্তী কবীলাগুলোর। এদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান। ওরা চায় না, ইসলাম সে এলাকা পর্যন্ত পৌছাক। ওরা হেরাকলকে উস্কানি দিয়ে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার লশকরের যোগান দিয়েছে....

'আমি এও জানি, আমাদের মুজাহিদদের ওপর কোথাও জবাবী হামলা করার মতো মনোবল হেরাকলের এখন আর নেই। তার ফৌজের কোমর ভেঙ্গে গেছে। শামে যারা লড়েছে এর প্রায় অর্ধেক মরেছে। সমপরিমাণ ফৌজ হয়েছে যখমী। আর যারা দৈহিকভাবে অক্ষত আছে তাদের মধ্যে লড়াইয়ের জযবা খতম হয়ে গেছে। তবে মিসরের ফৌজ এসে হেরাকলের মুমূর্ষু মনোবলকে হয়তো কিছুটা চাঙ্গা করে তুলেছে। আর এই খারাপ সময়ে ঐ কবীলাগুলো তার পাশে দাঁড়ানোতে তার মধ্যে হয়তো পূর্বের সেই অহংকার ও ঔদ্ধত্য আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।.....

'এত দিন কবীলাগুলো যুদ্ধের আঁচড় থেকে নিরাপদ ছিলো। ওদের তিনটি বড় বড় বসতির লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদের সাহায্য করেছিলো। শত্রুদের পরাজিত করার পর আমরা ওদের সেই বসতি তিনটিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর অন্যসব বসতিগুলো নিরাপদ থাকে। তোমরা কি কেউ বলতে পারো, ঐ কবীলাগুলোকে কি করে রোমীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে?'

'ওদের বসতিগুলোর ওপর হামলা করা হোক– এক উপদেষ্টা বললেন– ওদের ঐ তিনটি বসতি ছাড়া বাকীরা যুদ্ধের স্বাদ এখনো পায়নি। যখন ওদের

ওপর অতর্কিত গজব এসে পড়বে তখন ঐ ত্রিশহাজার লশকর যারা বযনতিয়ায় গিয়েছে তারা নিজেদের বসতি বাঁচানোর জন্য পড়িমরি করে ছুটে আসবে।'

'আল্লাহর কসম! – উমর (রা) বললেন– আমাদের সবার চিন্তাভাবনার ধরণ এক। আর এতেই যখন অমরা এক তাহলে ইনশাআল্লাহ এই ঐক্যের দেয়ালকে কেউ ভাঙ্গতে পারবে না। ঐ কবীলার লশকররা যখন হেরাকলকে ছেড়ে চলে আসবে হেরাকল কিন্তু ওদের সঙ্গে যাবে না। তখন আবু উবাইদা সামান্য সেনা সাহায্য নিয়েই হেরাকলের ওপর চড়াও হতে পারবে। তখন তার বেঁচে থাকার একমাত্র পথ হবে অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে সামুদ্রিক জাহাজে মিসর বা রোমে রওয়ানা হওয়া। মনে রেখো, শাম এখন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত। এ শাম থেকে যারা আমাদের শত্রুদের পক্ষে যাবে আমাদের ওপর জবাবী হামলার উদ্দেশ্যে, তারা গাদ্দার-বিদ্রোহী। তাদের শায়েস্তা করা আমাদের জন্য ফরজ।'

হযরত উমর (রা) এর কাছে কোন সালার কোথায় কি দায়িত্বে আছে এর রেকর্ড সব সময় থাকতো। এক অলৌকিক মেধা ক্ষমতায় তার স্মৃতিপটে এসব তথ্য সব সময় সমুজ্জল থাকতো। তিনি যখন রণাঙ্গনে কোন পয়গাম বা কোন নির্দেশনা অথবা হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত পয়গাম পাঠাতেন তখন মনে হতো তিনি মদীনায় বসে নয় বরং যুদ্ধের ময়দানে সব স্বচক্ষে দেখে পয়গাম লিখছেন। মুসলিম অমুসলিম সব ঐতিহাসিকরা তার এ অসাধারণ বিচক্ষণতার কথা স্বীকার করে বিস্মিত হয়েছেন।

তিনি মাদায়েনে বিজেতা সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের কাছে পয়গাম পাঠালেন, সালার সুহাইল ইবনে আদী (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে গাসসান (রা) কে চার হাজার করে সওয়ার মুজাহিদ দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার কবীলাগুলোয় পাঠিয়ে দাও। যারা হেরাকলকে ত্রিশ হাজার ফৌজ দিয়েছে। সুহাইল ইবনে আদী যাবে যুক্কায় আর আবদুল্লাহ ইবনে গাসসান যাবে নায়ীন অঞ্চলে। তারা সেখান থেকে ঐ কাবীলাগুলোর বসতিতে হামলা চালাবে। এরা যদি লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করে এদেরকে যুদ্ধবন্দী করা হবে। আর লড়াই করলে এদের বসতিগুলো ধ্বংস করে দেবে। এখানে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সালার সুহাইল ও আবদুল্লাহ ইবনে গাসসান রাহা চলে যাবে।

আমীরুল মুমিনীন পয়গামের আরেক জায়গায় লিখলেন, সালার ওয়ালিদ ইবনে উতবা সীমান্তবর্তী এলাকার দুই কবীলা যেখানে বনী রবীআ ও বনী ওনুখ বাস করে সেখানে গিয়ে হামলা চালাবে। কারণ এ দুই গোত্রই অন্যান্য

গোত্রগুলোকে হেরাকলকে সেনা সাহায্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাছাড়া এরা নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে খুব বড়াই করে। এদেরকে শায়েস্তা করা খুবই জরুরী।

তিনি আরেকটি হুকুমনামায় লিখলেন, সালার ইয়ায ইবনে গনম (রা) উক্ত মুজাহিদ দল ও তাদের নেতৃত্বদানকারী সালারদের সিপাহসালার নিযুক্ত করা হবে। পয়গাম নিয়ে কাসেদ আর বিলম্ব করলো না। রওয়ানা হয়ে গেলো।

চার দিক থেকে এভাবে সেনা সাহায্যের ব্যবস্থা করেও তিনি স্বস্তি পেলেন না।

'বন্ধুগণ! – তিনি তার উপদেষ্টাদের বললেন– আমি এ সংকটকালে আমীনুল উম্মত উবাইদা ইবনে জাররাহকে নিঃসঙ্গ থাকতে দেবো না। আমি কিছু ফৌজ নিয়ে হিমস যাচ্ছি।'

তিনি মদীনা ও এর আশ পাশের এলাকা থেকে বেশ কিছু লড়াকু স্বেচ্ছা সেবক নিয়ে একটি ফৌজ বানালেন। তাদেরকে নিয়ে দামেশকের পথ ধরে হিমসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সঙ্গে ফৌজ থাকায় চলার গতি এত দ্রুততর ছিলো না। তাই উমর (রা) দ্রুতগতির এক কাসেদকে হিমস রওয়ানা করিয়ে দিলেন। সে যাতে এ পয়গাম দিয়ে আবু উবাইদা (রা) এর মনোবল বৃদ্ধি করে যে, আমীরুল মুমিনীন কিছু ফৌজ নিয়ে হিমস আসছেন।

✪ ✪ ✪

মুসলমানরা সীমান্তবর্তী যে তিনটি কবীলার বসতি ধ্বংস করে দিয়েছিলো সেগুলো হলো মূসেল, হীত ও ফরকইসা। এ তিন বসতির বেঁচে যাওয়া যোদ্ধারাও কবীলার লশকরে যোগ দিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম আক্রোশ নিয়ে। সুযোগ পেলে এরা মুসলমানদের চামড়া ছিলে নিতেও দ্বিধা করবে না। এরা এ প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের পুরো লশকরে ছড়িয়ে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। লশকরেরও প্রতিটি যোদ্ধার মনের অবস্থা এরকম যে, মুসলমানদেরকে এবার তারা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু কিছু দিন ধরে এ কবীলা ভিত্তিক লশকরে কানাঘুষা চলছে যে, ঐ রোমীদের ওপর বিশ্বাস রাখা ঠিক হবে না। কারণ এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলেই আবার আমাদের ওপর নানান ধরনের কর আরোপ করে আমাদের রক্তচোষা শুরু করবে। অন্যদিকে মুসলমানরা এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে আমাদের শত শত বসতি ধ্বংস করে।

এদের মধ্যে যারা মোটামুটি বুদ্ধি রাখে, তারা অন্যদের বুঝাতে লাগলো, ভেবে দেখো, রোমী ফৌজের এখন লড়ার মতো মানসিক শক্তি নেই। এরা লড়াইয়ের পরিবর্তে পিছু হটতে চেষ্টা করবে। আর এরা পিছু হটলে মুসলমানরা আমাদের ঘর বাড়ি আর আস্ত রাখবে না। আসলে এসব চাপা মন্তব্য ও কানাঘুষা ছড়ায় ঐ দশ বারজন মুজাহিদ যাদেরকে আবু উবাইদা (রা) হাদীদের নেতৃত্বে পাঠিয়েছিলেন। রোমী ফৌজ ও কবীলার লশকরের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি করতে তারা তাদের মিশনে বেশ ভালোই সফল হলো।

সীমান্তবর্তী কবীলাগুলোর সরদাররা যখন প্রথম হেরাকলের কাছে আসে তখন তাদের সঙ্গে পঁচিশ ত্রিশজন অত্যন্ত রূপসী মেয়ে ছিলো। নিরাপত্তার জন্য হেরাকল এদেরকে শাহী মহলে রেখে দেয়। হেরাকলের রূপ পিয়াসী লোলুপ দৃষ্টিও এদের ওপর পড়ে। হেরাকল তো প্রৌঢ়। তারই যদি এ অবস্থা হয় তার ছেলে কুসতুনতীনের অবস্থা কেমন হবে ? কুসতুনতীন মিসর থেকে ফৌজ নিয়ে এসে যখন বযনতিয়ার শাহী মহলে যায় তখন এ মেয়েদের ওপর চোখ পড়তেই তার রক্তে আগুণ ধরে যায়।

হেরাকল কবীলার লশকরসহ পুরো ফৌজের কমান্ডার বানিয়ে দেন তার এ ছেলে কুসতুনতীনকে। তারপর হিমসের ওপর হামলার সব পরিকল্পনা বুঝিয়ে কুসতুনতীনকে হিমসের সেই পাহাড়ি এলাকায় পাঠিয়ে দেন যেখানে ফৌজের বর্তমান অবস্থান। যাতে সে ফৌজ ও অধীনস্ত কমান্ডরদের দেখভাল করতে পারে এবং তাদের জরুরী দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

কুসতুনতীন সেই পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা বুনো পরিবেশে কয়েক দিন থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ঘোড়ায় চড়ে রোমী ফৌজ ও কবীলার লশকরের মধ্যে চক্কর মারা ছাড়া তো তার তেমন কোন কাজ ছিলো না। এ ধরনের কাজ আর কত দিন ভালো লাগে। একদিন সে বযনতিয়ার দিকে রওয়ানা করলো।

হেরাকলের ষোল সতের বছরের আরেকটি ছেলে আছে। ইউকেলিস তার নাম। দেখতে কুসতুনতীনের চেয়েও সুপুরুষ। তাকে এক পলক দেখেই কেউ আকর্ষিত না হয়ে পারবে না। তবে তার এ দৈহিক সৌন্দর্যে একটি খুঁত আছে। জন্মগতভাবে তার একটি হাত অসাড়। কৃশকায় এ হাতে সে কিছুই করতে পারে না। কিন্তু অন্য হাতে তলোয়ার চালনা এবং বর্শা ছোড়ায় সে খুব দক্ষ। ঘোড়সওয়ারীতেও সে অত্যন্ত পারঙ্গম। কিন্তু তার এ দক্ষতার ওপর বাবা হেরাকলের তেমন আস্থা নেই। তাই তিনি তার বড় ছেলে কুসতুনতীনকে নিজের

স্থলাভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু ইউকেলিসের মা লিজা এটা কোনমতেই মেনে নিতে পারেনি। লিজা হেরাকলের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে রূপদর্শী এবং এখনো যৌবনবতী। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চতুরও। মহল ষড়যন্ত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। হেরাকল নিজেও তার এ স্ত্রীকে সমীহ না করে পারেন না।

যা হোক, কুসতুনতীন বযনতিয়ার দিকে রওয়ানা করে। বযনতিয়া শহরের কাছে একটি নদী আছে। নদীর তীরে এত অসংখ্য গাছ সংঘনিষ্ঠ হয়ে জায়গা জায়গা এমন ছাউনির মতো করে রেখেছে যে, দূর থেকে মনে হয় বড় বড় সুবজের দেয়াল। কস্তন্তীন এখান দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তার কানে কয়েকটি মেয়েলি কণ্ঠের হাসির শব্দ এলো। সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে ফেললো। এসময় একটি মেয়ে দৌড়ে তার সামনে এলো। পেছন পেছন আরেকটি মেয়েও দৌড়ে এলো।

এরা ছিলো সেই সীমান্তবর্তী এলাকার কবীলা সরদারদের পঁচিশ ত্রিশজন মেয়ে। ওরা এ নদীতে আজ গোসল করতে এসেছে। গোসলের ফাঁকে কিছুটা দৌড়ঝাপও করে নিচ্ছে। যে মেয়ে দুটি দৌড়ে এ দিকে এসেছে এদের একজনের বয়স ষোল সতের বছর। আরেকজনের বার তের। ষোল সতের বছরের মেয়েটির ওপর কুসতুনতীনের চোখ আটকে গেলো। একেতো মেয়েটি খুব সুন্দরী। তারপর আবার অর্ধ উলঙ্গ। ভবিষ্যৎ রোমের বাদশাহ কুসতুনতীন। সেতো জানেই, প্রজাদের মেয়েরা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসদাসীদের মতো।

কুসতুনতীন ষোল সতের বছরের মেয়েটির সামনে তার ঘোড়া নিয়ে গেলো। ছোট মেয়েটি একটু দূরে থেমে কুসতুনতীনের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর ঐ মেয়েটি ভয় পেয়ে পিছু হটতে লাগলো। কস্তন্তীন ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েটিকে ধরতে লালসাসিক্ত গলায় তাকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু মেয়েটি পিছিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটির হাত ধরে কুসতুনতীন তাকে তার নিজের দিকে টেনে আনলো। তারপর মেয়েটির হাত ছেড়ে তার দুই বাহু মেয়েটির দিকে বাড়ালো। কিন্তু মেয়েটি পেছনে সরে গেলো। কুসতুনতীন ধরতে পারলো না। সে খুব ক্ষেপে গেলো। মেয়েটি পেছনে ফিরে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। না উঠেই হেচড়াতে হেচড়াতে পেছনের দিকে সরে যেতে লাগলো। এখন তার আর কস্তন্তীনের মধ্যে ব্যবধান তিন হাত। আচমকা কোত্থেকে একটি ঘোড়া তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

কুসতুনতীন বারুদভরা চোখে সওয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখলো। এ তার ছোট ভাই ইউকেলিস। কুসতুনতীন ঘর ঘর শব্দে তাকে সরে যেতে বললো।

কস্তন্তীন তলোয়ার বের করে ফেললো। ইউকেলিসও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তলোয়ার বের করে বুক টান টান করে দাঁড়ালো।

'আমার সামনে থেকে সরে যা ইউকেলিস! – কুসতুনতীন চ্যালেঞ্জ করলো– আগ থেকেই তোর একটি বাহু নেই। আমি তোকে তোর দ্বিতীয় বাহু থেকেও বঞ্চিত করবো।'

'তাহলে প্রথম আঘাত তুমি কর– ভারী শান্ত গলা ইউকেলিসের– তাহলে তোমার আর আফসোস থাকবে না যে, তুমি মারার সুযোগই পাওনি। এ মেয়েগুলো আমাদের মেহমান। এদের দিকে আমি তোমাকে বদ নিয়তে তাকাতেও দেবো না।'

আচমকা একটি ঘোড়া দুই ভাইয়ের মাঝখানে এসে পা ঠুকলো। সওয়ার ঘোড়া থেকে নামলো দৃঢ় পায়ে। তারা দেখলো, হেরাকলের মুহাফিজ বাহিনীর এক অফিসার। কুসতুনতীনের সামনে এ লোক একজন কর্মচারী বৈ কিছু না। কুসতুনতীন তাকে সামনে থেকে সরে যেতে বললো।

আমি শাহী খান্দানের মুহাফিজদের একজন– ঐ অফিসার বললো নির্ভয়ে– শাহী খান্দানের প্রত্যেকের হেফাজত নিশ্চিত করা আমার কর্তব্য। একটি মেয়ের জন্য দুই শাহজাদার রক্ত বইতে দেবো না আমি। প্রথমে আপনারা দুজন আমাকে হত্যা করে তারপর যা করার করবেন।'

অফিসারের সুরে এমন একটা প্রত্যয় ছিলো যে, কুসতুনতীন কোন কথা না বলে ঘোড়ায় চড়ে সেখান থেকে চলে গেলো। ইউকেলিস আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, একটি মেয়েও আর ওখানে নেই। এ অফিসার কয়েকজন মুহাফিজসহ মেয়েদের পাহারা দিচ্ছিলো, পরে দুই ভাইয়ের ঘোড়ার খুড়ের শব্দ পেয়ে এ দিকে এসে দেখে এ কাণ্ড।

ইউকেলিসও সেখান থেকে মহলে ফিরে গেলো।

মহলে ফিরতেই হেরাকল ইউকেলিসকে ডেকে নিয়ে অনেক ধমকালেন। সে তার বড় ভাইকে কোন সাহসে অপদস্থ করলো। সামনে যাতে আর এ ধরণের ঘটনা না ঘটে। ইউকেলিস কিছুই বললো না। সে জানতো, তার বাবার কাছে এ ধরনের নোংরা কাজ কোন অপরাধ নয়। নিঃশব্দে সে চলে এলো সেখান থেকে।

ইউকেলিস নিজের ঘরে না গিয়ে মহলের সে অংশে চলে গেলো যেখানে কবীলার সরদারদের মেয়েদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। যে মেয়েকে নিয়ে এ

ঘটনা ইউকেলিস তাকে খুঁজতে লাগলো। মেয়েটি নিজেই এসে ইউকেলিসের শুকরিয়া আদায় করলো যে, সে আজ তার আব্রু বাঁচিয়েছে।

ইউকেলিস তার বাবার নাম ও তাদের কবীলার নাম জানতে চাইলো। মেয়েটি তাকে তার বাবা ও নিজ গোত্রের নাম জানালো। ইউকেলিস আর কিছু না বলে নারীমহল থেকে বেরিয়ে এলো।

পর দিন সকালে ইউকেলিস ঘোড়ায় চড়ে বযনতিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লো। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঐ পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে কবীলা-লশকর ও রোমী ফৌজ ছাউনি ফেলে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইউকেলিস অনেক খুঁজে ঐ মেয়ের বাবাকে বের করলো। মেয়ের বাবাও এক কবীলা সরদার। ইউকেলিস মেয়ের বাবাকে গতকালের ঘটনা সব জানালো। আর বললো, ঐ মেয়েদের ইযযত বাঁচাতে হলে ওদেরকে মহল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। স্বয়ং হেরাকলের মতলবও ঐ মেয়েদের ব্যপারে সুবিধাজনক নয়। ইউকেলিস সেখানে আর দেরী করলো না। বযনতিয়ার ফিরতি পথ ধরলো।

ও দিকে মেয়ের বাবা অন্যান্য সরদারদের একত্রিত করে তার মেয়ে যে কস্তন্তীনের হাতে ইযযত হারাতে বসেছিলো এবং ইউকেলিস তাকে বাচিয়েছে এ ঘটনা জানালো তাদেরকে। সবাই ক্ষেপে উঠলো। চলো চলো হেরাকলের কাছে চলো। আমরা আমাদের মেয়েদের ফিরিয়ে আনবো।

এ কথা পুরো কবীলার লশকরে ছড়িয়ে পড়লো। ঐ মেয়েদের বাপ, ভাই চাচা মামা এবং নিকটাত্মীয়রা সব তো ঐ লশকরে যোগ দিয়েছিলো হেরাকলের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এবার এরা ক্ষোভে ফেটে পড়লো। কয়েকজন সরদার পরামর্শ দিলো, আগে কস্তন্তীনকে জিজ্ঞেস করে নাও।

দুই তিন দিন পর কস্তন্তীন ফিরে এলে কবীলার সরদাররা তাকে ঘিরে ধরে তাদের মেয়ের সঙ্গে তার ঐ আচরণের জবাবদিহিতা চাইলো। কস্তন্তীন তাদেরকে জানালো, তার বিরুদ্ধে এটা এক মিথ্যা অভিযোগ। কস্তন্তীন নয় ছয় বুঝিয়ে তাদেরকে খুশী করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ সরদার বললেন, সাধারণ কেউ যদি এ অভিযোগ করতো তাহলে হয়তো তাকে সন্দেহ করা যেতো যে, সে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু যে শুনিয়েছে সে তো ছিলো এক শাহজাদা। শাহজাদা কেন মিথ্যা বলবে।

দুই তিন কবীলার সরদার বললো, বযনতিয়া গিয়ে মেয়েদেরকে আগে একথা জিজ্ঞেস করে নিই। তখন ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হলে আমরা লড়াই করবো না আর। সব সরদাররা এ ফয়সালা মেনে নিলো। কস্তন্তীন তাদেরকে শান্ত করতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু এরা বযনতিয়া রওয়ানা হয়ে গেলো।

বযনতিয়া পৌঁছে সরদাররা তাদের মেয়েদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই ঐ মেয়ে নিজে এসে পুরো ঘটনা সরদারদের শুনিয়ে দেয়। সরদাররা মেয়েদের পুরো দলটিকে নিয়ে হেরাকলের কাছে যায় এবং এ ঘটনার জন্য জবাবদিহিতা কামনা করে। হেরাকল তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাদেরকে হুমকিও দেন যে, তারা যদি তাদের লশকর প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে রোমীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করার পর তাদের বসতিগুলো উজাড় করে দেবে এবং এ মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে আসা হবে।

যা হোক, অবশেষে সরদাররা সিদ্ধান্ত নেয় তারা এই মেয়েদেরকে আর মহলে রাখবে না। হেরাকল অনুভব করলেন কবীলার এ ত্রিশ হাজার সৈন্য যদি চলে যায় তাহলে তাকে শামের শেষ দুর্গ থেকেও পালাতে হবে। তাই তিনি সরদারদের বহু কষ্টে সম্মত করালেন যে, সেনা ছাউনিতে পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থা করে মেয়েদেরকে রাখা হবে এবং সেখানে সব সময় মুহাফিজ নিয়োজিত থাকবে।

ওরা এটা মেনে নিলেও রোমীদের ওপর থেকে তাদের পূর্ব আস্থা অনেকটাই কমে যায়। এজন্য কবীলার সৈন্যদের মুখে মুখে রটে যায়, এই রোমীদের ওপর কোন আস্থা নেই।

✪ ✪ ✪

এরপর ইউকেলিস আবার একদিন যুদ্ধ ছাউনিতে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা সেনাদের মাঝে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং খ্রিষ্টান কবীলা সরদার ও সৈনিকদেরকে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো তারা তাদের মেয়েদের ব্যাপারে এখন নিরাপত্তাবোধ করছে কি না।

এ পুরো ফৌজের কমান্ডার কস্তন্তীন। এ খবর তার কাছে পৌঁছতে সময় লাগলো না। সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ইউকেলিস যেদিকে আছে সেদিকে ঘোড়া হাঁকালো। সেখানে গিয়ে দেখলো, ইউকেলিস কবীলা সরদারদের সঙ্গে কথা বলছে।

'এখানে কেন এসেছো ইউকেলিস ? – তীব্রসূরে জিজ্ঞেস করলো কস্তন্তীন– তোমার তো প্রথমে আমার কাছে আসা উচিত ছিলো। পুরো ফৌজে ঘুরে ফিরে সিপাহীদের যা ইচ্ছে তা বলার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি।'

'আমি নিজেই নিজেকে এ অধিকার দিয়েছি। – ইউকেলিস কস্তন্তীনের চোখে চোখ রেখে বললো– তুমি যে হেরাকলের ছেলে আমিও তার ছেলে। আমি তোমার অধীনস্থ নই যে, তুমি যা চাইবে তাই করবো আমি। তোমার কথার জবাব দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই। তবুও আমাদের সালতানাতের এ কঠিন পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বলছি, সীমান্তবর্তী এ গোত্রপতিরা আমাদের সাহায্য করতে এসেছিলো। আর তুমি এদের মধ্যে চরম সন্দেহ সৃষ্টি করেছো ; শুধু একটি মেয়ের জন্য। আমি দেখছি, এদের মনোকষ্ট দূর হয়েছে কি না। আমি আবার এদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা! তুমি কেন স্বীকার করছো না যে, তুমি অক্ষম, অর্ধাঙ্গ একজন মানুষ। ফৌজ ও রণাঙ্গণের জন্য তুমি শুধু বেকারই নও বোকাও। এখানে বক্তব্য দিতে এসেছো। জেনে রাখো, যুদ্ধের ময়দানে জিহ্বা নয় তলোয়ার চালাতে হয়।'

ইউকেলিস জবাবে কিছু বললো না। কস্তন্তীনকে একটি তীর্যক হাসি উপহার দিয়ে সেখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসলো। কস্তন্তীন আগুণ চোখে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না– কস্তনীন হেরাকলকে ইউকে-লিসের এসব কথা জানিয়ে বললো– সে বলেছে, গোত্র সেনাদের মধ্যে নাকি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে সে। কিন্তু আমি তো মনে করি, সে ওদেরকে আম-াদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আপনি জানেন, সে এ মেয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় আমাদেরকে অপদস্থতার কোন গর্তে গিয়ে পড়তে হয়েছে!'

'আমি সবই জানি– হেরাকল্ বললেন– এ ছেলে বুদ্ধি খাটাতে জানে না। আর ওর মা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। তুমি তাই নিজের কাজে আরো মনোযোগ দাও।'

'আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই। ইউকেলিসকে খুব সহজেই গায়েব করে দেয়া যায়। আপনি কি এ চাল ভেবে দেখেননি ?'

'হ্যাঁ, আমি এটাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন এসব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে অযথা বাক্যব্যয় করার সময় নেই। সালতানাতের শেষ দুর্গটিও হারাতে বসেছি আমরা..... ইউকেলিসকে আমিও মারাতে চাই। কিন্তু ওর মাকে চেনো না তুমি।

সে এমন গোপন চাল দেবে যে, আমাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে। এ বিষয়টা আমার  ওপরই ছেড়ে দাও। তুমি হিমসের ওপর নজর রাখো। আর জোর চেষ্টা চালিয়ে যাও, আলজাযীরা তথা সীমান্তবর্তী গোত্রীয় সৈন্যরা যাতে আবার অসন্তুষ্ট না হয়ে পড়ে। যখন আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে তখন ওদের ঘরেই ওদের কবর খনন করবো।'

'যা করার দ্রুত করতে হবে। না হয় ঐ মা– ছেলে মিলে এমন কিছু করে বসবে আমাদের আর করার কিছুই থাকবে না। আমরা কেমন ভয়াবহ অবস্থায় আছি সেটা আমার চেয়ে আর কে বেশি উপলব্ধি করতে পারবে..... আপনি আ-মাকে আরেকটু ক্ষমতা দিলে ইউকেলিসকে গাদ্দারীর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতাম এবং তার মাথা কেটে সারা ফৌজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করে ঘোষণা করাতাম, এ হলো গাদ্দারীর শাস্তি।'

'শোন! ওকে যদি গাদ্দারীর অপরাধে বা গোপনেও হত্যা করা হয় তাহলে ওর মা কবীলা সেনাদের বলবে, তার ছেলেকে শুধু এ কারণে হত্যা করা হয়েছে যে, সে এক কবীলা কন্যার ইযযত বাঁচিয়েছে। তারপর কি হবে তুমি ভেবে দেখেছো কস্তন্তীন?'

হেরাকল বুঝতে পারলেন, তার ছেলের এখন যে বয়স এ বয়সে প্রতিশোধ স্পৃহা অদম্য থাকে। তাই তার মাথার ভেতর এখন ইউকেলিসকে হত্যা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি তার অভিজ্ঞতার নতুন একটা কৌশল আবিষ্কার করলেন।

'আমার প্রিয় পুত্র! – হেরাকল বললেন– একটি পদাধিকার দিয়ে ইউকেলি-সকে আমি এক জেনারেলের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেবো। আর ওর মাকে বড় সুন্দর এক স্বপ্ন দেখাবো। কিন্তু ইউকেলিস এক হাত দিয়ে কী লড়বে? প্রথম সংঘর্ষেই সে মারা যাবে। এতে কি হবে? সে মারাও যাবে আর তার মাও গর্ব করে বলবে, তার ছেলে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখিয়ে মারা গেছে।'

'তাহলে কি ঐ জেনারেলকে আগ থেকেই বলে দেবেন যে, ইউকেলিসকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে সে সহজেই মারা পড়বে?'

'কস্তন্তীন!– হেরাকলের সুরে স্নেহ এবং রাগের মিশ্রণ– মনে হচ্ছে তুমি তোমার আসল দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ইউকেলিস হত্যাই তোমার প্রধান ভাবনা হয়ে উঠেছে। তোমাকে আমি এত বড় ফৌজের কমাণ্ডার বানিয়েছি। যদি ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা আবেগ ভেতরে নিয়ে ফৌজের লড়াইয়ের নেতৃত্ব

দাও তাহলে ফলাফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে, হয় পরাজিত হয়ে দুশমনের হাতে মারা পড়বে অথবা বন্দী হবে.... যাও, ফৌজের কাছে চলে যাও। মাথা থেকে এসব বের করে ফেলো। যা করার আমিই করবো।'

কস্তন্তীন সেনা ছাউনিতে ফিরে গেলো।

✪ ✪ ✪

কস্তন্তীন চলে যাওয়ার পর হেরাকল এক মুহাফিজকে দিয়ে ইউকেলিসের মা লিজাকে ডাকিয়ে আনলেন। চল্লিশোর্ধ এ বয়সেও লিজাকে যে-ই দেখবে সে-ই ষোড়ষী তরুণী বলে বিষম খাবে। রূপের ঐশ্বরিক এক ছন্দ যেন এখনো লিজাকে ছন্দোবদ্ধ করে রেখেছে।

বহু বছর আগে এক লুটেরা হেরাকলের কাছে লিজাকে নিয়ে আসে। হেরাকল এমন হীরা জহরতকে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই লুফে নেয়। হেরাকলকে বলা হয়েছিলো, এর বাবা বড় ব্যবসায়ী ও আমীর ছিলেন। লুটেরা তাকে অপহরণ করে তার কাছে নিয়ে আসে। এটা সে সময়ের ঘটনা হেরাকল যখন শাহে ফূকাসকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং পুনরায় শামের ওপর হামলা করে প্রায় অর্ধেক শাম জয় করে নেন।

পরে জানা যায়, লিজা এক অকল্পনীয় রহস্য। সে আসলে কোন ব্যবসায়ীর মেয়ে নয়। তাকে অপহরণও করা হয়নি। লিজা আসলে পারস্য সম্রাটের শাহজাদী। এক অভিনব ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য শাহজাদী লিজা এখানে আসে। পারস্য সম্রাট চাইতো হেরাকলকে হত্যা করতে। হেরাকলকে হত্যা করতে পারলে রোমীরা পারসিকদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তার এ ইচ্ছা শাহজাদী লিজার কাছে প্রকাশ করেন। লিজা তখন তার পরিকল্পনার কথা জানায় যে, সে এভাবে এভাবে অভিনয় করে প্রথমে হেরাকলের দাসী-বাদী হবে। তারপর তাকে শরাবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে পালিয়ে আসবে। পারস্য সম্রাট লিজাকে প্রয়োজনীয় লোকজনসহ হেরাকলের কাছে পাঠিয়ে দেন।

হেরাকল লিজার রূপে এতই প্রভাবান্বিত হন যে, তিনি তাকে আবেগে বলে উঠেন, তুমি যেন ইরানী রূপসীদের অতুলনীয় নমুনা। তখন লিজার অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আমি তো ইরানেরই এক সুন্দরী। হেরাকল কোন প্রতিক্রিয়া না দেখালেও ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে উঠেন। লিজার ব্যাপারে তিনি

সন্দিহান হয়ে উঠেন। তার আসল পরিচয় বের করার জন্য তিনি ওর সঙ্গে এমন হৃদয়ঘটিত ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেন যে, লিজা নিজেও হেরাকলের প্রতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। হেরাকল তাকে তার কানিয না বানিয়ে তার মাহবুবা– প্রেমাস্পদ বানিয়ে নেন।

কিন্তু শাহজাদী লিজা তখনো তার কর্তব্যের কথা ভুলে যায়নি। একদিন সে শরাবে বিষ মিশিয়ে হেরাকলের হাতে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে প্রেমের প্রচণ্ড ঝড় উঠে। হেরাকল যখন শরাবের পেয়ালা তার ঠোঁটে ছোয়ালেন লিজা একটানে তার হাত থেকে পেয়ালাটি কেড়ে নিলো। হেরাকল সবিস্ময়ে লিজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি তোমাকে বিষ পান করাতে পারবো না– লিজা বললো এবং তার আসল পরিচয় ও পারস্য সম্রাটের ষড়যন্ত্রের কথা তাকে জানিয়ে দিলো।

পরদিন হেরাকল পারস্য সম্রাটের কাছে এ পয়গাম পাঠালেন যে, যে শাহজাদীকে তুমি আমাকে বিষ পান করানোর জন্য পাঠিয়েছিলে সে এখন আমার স্ত্রী হয়ে গেছে। জোর করে নয়। সে নিজেই নিজেকে আমার কাছে সোপর্দ করেছে। আর আমিও পরমানন্দে ওকে গ্রহণ করেছি। বিষ পান করাতে আরেকজন শাহজাদী পাঠাতে পারো। তবে মনে রেখো, যে বাদশাহ রণাঙ্গণের বীর পুরুষ হয় সে রণাঙ্গনে এসে বীরত্ব দেখায়। তার মেয়েকে দুশমনের কাছে পাঠায় না।

যা হোক, লিজা যখন প্রথমে ইউকেলিস পরে আরেকটি সন্তান জন্ম দিলো তখন হেরাকল তার সঙ্গে এমন আচরণ করতে শুরু করলেন যে, লিজা যেন কোন এক কালে তার বাদী ছিলো। তখন লিজা তার ভুল বুঝতে পারে যে, এসব বাদশাহরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে কোন পণ্যের অধিক মূল্য দেয় না। একটু পুরাতন হলেই ফেলে দেয় এবং আরেকটি কুড়িয়ে নেয়।

কিন্তু লিজা তখন নিজের চুল ছিড়া ছাড়া আর কি করতে পারতো? তাই সে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য মহল ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। আর মহল ষড়যন্ত্রে তার মাথাও দারুণ খেলতে থাকে।

✪ ✪ ✪

সে লিজাকেই হেরাকল এখন ডাকিয়ে এনেছেন।

'কেন ডেকেছো আমাকে ?' – লিজা এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো হেরাকল যেন অবুঝ কোন ছেলে।

'তোমার ছেলে সম্পর্কে কিছু কথা বলতে' – হেরাকল নরম গলায় বললেন।

'আমারই নয়। ছেলে তোমারও। বলো কী কথা!'

'তোমার একটি ইচ্ছা পূরণ করতে চাই। তুমি তোমার জীবদ্দশায় ওর মাথায় রোমের মুকুট দেখতে চাও। কস্তন্তীনকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। এখন কোন কারণ ছাড়া এ সিদ্ধান্ত পাল্টানোও যাবে না। তবে একটা উপায় বের করেছি। আমি আমার জীবদ্দশাতেই সালতানাতকে দু'ভাগে ভাগ করে দেবো। এক অংশ কস্তন্তীনের অপর অংশ ইউকেলিসের। আগে শামের ফয়সালাটা হয়ে যাক'।

'এর ফয়সালা তো হয়ে গেছে। যে দুশমন এত অল্প সংখ্যক হয়েও তোমাকে শামের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে তোমাকে তারা এখান থেকেও উৎখাত করবে।'

'লিজা! – হেরাকলের ব্যথাতুর গলা কেঁপে উঠলো– এমন অলুক্ষণে কথা কেন বলছো ! মুসলমানদের কাছ থেকে আমি শাম ছিনিয়ে নেবো এবং ইউকেলিসকে তার বাদশাহ বানাবো।'

'আমার প্রার্থনাও তাই; কিন্তু এ যেন এমন হয়ে গেলো যে, আকাশ থেকে নক্ষত্র পড়লে অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেবো..... তোমার হাতে যে সালতানাত আছে সেটা কেন ইউকেলিসকে দিচ্ছো না ?'

'আমি এখন ওকে অর্ধেক ফৌজের নেতৃত্ব দিচ্ছি। প্রথমে ওকে সেনা ছাউনিতে পাঠাবো। একজন জেনারেলকে তার জন্য নিযুক্ত করবো ওকে ভালো করে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। আমি পূর্ণ আশাবাদী, সে এক হাতেই দুমশনের ওপর তার তলোয়ারের এবং ফৌজের ওপর তার নেতৃত্বের কারিশমা বিস্তার করতে পারবে। তারপর ওকে জেনারেল বানিয়ে দেবো।'

'আজ কেন তোমার এ খেয়াল এলো ? এতদিন কেন ওকে অক্ষম ভেবে এসেছো ?'

'এত দিনে আমি ওর কাছ থেকে একটা জিনিস পেয়েছি। যে গোত্র অধিপতিরা সাহায্যের জন্য আমাদেরকে সৈন্য দিয়েছে ওদের এক মেয়ের ওপর কস্তন্তীন হাত উঠাতে গেলে ইউকেলিস তলোয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং সে মেয়েকে তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এ ঘটনায় আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, আমার এ ছেলের মধ্যে যেমন দূর্দান্ত সাহস আছে তেমনি স্বাধীন ফায়সালা

করারও যোগ্যতা আছে।'

লিজা যতই চতুর আর ধুরন্ধর মেয়ে হোক না কেন হেরাকলের এই ধূর্ত চাল ধরতে পারলো না। লিজা যখন সেখান থেকে বের হলো তার চোখে মুখে খুশির আভা ঝিলিক দিচ্ছিলো।

একটু পর হেরাকল ইউকেলিসকে ডাকিয়ে আনলেন। ওর মা ওকে বলে দিয়েছে, তার বাবা তার জন্য কি ফয়সালা করেছে। সেও বেশ উৎফুল্ল হয়ে বাবার কাছে এলো।

'বেটা ইউকেলিস! – হেরাকল বললেন– সেদিন তোমার বড় ভাইকে অসম্মান করেছো বলে আমি তোমাকে ভালো মন্দ বলেছি। কিন্তু পরে একা একা ভেবে দেখার পর অজান্তেই আমার মন তোমার প্রশংসায় ভরে গেছে যে, তুমি যেমন সাহসী তেমনি বিচক্ষণও। তোমার কারণেই কবীলা সেনারা এখনো আছে আমাদের সঙ্গে। কস্তন্তীনকে না রুখলে আমরা ঐ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়তাম। .... এখন আমি তোমাকে জেনারেল ইনথিউনিসের সঙ্গে যুদ্ধ ছাউনিতে পাঠাচ্ছি। তার কাছ থেকে তুমি যুদ্ধের ও নেতৃত্বের কলা কৌশল শিখে নাও। তারপর তোমাকে জেনারেল করে দেবো।'

✪ ✪ ✪

হেরাকলের ব্যক্তিগত গুপ্তচরের ব্যবস্থা আছে। আর এ ব্যবস্থা এতই গোপন যে, তার ছেলে কস্তন্তীনও তা জানে না। হেরাকলের মুহাফিজ কামান্ডারদের বলা আছে, কেউ যদি এসে বলে 'জরুরী কথা আছে' সঙ্গে সঙ্গে তাকে হেরাকলের কাছে পৌঁছে দেবে। হেরাকল যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন। এভাবে একদিন তার ব্যক্তিগত এক গুপ্তচর হাজির হলো।

'তুমি জানো আমি কি জানতে চাই' – হেরাকল গুপ্তচরকে বললেন।

'ঐ গোত্র সেনাদলের ওপর এখন আর নির্ভর করা যাবে না– গুপ্তচর বললো– ওদের মধ্যে শুধু হতাশাই কাজ করছে। ঐ মেয়ের ঘটনা এখন সাধারণ সেনা সদস্যরাও জানে। কস্তন্তীনকে ওরা ভালো নজরে দেখে না। তার নাম শুনলেই ওদের চোখে মুখে অপছন্দের ছায়া পড়ে।'

'এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কি ? যদি আমি হুকুম দেই হিমস অবরোধ করে নাও এবং অবরোধ যাতে দীর্ঘতর না হয় সে চেষ্টাও চালিয়ে যাও। তাহলে কি গোত্র সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই করবে ?'

'ওরা নিজেরাই শর্ত আরোপ করে নিয়েছে যে, রোমী ফৌজ লড়লে তারাও লড়বে। রোমীরা যদি পুর্ণ উদ্যমে না লড়ে তাহলে এরা পালিয়ে যাবে। 'শাহেনশাহে মুআযযাম! আপনি তো লড়াবেন সালতানাতকে বাঁচাতে। আর এরা লড়বে নিজেদের সন্তান সন্তুতি ও ঘরবাড়ি বাঁচাতে। ওদের কথা শুনে মনে হয়, মুসলমানদের পাল্লা ভারী হলে মুসলমানদের সঙ্গে এরা যোগ দিক বা না দিক এরা চলে যাবে এখান থেকে– এটা নিশ্চিত।'

'আমাদের ফৌজের কী অবস্থা ? ওদের মধ্যে কতটুকু জোশদীপ্ত তাজাভাব দেখেছো ?'

'শাহেনশহে মুআযযম! আপনার মনে আঘাত দিয়ে আমিও কম কষ্ট পাচ্ছি না। কিন্তু বাস্তব বলাটা আমার দায়িত্ব। আমাদের ফৌজের মধ্যে জোশ জযবার কিছুই চোখে পড়ছে না। আমি নিজে ওদের তাঁবুতে ঘুরে কথা বলেছি এবং কথা শুনেছিও। ঐ হতভাগাদের ওপর মুসলমানদের ভয় বিস্তার করে আছে এখনো। হিমসের মুসলমান সৈন্য বড় জোর চার হাজার হবে। আমাদের এত বড় ফৌজ তো দূরের কথা গোত্রভিত্তিক ত্রিশ হাজার সৈন্যের সামনেও দাঁড়াতে পারবে না। তারপরও আমাদের ফৌজের সিপাহীদের ফ্যাকাসে মুখ দেখে আপনিও হতাশ হবেন। এমন কিছু আওয়াজও উঠছে যে, মুসলমানদের ধর্মই সত্য। কারণ তাদের সঙ্গে স্বয়ং খোদা আছেন।'

হেরাকলের কাছে এ ধরণের হতাশব্যঞ্জক রিপোর্ট হরহামেশা পৌছছিলো। আসলে তার মতো এমন পৃথিবী বিখ্যাত বাদশাহ ও সেনা-অধিনায়কের এসব রিপোর্টের প্রয়োজনও ছিলো না। তিনি শুধু অপেক্ষায় ছিলেন, কোন রিপোর্টে যদি উৎসাহ ব্যঞ্জক কোন খবর এনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, মুসলমান সৈন্য আপাতত কোন সেনা সাহায্য পাচ্ছে না। এ সামান্য কিছু মুজাহিদকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে এত আশংকা বা দ্বিধা কিসের!

✪ ✪ ✪

যুদ্ধে যে কোন পক্ষের সেনা সাহায্যই আসুক তা আসে খুব গোপনে। সেনাসাহায্যের নেতৃত্বে যেই থাক, খুব গোপনীয়তা অবলম্বন করে পথ চলে। যাতে শত্রুপক্ষ কিছু জানতে না পারে এবং আচমকা শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু উমর (রা) এর উল্টো পথ অবলম্বন করলেন। তিনি কয়েকজন উট সওয়ারকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন। তারা খুব দ্রুত পৌঁছে যুদ্ধরত আশপাশের এলাকায় এ খবর দেবে, মদীনা থেকে বড় এক সেনাদল আসছে। বিশেষ করে যেসব গোত্র হেরাকলকে ত্রিশ হাজার ফৌজ দিয়েছে তাদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে দিতে হবে, মুসলমানরা তাদের বসতিগুলো ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সৈন্য মোতায়েন করছে।

হযরত উমর জানতেন, হেরাকলের অবস্থা এখন মাস্তলভাঙ্গা নাবিকের মতো। সামান্য পদশব্দেই তিনি চমকে উঠবেন। আর এত বড় খবর পেয়ে হয়তো তিনি শেষ খড়কুটাটাও অবলম্বন করতে ভয় পাবেন।

এ দিকে যথা সময়েই কাসেদ আবু উবাইদা (রা) এর কাছে এসে পৌঁছায়। তাকে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর বিস্তারিত পয়গাম জানায় যে, তার নির্দেশে অমুক অমুক স্থান থেকে মুজাহিদরা আসছে। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনও কিছু সৈন্য নিয়ে আসছেন।

আবু উবাইদা (রা) এর মনে হলো, এ কাসেদ যেন আকাশ থেকে নাযিলকৃত কোন ফেরেশতা। মুজাহিদদেরকে তিনি এ খবর জানাতেই সবার মধ্যে জোশ জযবা যেন আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। সবার কণ্ঠে এক অমোঘ সংকল্পের ঢেউ উঠলো– জয় অথবা মৃত্যু। মুজাহিদদের এ উদ্বেলিত জযবার আরেকটি কারণ ছিলো, তাদের সঙ্গে চার হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে যোগ দিয়েছেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)।

এর একদিন পর আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আরো কয়েকজন কাসেদ উট সওয়ার হয়ে এলো। আবু উবাইদার জন্য পয়গাম ছিলো, প্রচার মাধ্যম দ্বারা যেন তিনি এ খবর ছড়িয়ে দেন, মুসলমানরা বড় ধরণের সেনা সাহায্য পাচ্ছে। আর সীমান্তবর্তী যেসব কবীলা হেরাকলকে ত্রিশহাজার যোদ্ধা দিয়েছে তাদের বসতিতে মুজাহিদ দল পৌঁছে গেছে। হেরাকলকে সাহায্য করায় তারা মুসলমানদের কাছে গাদ্দার হয়ে গেছে। এর পরিণামে তাদের বসতিগুলো ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তাদের ফসলাদি ও গৃহপালিত পশুগুলো মুসলমানরা নিয়ে নেবে।

আমীরুল মুমিনীনের পয়গাম অনুযায়ী আবু উবাইদা (রা) কাজ শুরু করে দিলেন।

তারপর এ উট সওয়ার কাসেদরা সীমান্তবর্তী কবীলার লোকদের ছদ্মবেশে রওয়ানা হয়ে গেলো। কবীলাভিত্তিক সেনা ছাউনিতে ওরা পৌঁছতেই কবীলা সৈন্যরা ওদেরকে নিজেদের লোক মনে করে ঘিরে ধরলো। প্রত্যেকের নিজ নিজ এলাকার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। কাসেদরা জানালো, অবস্থা খুব খারাপ। মুসলমানরা তাদের গাদ্দারীর অপরাধে বসতিগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করতে বাকী। মোটকথা, তাদের মধ্যে ভালো ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে পূর্ব থেকে এ কাজের জন্য নিয়োজিত কমাণ্ডার হাদীদকে তারা খুঁজে বের করলো।

হাদীদ তাদের মিশনের উদ্দেশ্য শুনে বললো, তারা যেন ফিরে যায়। আর সিপাহসালার আবু উবাইদাকে এই সান্ত্বনার বানী পৌঁছে দেয় যে, তার এ পাঠানো মিশন আমরা অনেক আগেই কার্যকর করে ফেলেছি। এখন এ ত্রিশহাজার সৈন্য নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এখানে তারা বড় বিপদের মধ্যে আছে।

কাসেদরা চলে গেলো, আর হাদীদরা কবীলা সৈন্যদের ভীতির জলন্ত আগুনে আরো ঘি ঢাললো। যে গুজবই ওরা ছড়াতো, কোন যাচাই বাছাই না করে তাই তারা বিশ্বাস করতো।

কবীলাগুলো হেরাকলকে সৈন্য দিয়েছিলো আসলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তারা যখন শুনলো একদল মুজাহিদ তাদের এলাকায় হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন সরদারদের এক প্রতিনিধি দল হেরাকলের কাছে এসে বর্তমান সমস্যার কথা জানালো। কথায় কথায় জানিয়ে দিলো, তারা আর এখানে অপেক্ষা করতে পারবে না। হেরাকল অত্যন্ত দুরন্ধর লোক। প্রতিনিধিদলের সব কথা বড় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

'প্রিয় ভায়েরা আমার! – হেরাকল সব শুনে বললেন– সবার আগে আমি তোমাদের সন্তানসন্তুতি ও বাড়ি ঘরের নিরাপত্তা নিয়েই চিন্তাভাবনা করি। মুসলমানরা তোমাদের এলাকায় আসলেও তেমন কেয়ামত নিয়ে আসবে না। এখন আমি হিমসে হামলা আর বিলম্ব করবো না। মুসলমানদের কাছ থেকে আমরা হিমস নিয়ে যখন তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবো তখন দেখো তোমাদের এলাকায় যেসব মুসলমান হামলা করতে গিয়েছে তারা সব গুটিয়ে নিয়ে পালাবে। আমার সাথে থাকো। তারপর দেখো মুসলমানদের পরিণতি কী হয়।'

'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারবো না– 'প্রতিনিধি দলের এক সরদার বললো– হিমস বিজয় হতে হতে মুসলমানরা আমাদের বসতি সাফ করে দেবে। আপনি আমাদের ঐক্য ও কল্যাণ চাইলে প্রথমে আপনার ফৌজ আমাদের সঙ্গে আমাদের এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমরা মুসলমানদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তারপর হিমসের ওপর হামলা করবো।'

হেরাকল এত কাঁচা নন যে, ওদের কথা মেনে নেবেন। তিনি তো নিজের স্বার্থের জন্য ওদেরকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। আর কবীলা সরদাররাও চাচ্ছিলো, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হেরাকলের ফৌজি শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে। দু' পক্ষের টানাপোড়েনে আলোচনা কোন ফলাফল ছাড়াই শেষ হলো।

'আমার একটি কথা শুনে নাও– হেরাকল বিগড়ে যাওয়া কণ্ঠে বললেন– যেটাকে তোমরা নিজেদের এলাকা বলে দাবী করছো সেটা এখন আর তোমাদের এলাকা নয়। যারা এদেশ জয় করেছে এ এলাকা তাদের। প্রথমে তোমরা আমাদের অধীনস্ত ছিলে। এখন মুসলমানরা সে এলাকায় চেপে বসেছে। তাই তোমরা স্বাধীন নও। তোমাদের মধ্যে যদি আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহস থাকে তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। ওরা এ এলাকায় মাত্র এসেছে। কোন প্রশাসনই সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এ থেকে ফায়দা উঠাও তোমরা।'

সরদাররা সেখান থেকে চলে এলো। বযনতিয়া থেকে নিজেদের সেনা ছাউনিতে পৌঁছতে একদিন ও অর্ধেক রাত পার হয়ে গেলো। সেখানে পৌঁছেই ওরা জানতে পারলো তাদের অধিকাংশ সৈন্যই এখান থেকে চলে গেছে। এবং সবাই যার যার এলাকার দিকেই গিয়েছে। মেয়েদেরকেও অভিভাবকরা সঙ্গে নিয়ে গেছে। সরদাররা আর বিলম্ব করলো না। যার যার জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

✪ ✪ ✪

এক ভোরে আবু উবাইদা (রা) ফজর নামাযের জন্য ওযুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ সময় হাদীদ তার সঙ্গীদের নিয়ে হাজির হলো। আবু উবাইদা ওদেরকে দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন– না জানি দুশমন তাদের আসল পরিচয় জেনে গেছে।

'তোমরা ফিরে এলে কেন ?' – তিনি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'কারণ গোত্রভিত্তিক ত্রিশ হাজার সৈন্য চলে গেছে' – হাদীদ মুচকি হেসে বললো।

'কোথায়' ?

'যেখান থেকে এসেছিলো। প্রথমতঃ আমাদের গোপন প্রচারণার কারণে ওদের বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। তারপর যখন শুনলো, মুসলমানরা ওদের এলাকায় পৌঁছে গেছে তখন রণেভঙ্গ দেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলো না তাদের। এছাড়াও উত্তপ্ত আগুনে আমরা তো নিয়মিত ঘি ঢেলেই গিয়েছি।'

হাদীদ ও তার সঙ্গীরা বিস্তারিত শোনালো, কিভাবে তারা কবীলা সৈন্যদের বিভ্রান্ত করে ময়দান থেকে তাড়িয়েছে।

ফজরের নামাযের পর সমবেত হাজার হাজার মুজাহিদের উদ্দেশ্যে আবু উবাইদা (রা) বক্তৃতা দিলেন।

'আজকের স্নিগ্ধ সকাল আমাদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ নিয়ে উদিত হয়েছে। ত্রিশ হাজার খ্রিষ্ট ধর্মীয় গোত্রভিত্তিক সৈন্য রোমীয়দের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের এলাকায় চলে গেছে। এটা আল্লাহর গায়েবী সাহায্য। সূরা যুমারে ইরশাদ হয়েছে, যারা শয়তান থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হয় তাদের জন্য সুসংবাদ। মহান আল্লাহ তার রাসূল (স) কে বলেছেন, আপনি ঐ বান্দাদের সুসংবাদ দিন যারা আমার কথা মান্য করে....। আল্লাহর সেই বান্দা তোমরাই যাদেরকে আজ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। ঐ ত্রিশ হাজার সৈন্য আমাদের জন্য ভয়াবহ এক বিপদ নিয়ে একত্রিত হয়েছিলো। কিন্তু মনোবল ভাঙ্গা রোমীয়দের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছে। এরা তো আগ থেকেই তোমাদের ভয়ে কম্পিত। এখন ঐ ফৌজের এতটুকু মনোবলও নেই যে, ওরা তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে।'

'নারায়ে তাকবীর, বজ্রকণ্ঠে কেউ শ্লোগন তুললো। 'আল্লাহু আকবার' আকাশ বাতাস কাপিয়ে মুজাহিদরা সমস্বরে উত্তর দিলো।

'ইসলামের মুজাহিদরা ! – আবু উবাইদা (রা) আরো জোশপ্রবণ হয়ে উঠলেন– ইনশাআল্লাহ এ যুদ্ধই হবে শামের শেষ যুদ্ধ। শামের ওপর মুজাহিদের শেষ আঘাত। ইরাক যেভাবে যীশুখ্রীষ্টের পুজারী থেকে পবিত্র হয়ে গেছে শাম থেকেও রোমীরা চলে যাবে চির দিনের জন্য। আরেকটি কথা আমি পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমরা এ দেশ জয় করছি এখানে বাদশাহী করার জন্য নয়। বরং

আমরা চাই এখানে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে। এও মনে রেখো, দেশ জয় করাই আমাদের সর্বশেষ কাজ নয়, আসল কাজ তো এরপর শুরু হবে। তখন আসল কাজ হবে মানুষের হৃদয়-রাজ্য জয় করা.....

'তাদের ভেতর থেকে দাসত্বের হীনমন্যতা দূর করা। আর মহান আল্লাহ তার বান্দাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাদের জন্য তা নিশ্চিত করা। তবে এখনই নিজেদেরকে বিজয়ী ভাবতে শুরু করো না। কারণ দুশমন আমাদের ওপর এখনো সওয়ার হয়ে আছে। যে পর্যন্ত দুশমন নিজেদের রক্তে ডুবে না যাবে তাদের ঘোড়াগুলো ধুলোর রাজ্যে হারিয়ে না যাবে সে পর্যন্ত বিজয়ী ভাবা যাবে না। এতো এক মুজিযা যে, আমাদের দুশমন ত্রিশ হাজার সৈন্য থেকেই শুধু বঞ্চিত হয়নি আমীরুল মুমিনীনও সেনা সাহায্য নিয়ে আসছেন। আর কা'কা ইবনে আমর চার হাজার সওয়ার নিয়ে প্রায় এসে গেছে।'

✪ ✪ ✪

বয়নতিয়ায় এখন যেন মাতম চলছে। এ পর্যন্ত হেরাকলের প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য মারা গেছে। এর চেয়ে বেশি যখমী হয়েছে। আর যারা বেঁচে আছে তারা কয়েক লক্ষ হলেও নিজেদের সঙ্গীদের যেভাবে মুসলমানদের হাতে মরতে দেখেছে, ঘোড়ার পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হতে দেখেছে এসব দৃশ্য ওদেরকে মানসিকভাবে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে। হেরাকল সেটাই ভাবছিলেন, এ অবস্থায় তার যোগাড় করা ত্রিশ হাজার সৈন্য চলে যাওয়াটা যত বড় আঘাতই হোক না কেন এর চেয়ে বড় আঘাত দিয়েছে হেরাকলকে রোমী ফৌজের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মানসিক অবস্থার করুণ দশা।

এজন্য তিনি ছেলে কস্তন্তীনকে নিয়ে ফৌজি ছাউনিতে চলে এলেন। ফৌজ তো কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তাদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে হেরাকল অনলবর্ষী ভাষণ ঝাড়লেন, তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু তার এ বক্তৃতা তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করলো না। যেন অনুভূতিশূন্য হাজার হাজার বজ্রাহত মানুষ তার সামনে বসে আছে। হেরাকলকে দেখলেই এ ফৌজ শ্লোগানে শ্লোগানে চারদিক নাচিয়ে তুলতো। অথচ আজ যতই বক্তৃতার ভাষা জালাময়ী হচ্ছে এরা ততই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। দু' একটা লোক দেখানো শ্লোগানও উঠলো না।

কিন্তু হেরাকল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি মরিয়া হয়ে সর্বশেষ চালটা দিলেন।

'তোমরা রোমের সিংহ– হেরাকল শূন্যে হাত নাড়িয়ে বলতে লাগলেন– তোমরা রোমের ইযযত ও মুহাফিজ। এ দেশে তোমরা রাজত্ব করেছো। যারা বীর যোদ্ধা নিজেদের বাদশাহী তারা দুশমনকে সহজে দিয়ে দেয় না। তোমরা এ ময়দানে দাঁড়িয়ে গেলে এ শাম আবার তোমাদের হয়ে যাবে। আমি গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, ওরা কেল্লার বাইরে এসে লড়বে। আমার বিশ্বাস তোমরা এখন ওদেরকে পালাতে দেবে না। কচু কাটা করবে শুধু। আমি ঠিক করেছি, প্রত্যেককে খাটি সোনার একটি করে টুকরো দেয়া হবে। আর যে দারুণ বীরত্ব দেখিয়ে লড়বে তাকে তো পুরস্কারে পুরস্কারে ভরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যে পালাবে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। আর পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে এমন নজির সৃষ্ট করবো যে, তোমরা হয়রান হয়ে যাবে।'

এবার ফৌজের মধ্যে কিছুটা চঞ্চলতা দেখা গেলো। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। যেন ওরা হেরাকলের প্রশংসা করছে। হেরাকল এটা লক্ষ্য করে তার বক্তৃতা আরো জোশেলা করে তুললেন। তিনি বললেন, হিমস হলো সোনারূপার খাযানায় ভরা এক শহর। আর এমন মূল্যবান মালে গণীমত পাবে যে, মাথা ঘুরে যাবে। আর আছে অসংখ্য রূপবতী আর যৌবনবতী মেয়ে। প্রত্যেক সিপাহীকে একজন করে মেয়ে দেয়া হবে। আর মুসলমানদের সৈন্যও এত কম যে, ওরা একদিনও লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না।'

রোমী ফৌজ যেন নতুন জীবনের গন্ধ পেলো। তারা দ্বিগুণ তাজাদম হয়ে উঠলো।

হেরাকলের পেছনে দুই তিনজন জেনারেল দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে ইনথিনিউস নামে এক জেনারেল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ইউকেলিসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার পাশেই ইউকেলিস ঘোড়ায় বসে আছে। ইনথিউনিস জেনারেল হতে যা দরকার, সব শেখাবে ইউকেলিসকে। হেরাকলই তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন।

তবে এতে যে ইউকেলিসকে হত্যার ষড়যন্ত্র আছে ইনথিনিউসকে সেটা জানানো হয়নি। দু'জন অফিসারকে ঠিক করা হয়েছে। ওরা প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় সুযোগ বুঝে ইউকেলিসকে হত্যা করবে। তারপর ছড়িয়ে দেয়া হবে, ইউকেলিস লড়তে লড়তে মারা গেছে।

বক্তৃতা শেষ করে হেরাকল কস্তন্তীনকে নিয়ে ঘোড়ায় করে সেনা পরিদর্শনে বের হলেন।

'ইউকেলিসকে তো এখন বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া উচিত নয়– কস্তন্তীন পাশাপাশি চলতে চলতে বললো– তার অপরাধ যে কি ভয়াবহ তা কি আপনি এখনো অনুমান করতে পারেননি? ঐ ত্রিশ হাজার সৈন্য যে আমরা হারিয়েছি এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চালতো ছিলো ওরই।'

'আমি তো আমার ফয়সালা বদলাইনি– হেরাকল বললেন– আমি ওকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছি। তুমি এখন ভেবে দেখো, মুসলমানরা হামলা করে দিলে তুমি কিভাবে সৈন্যদের পরিচালিত করবে।'

কস্তন্তীন বাপকে নিশ্চয়তা দিলো, বড় নিপুণ হাতে সে সব পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনে প্রাণও দিয়ে দেবে।

কথা বলতে বলতে ওরা ইউকেলিস ও ইনথিনিউস পর্যন্ত চলে এলো। হেরাকল ইউকেলিসের পিঠ চাপড়িয়ে বড় আদুরে গলায় বললেন, এ লড়াইয়ের পর তুমি জেনারেল হবে।

লড়াইয়ের সুযোগ দেয়াতে ইউকেলিসও খুব আনন্দিত।

✪ ✪ ✪

আবু উবাইদার (রা) কাছে পয়গাম এলো, কা'কা ইবনে আমর তার চার হাজার ঘোড়সওয়ারসহ কয়েক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। কূফা থেকে হিমস দীর্ঘ পথ হওয়ায় পৌঁছতে এত দেরী হচ্ছে। কিন্তু আবু উবাইদা আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) এর পরামর্শে রোমীয়দের ওপর হামলার ফয়সালা করে ফেললেন। কারণ, হেরাকল এখন যে ত্রিশ হাজার সৈন্য হারানোর শোকে মুহ্যমান, এর ফায়দা উঠাতে হবে। এছাড়া রোমীয়দেরকে হিমস অবরোধ করার সুযোগ দিলে মুসলমানরা দীর্ঘ দিনেরর জন্য কেল্লাবন্দী হয়ে যেতে পারে।

সালাররা হিমসের পাহাড়ি ও বনানী এলাকা খুব একটা চিনতেন না। সিপাহসালার হাদীদকে ডেকে পাঠালেন। এ এলাকা হাদীদের নখদর্পণে। হাদীদ সবাইকে এলাকার অবস্থানগত মানচিত্র ভালো করে বুঝিয়ে দিলো।

সে দিনই মুজাহিদদের অভিযান শুরু করার হুকুম দেয়া হলো। হাদীদ তার দুই তিন সঙ্গীসহ অগ্রবর্তী বাহিনীর গাইড হিসেবে রইলো।

ওদিকে হেরাকল ও কস্তনীন তখনো এ দ্বিধাতেই ভুগছিলেন যে, ফৌজ এখানেই থাকবে না বয়নতিয়া নিয়ে কেল্লাবন্দী হয়ে নিজেদেরকে আরো গুছিয়ে নিবে।

আবু উবাইদা (রা) এর ইচ্ছে হলো, রোমীয়দের ওপর যথাসম্ভব আচমকা হামলা চালানো। এজন্য তিনি মুজাহিদদের এক দলকে অগ্রগামী দল হিসেবে আগে পাঠিয়ে দেন।

আর ডান দিক ও বাম দিক রেখে বাকী দু'দল মুজাহিদকে দূরবর্তী পথ ঘুরে লড়াই ক্ষেত্রে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যাতে রোমীরা মনে করে হামলাকারী দল এ অগ্রবর্তী বাহিনীই।

মুজাহিদরা ফজরের পর রওয়ানা হয় এবং দ্বিপ্রহরের সময় লড়াইয়ের ময়দানে পৌছে, যেখানে রোমী ফৌজ আগ থেকেই ছাউনি ফেলে রেখেছিলো।

আবু উবাইদা দেখলেন, দুশমন লড়াইয়ের বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে আছে। তিনি বুঝে নিলেন, মুজাহিদদের রওয়ানা হওয়ার খবর ওরা গুপ্তচর মাধ্যমে আগেই পেয়েছে। রোমীয়দের নেতৃত্বে দেখা গেলো কস্তন্তীনকে। মুসলমানদেরকে দেখে সে বড় জোশেলা আওয়াজে নিজের ফৌজকে উদ্বুদ্ধ করলো। দেখো, দুশমন সংখ্যায় কত কম। তোমরা ওদেরকে সহজেই মিশিয়ে দিতে পারবে।

অন্যান্য যুদ্ধের মতো প্রথমেই ব্যক্তিগত লড়াইয়ের মাধ্যমে এ যুদ্ধ শুরু হলো না। আবু উবাইদা (রা) এর হুকুমে মুসলমানরা প্রথমেই আল্লাহর তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দুশমনদের ওপর হামলা চালালো। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো তুমুল লড়াই।

রোমী জেনারেল ইনথিউনিস ইউকেলিসকে নিয়ে মূল দলের এক পার্শ্বে ছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে লড়াচ্ছিলেন এবং ইউকেলিসকেও যুদ্ধের সব ধরনের কলাকৌশল দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। ইউকেলিস তো সামনে গিয়ে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো। কিন্তু তিনি তাকে অরো শিখিয়ে পড়িয়ে লড়াইয়ে পাঠাতে চাচ্ছিলেন।

কস্তন্তীন তার ফৌজকে চমৎকার নিয়ন্ত্রণে রেখে লড়াচ্ছে। মুসলমানরা ভাবেনি, রোমীয়রা এই হতমনোবল নিয়ে এভাবে জমে লড়াই করে যাবে। আসলে মুজাহিদদের স্বল্প সংখ্যা দেখে ওদের মনোবল ও জযবা বেড়ে গিয়েছে।

এ তুমুল লড়াই ইউকেলিস ও ইনথিনিউস পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। ইনথিউনিস লড়াইয়ে নেমে পড়লেন এবং ইউকেলিস থেকে তার মনোযোগ হটে গেলো। এ

সুযোগে ইউকেলিস ঘোড়ার লাগাম তার মুখে চেপে এক হাতেই তলোয়ার দিয়ে লড়তে লাগলো। দারুণ নিপুণতা দেখিয়ে সে লড়াই করতে লাগলো।

ইনথিউনিস হঠাৎ আবিস্কার করলেন ইউকেলিস আশে পাশে নেই। তিনি পেরেশান হয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলেন। দেখলেন দুই মুসলমান ঘোড়সওয়ার তিন চার রোমীকে ধাওয়া করছে। তারা ইউকেলিসকে পাশ কাটিয়ে গেলো। ইউকেলিস তার ঘোড়ার রোখ দুই মুসলমানের পেছনে ঘুরিয়ে দিলেন। ইনথিউনিস তখনই তাকে থামাতে চাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন দুই রোমী সওয়ার ইউকেলিসকে অনুসরণ করে পেছন পেছন যাচ্ছে।

ইনথিউনিস আরেকটি দৃশ্য দেখে দারুণ বিস্মিত হলেন এবং ভেবে পেলেন না, কস্তন্তীন কেন এখানে। এখন তো তার থাকার কথা ফৌজের একেবারে পেছনে সেনাপতির আসনে। এর মধ্যে দেখলেন, এক রোমী সওয়ার তার তলোয়ার এমনভাবে উচিয়েছে যেন ইউকেলিসকে মারতে যাচ্ছে। তিনি একেবারে কাছে পৌছে গিয়েছিলেন। তিনি অতি ক্ষিপ্রতায় তার ঘোড়া রোমীর কাছে নিয়ে তার তলোয়ার রোমী সওয়ারের পিঠে এমনভাবে বসিয়ে দিলেন যেন বর্শা গেঁথে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় রোমী সওয়ার ইউকেলিসের ঘোড়ার আরেক পাশে একটু এগিয়ে ছিলো। সে তার ঘোড়া ইউকেলিসের ঘোড়ার বরাবরে রেখে তাকে থামাতে চেষ্টা করছিলো। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো সে ওকে মারতে চাচ্ছে। কিন্তু সে তখনো তার সঙ্গীর পরিণাম জানতে পারেনি।

ইনথিউনিস চলে এলেন ঐ রোমী সওয়ারের পেছন দিকে। ইউকেলিসের দিকে মনোযোগ থাকায় সে ইনথিউনিসকে দেখতে পায়নি। ইনথিউনিস তার ডান কাঁধে এত জোরে তলোয়ারের আঘাত হানলেন যে, তার ডান হাতটি তলোয়ারসহ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

ইনথিউনিস দেরী না করে ইউকেলিসকে সঙ্গে নিয়ে এক দিকে সরে পড়লেন। কস্তন্তীন এসব দেখেছে কি না সেটা পরওয়া করলেন না। কারণ, যুদ্ধের সময় নিজ দলের সৈন্যকে হত্যা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

কস্তন্তীন এ সবকিছুই দেখলো এবং চারু হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলো নিজের স্থানে।

'আমাদের দুই সৈন্যকে আপনি যে মারলেন ?' – ইউকেলিস হয়রান কণ্ঠে ইনথিউনিসকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি ওদেরকে দেখতে না পেলে তোমাকে ওরা মেরে ফেলতো। এখন আর আমার কাছ থেকে সরবে না, ইনথিউনিস বললেন।

'আচ্ছা! আসল ব্যাপারটা বলছেন না কেন? আমি তো আমার বাপ ভাইকে দেখাতে এসেছিলাম আমি দৈহিকভাবে অঙ্গহীন হলেও নিজ দায়িত্বে আমি অতি দক্ষ। আর এটা দেখার জন্যই শাহে হেরাকল আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন'।

'নারে বেটা! তোমার বাপ ভাই তোমাকে এখানে হত্যা করতে পাঠিয়েছে। আমি যাদেরকে মেরেছি ওরাই তোমাকে হত্যা করতো। একজনের তলোয়ার তোমার গর্দান প্রায় কেটে দিয়েছিলো। আরেকজন তো তোমার ঘোড়া থামিয়ে তোমাকে মারতে চেয়েছিলো। তুমি দেখনি, কস্তন্তীনও ওদের পাশে ছিলো। অথচ এমন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে তার থাকার কথা ছিলো অন্য জায়গায় সেনাপতির অবস্থানে। সে এদিকে আসতেই তোমার ওপর হামলা হলো। এরা দুজন মামুলি সিপাহী নয়, বরং সেনা কর্মকর্তা।'

'তাহলে আমি কী করবো? এখানে থাকবো না চলে যাবো?'

'আমার সঙ্গে থাকো। এখন তো আমাকেও এখান থেকে পালাতে হবে। আমি কমাণ্ডিং দুই সেনা অফিসারকে হত্যা করেছি। হত্যার কারণ কি এটা কেউ জানতে চাইবে না। আমার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ড।'

'তাহলে চলুন এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'এক কাজ করো, তুমি ঐ টিলাটির পেছনে চলে যাও। সেখান থেকে লুকিয়ে ছাপিয়ে বযনতিয়া পৌঁছে যাও। সোজা তোমার মার কাছে গিয়ে সব তাকে জানাবে।'

'আর আপনি?'

'এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি। তুমি যাও।'

✪ ✪ ✪

সেখান থেকে একজন ঘোড়সওয়ারের লাপাত্তা হওয়ার খবর কে রাখতে যাবে? যেখানে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছিলো। কিছু ঘোড়া তো সওয়ার ছাড়াই দিক বিদিক দৌড়াচ্ছিলো। আবার কিছু ঘোড়া তাদের যখমী সওয়ারদের মাটিতে ঘেষটাতে ঘেষটাতে পালাচ্ছিলো; মাটিতে পড়ে থাকা রোমী সিপাহীদের চিরা-চ্যাপটা করে।

তাদের অধিকাংশের রোখ ইন্তাকিয়ার ভূ-মধ্যসাগরের তীরের দিকে। যেখানে মিসরী জাহাজ রয়েছে। এ জাহাজে করেই হেরাকলের জন্য মিসর থেকে সেনা সাহায্য এসেছিলো।

হেরাকলের দেয়া প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ খাঁটি সোনার টুকরো, সুন্দরী নারী ও মোটা অংকের মালে গনীমতের লোভে রোমীরা কয়েক ঘণ্টা বেশ জমেই লড়াই করেছে। আবু উবাইদা তাদের দৃঢ়তা দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কে ইংগিত করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে একটি পাহাড়ের পেছনে লুকিয়েছিলেন। রোমীয়রা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মোটেও টের পায়নি।

ইংগিত পেয়েই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তার বাহিনীকে ডান ও বাম দিক দিয়ে পরিচালিত করে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে এলেন। পেছনে বিশাল ধুলিঝড় উড়িয়ে যখন দুই দিক থেকে এরা রোমীয়দের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো রোমীয়দের মনে হলো তাদের ওপর বিশাল এক পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে। অল্প সময়ের মধ্যে রোমীয়রা ময়দান খালি করে দিলো অসংখ্য লাশ ও হাজার হাজার যখমীদের রেখে। যারা পালাতে পারলো তাদের সবার রোখ ছিলো ইন্তাকিয়ার সমুদ্র বন্দর।

বিস্ময়ের কথা হলো, কস্তুন্তীনও বয়নতিয়া না গিয়ে ইন্তাকিয়ার দিকে পালিয়ে গেলো।

বয়নতিয়ায় রোমীয়দের পরাজয়ের খবর তখনই পৌছে গেলো। খবর পেয়ে হেরাকল প্রথমেই তার বিশাল মুহাফিজ বাহিনীসহ তার শাহী খান্দানকে বয়নতিয়া খালি করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য এতগুলো মানুষ নিয়ে একদিনেই বয়নতিয়া খালি করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার বেশ কয়েক দিন।

ওদিকে ইউকেলিস বেশ গোপনে রাতের বেলা বয়নতিয়া পৌছে। সে তার মাকে ময়দানের পুরো ঘটনা শোনায়। শুনে ইউকেলিসের মা লিজার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে যায়। চরম আক্রোশে তার ওপরের দাঁত নিচের দাঁতকে পিষতে থাকে।

'জালিম জল্লাদ!– লিজা দাতে দাঁত পিষে বিড় বিড় করে বললো– আমি ওকে বিষ পান করাতে এসেছিলাম কিন্তু আমি ওর প্রেমের জালে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম যে, ওকে স্পষ্ট বলে দিলাম, পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে আমি তাকে হত্যা করতে এসেছিলাম। তার প্রেমে অন্ধ হয়ে তার বিয়ের পিড়িতে

বসতে বাধ্য হই আমি। আর আজ সে আমার ছেলেকে হত্যা করাতে চেয়েছিলো। বিয়ের কিছু দিন পরই ওর ওপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে যায়। কিন্তু আমি ওর হাতে প্রায় বন্দী ছিলাম।'

লিজা কথাগুলো এমনভাবে বললো যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে। অবুঝ চোখে ইউকেলিস তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

পর দিন ইনথিউনিসও হেরাকলের অগোচরে বযনতিয়া পৌঁছে গেলেন। এসেই নিজের গোপন এক ঠিকানায় গিয়ে বিশ্বস্ত এক নওকর দিয়ে লিজাকে খবর পাঠালেন। লিজা তো তার অপেক্ষাতেই ব্যাকুল ছিলো। খবর পেয়ে ছুটে এলো।

'এসো লিজা! – ইনথিউনিস বললেন– তোমার ছেলেকে কি সুস্থাবস্থায় পেয়েছো?

'হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু এসব হলো কী করে? আমি তো কিছুই জানতাম না'– লিজা বললো।

ইনথিউনিস বললেন, তিনি এটা জানানোর জন্যই লিজাকে ডাকিয়েছেন। তিনি জানালেন, হেরাকলের কাছে সব সময় এক ষোড়ষী কানিয থাকে। অসম্ভ সুন্দরী সে। হেরাকল আর কস্তন্তীন যেদিন ইউকেলিস ও তোমাকে ধোকা দিয়ে ইউকেলিসকে মারার ষড়যন্ত্র করেন সেদিন ঐ কানিয হেরাকলকে মদ পান করাচ্ছিলো। সে সব শুনে ফেলে।

এ মেয়ের বাবার সঙ্গে ইনথিউনিসের বন্ধুত্ব ছিলো। অল্প বয়সে তার বাবা মারা যায় মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে। তখন মেয়েকে বিধবা মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হেরাকলকে উপহার দেয়া হয়। এই মেয়ের মা ইনথিউনিসের কাছে সবসময় ফরিয়াদ করে তার মেয়েকে যেন হেরাকলের দোযখ থেকে উদ্ধার করে দেয়। আর মেয়েও হেরাকলের খাছ কানিয হওয়াতে হেরাকলের খাস কামরায় গোপন কিছু ঘটলেই ইনথিউনিসকে খুশী করার জন্য তাকে জানিয়ে দেয়। এভাবে এ কানিয ইউকেলিসকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাও ইনথিউনিসকে জানিয়ে দেয়।

ইনথিউনিস এই কাহিনী এবং ময়দানে ইউকেলিসকে হত্যার ঘটনার পুরো বিবরণ লিজাকে জানালেন।

'তুমি আগে কেন জানালে না আমাকে?' – লিজা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি জানাই নি এজন্য যে, তুমি হেরাকলের কাছে তখন ছুটে গিয়ে হাঙ্গামা বাধাতে। তখন হেরাকল তাকে অন্যকোনভাবে হত্যা করতো। তাই আমি

ইউকেলিসকে বাঁচাতে দৃঢ় অঙ্গীকার করি। জানো কেন ?' – ইনথিউনিস বললেন।

'হ্যাঁ জানি– লিজা বললো– ইউকেলিস আসলে যে তোমার ছেলে। সে তো হেরাকলের ছেলে নয়। আমি অন্যান্য যেসব সন্তান জন্ম দিয়েছি ওরাই শুধু হেরাকলের।'

বিয়ের কিছুদিন পর যখন লিজার ওপর থেকে হেরাকলের মনোযোগ সরে যায় তখন ইনথিউনিসের সঙ্গে লিজা সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইনথিউনিস তখনো জেনারেল হননি। হেরাকলের শাহী মুহাফিজের সুদর্শন এক যুবক কমান্ডার তখন ইনথিউনিস। সেই সম্পর্ক গোপন প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আর এ প্রেমের ফসল হলো ইউকেলিস। কিন্তু হেরাকলসহ সবাই জানে সে শাহে হেরাকলের ছেলে।

'বাদশাহদের অন্দরমহলে এ ধরনের ঘটনা সবসময়ই ঘটে থাকে।– ইনথিউনিস বললেন– আমি যদি খবর পেতাম হেরাকল কন্তন্তীন বা অন্য কোন সন্তানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে তাহলে কিছুই বলতাম না। মুখ টিপে থাকতাম। কিন্তু ইউকেলিস .... এ আমার রক্তের ধারা...'

'কন্তন্তীন নিশ্চয়ই হেরাকলকে বলে দিয়েছে, তুমি তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছো। হেরাকল কি তোমাকে ক্ষমা করবে ?'

'আমি এখন লুকিয়ে থাকবো। যেদিন আমি ধরা পড়বো সেদিন হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'এখন এখানেই লুকিয়ে থাকো। কোথাও পালাতে চাইলে আমাকে ও ইউকেলিসকে সঙ্গে নিয়েই পালাবে।'

'আগে হেরাকল ও কন্তন্তীনকে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ হজম করতে দাও। তারপর ভেবে বের করবো কি করতে হবে আমাকে।'

ও দিকে পালিয়ে যাওয়া রোমীয় সৈন্যরা ইন্তাকিয়ার বন্দরে অপেক্ষারত জাহাজে পৌঁছতেই জাহাজ ওদেরকে নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়ে গেলো।

এদিকে হেরাকলের শামের পরাজয় চূড়ান্ত হয়ে গেলেও খ্রিষ্টান গোত্ররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটালো।

✪ ✪ ✪

আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) হিমস থেকে বেশ দূরের এক স্থান জাবিয়া নামক স্থানে ছাউনি ফেললেন। একটু পরেই আবু উবাইদা (রা) এর পয়গামের

মাধ্যমে জানতে পারলেন, হিমসের বিজয় সম্পন হয়ে গেছে। লড়াইয়ের পূর্ণ বিবরণ সে পয়গামে ছিলো। তিনি জাবিয়া থেকেই মদিনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শামের মতো তখন ইরাকের বিজয়ও মুজাহিদরা সম্পন্ন করে ফেলে। এসব বিজিত এলাকাগুলো থেকে অনেক বিষয়ে দিক নির্দেশনা চেয়ে যে পয়গাম তার কাছে এসে জমা হয়েছে তার জবাব এক বসায় দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য স্থির হওয়াও দরকার। এজন্য তিনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার ফয়সালা করলেন।

উমর (রা) জাবিয়া থেকে মদীনা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ সময় সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর কাছ থেকে এ মর্মে আরেকটি পয়গাম এলো যে, হিমস বিজয় শেষ হওয়ার পর পরই কা'কা ইবনে আমর চার হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে হিমসে পৌঁছেছেন। তারা এ লড়াইয়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। এখন কি কা'কা ইবনে আমর ও তার সালারদের মালে গণীমতের অংশ দেয়া হবে ?

আমীরুল মুমিনীন জবাবী পয়গামে যে হুকুম দিলেন ইতিহাসের পাতায় আজো তা সোনালী অক্ষরে লেখা আছে। তিনি লিখলেন, আহলে কূফা (অর্থাৎ কা'কা ইবনে আমর কূফা থেকে এসেছিলেন।) বা কূফার মুজাহিদদেরকে ততটুকু মালে গনীমতের অংশই দেয়া হবে যতটুকু দেয়া হবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের। কা'কা ও তার সঙ্গী মুজাহিদরা এ কারণে মালে গনীমতের হকদার হয় যে, তাদের আসার খবরে রোমীয়রা নিশ্চয় ভীত হয়ে পড়ে। এ কারণে তাদের পরাজয় তরান্বিত হয়। আল্লাহ তাআলা কূফার মুজাহিদদের রহম করুন, যারা নিজেদের বিজিত এলাকাও হেফাজত করে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাহায্যের জন্যও পৌঁছে যায়।

✪ ✪ ✪

হেরাকল নিরাপদেই বযনতিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার রুখ ছিলো নিজের মূল ভূখণ্ড রোমের দিকে। ওদিকে কস্তন্তীন প্রথমে ইন্তাকিয়ার সমুদ্র বন্দরে রুখ করলেও পরে তার বাবা হেরাকলের সঙ্গে রোমের সীমান্তবর্তী এক এলাকায় গিয়ে যোগ দেয়।

'শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! – কস্তন্তীন অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললো– আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত, আপনার প্রত্যাশা সম্পূর্ণ করতে পারিনি। কিন্তু এ পরাজয়ের

দায়িত্ব আমার ওপর আরোপ করার আগে আমি জানাতে চাই, আসলে কে এজন্য দায়ী।'

হেরাকল কিছু বললেন না। নিস্পৃহ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'যদি ঐ ত্রিশ হাজার গোত্রভিত্তিক সৈন্য আমাদের সঙ্গে থাকতো আজ আমরা এভাবে পিছু হটতাম না– কস্তন্তীন বললো– তদেরকে ইউকেলিসই ভাগিয়েছে। কিন্তু লড়াইয়ের সময় আরেক ভয়ংকর গাদ্দারের উদয় হয়েছে। সে হলো আমাদের এক জেনারেল ইনথিউনিস। সে আমার চোখের সামনে দুই অভিজ্ঞ সেনা কমান্ডারকে হত্যা করেছে।

হেরাকল এমনভাবে চমকে উঠলেন যেন সদ্য কোন আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গেছে।

'ঐ জেনারেল সেই দুই কমান্ডারকে হত্যা করেছে ইউকেলিসকে হত্যার জন্য যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছিলাম– কস্তন্তীন এবার উৎসাহ পেলো বলতে– ইনথিউনিস কিভাবে সেই দুই কমান্ডারকে হত্যা করেছে এবং ইউকেলিসকে বাঁচিয়েছে তার কাহিনী হেরাকলকে জানিয়ে বললো– 'ইনথিউনিস তো জানতোই না আমরা ইউকেলিসকে হত্যা করছি। তাহলে সে কেন ঐ দুই কমান্ডারকে হত্যা করলো ? ..... শুধু এজন্য যে, সে আমাদের ফৌজকে দূর্বল করে তুলছিলো। লড়াইরত অবস্থায় আমি পরিস্থিতি অনুযায়ি ইনথিউনিসের কাছে কাসেদ পাঠিয়েছি যে, তোমার বাহিনীকে ডান পার্শ্বে নিয়ে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করো। কিন্তু কাসেদ তাকে খুঁজতে খুঁজতে ফিরে আসে। ইনথিউনিস ইউকেলিস কাউকেই পায়নি সে ...: এটা কি খোলাখুলি গাদ্দারী নয় ?'

'ওরা এখন আছে কোথায় ?' – হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এটাও যাচাই করে এসেছি। ওদেরকে বযনতিয়া যেতে দেখা গেছে।'

শামের চূড়ান্ত পরাজয় তো এমনিই হেরাকলকে অর্ধ পাগল বানিয়ে ফেলেছে। তিনি তার মুহাফিজ বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে গড়গড়ে আওয়াজে হুকুম করলেন, এখনই বযনতিয়া গিয়ে জেনারেল ইনথিউনিসকে শিকলে বেধে এখানে নিয়ে এসো।

মুহাফিজ কমান্ডার আট দশজন মুহাফিজ নিয়ে গভীর রাতে বযনতিয়া পৌছে। অন্য সময় হলে বযনতিয়া দুর্গের প্রধান ফটক এত রাতে বন্ধ থাকতো। কিন্তু এখন প্রধান ফটক হা করে খোলা। বুরুজের ওপর কোন বাতি নেই। কবরস্থানের মতো নিস্তব্ধ– নিকষ অন্ধকার।

মুহাফিজরা মশাল জ্বালিয়ে প্রথমেই ইনথিউনিসের বাড়ি খুঁজে বের করলো এবং হামলা চালালো। কিন্তু বাড়ির ভেতর একটি চামচিকাও পেলো না। এখনো কিছু লোক শহরে রয়ে গেছে। কমান্ডার কয়েকটি ঘরের দরজায় করাঘাত করে লোকদেরকে জাগালো এবং ইউকেলিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তারা জানালো, ইনথিউনিসের স্ত্রীকে তার ছেলে মেয়ে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু ইনথিউনিসকে কোথাও দেখা যায়নি।

ইনথিউনিসের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে হেরাকল তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। হুকুম জারী করলেন, যেখানেই ইনথিউনিসকে পাওয়া যাবে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসবে।

আর দ্বিতীয় গাদ্দার ইউকেলিসের ব্যাপারে হুকুম কি ?' – কস্তন্তীন হেরাকলকে উস্কে দিলো।

'এখন আমি ওকে ক্ষমা করতে পারবো না। এখন ওর পাট চুকাতে হবেই। ওর মা ঝামেলা করলে তাকেও আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দেবো। পুরো শাম আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। এখন তো নিজেকেও আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত নই'– হেরাকল বললেন।

'না কি সে লড়াইতেই মরে গেছে ?' – হেরাকল একটু ভেবে বললেন।

'সে তো লড়েইনি– কস্তন্তীন বললো– আমি খবর নিয়েছি। অনেক আগেই সে ময়দান থেকে চলে গেছে।'

শেষ পর্যন্ত হেরাকল হুকুম জারী করলেন, ইউকেলিসকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। কস্তন্তীন তার বিশ্বস্ত দুই কমান্ডারকে এজন্য নিযুক্ত করে দিলো।

✪ ✪ ✪

অসংখ্য লাশ আর মারাত্মক যখমীদের ফেলে রেখে রোমীয়রা পালিয়েছে অনেক আগেই। মুজাহিদরা এখন মালে গণীমত একত্রিত করছে। হাতিয়ারসহ আরো অনেক কিছু সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর সামনে স্তুপিকৃত করে রাখা হচ্ছে।

ওদিকে যখমী মুজাহিদদেরকে মুজাহিদদের স্ত্রী বোনরা সযত্নে উঠিয়ে এনে শুশ্রূষায় ব্যস্ত। শারীনাও নিবিষ্ট মনে আহতদের সেবা করে যাচ্ছে। এক লোক তাকে এসে জানালো, রোতাস নামে যে এক রোমী অফিসার নজর বন্দী হয়ে আছে সে তাকে ডাকছে।

সিপাহসালার ওয়াদা করেছিলেন, রোমী ফৌজকে পরাজিত করতে পারলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। শারীনা তো রোতাসের কথা ভুলেই গিয়েছিলো। এখন তার নাম শুনে সেই ওয়াদার কথা মনে পড়ে গেলো। শারীনা তখনই রোতাসের ওখানে চলে গেলো।

'মনে হচ্ছে সিপাহসালার তার ওয়াদা ভুলে গেছেন– রোতাস শারীনাকে বললো– আমাকে মুক্তির ওয়াদার কথা কি ওনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে না?'

'ময়দান থেকে সিপাহসালার খানিক আগে এখানে এসেছেন– শারীনা 'বললো– এখনই আমি উনার কাছে গিয়ে তোমার কথা বলছি।'

রোতাসের কাছ থেকে রোমী ফৌজের গোপন তথ্য উদ্ধারের জন্য শারীনা এত দিন বলে এসেছে, সে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে ঠিক, কিন্তু সে তার স্বামী হাদীদকে নিয়ে হেরাকলের কাছে চলে যাবে। এখন রোতাস এসব কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো, সে কি তার সঙ্গে যাবে না অন্য কোন ইচ্ছা আছে ?

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না– শারীনা বললো– এখন অবস্থা একেবারেই পাল্টে গেছে। না জানি শাহে হেরাকল এখন কোথায় রয়েছেন। আর তার ফৌজের তো অস্তিত্বই নেই। এখন তোমাকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। তারপর সুযোগ হলে আমাদের সাক্ষাত হবে।'

শারীনা আবু উবাইদা (রা) এর কাছে গিয়ে রোতাসের কথা বলতেই তিনি রোতাসকে ডেকে পাঠালেন। রোতাস আসলে আবু উবাইদা শারীনাকে দোভাষী বানিয়ে বললেন–

'বেটি শারীনা! ওকে বলো জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তারপর আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আমাদের বিজয়ে সে দারুণ সহযোগিতা করেছে। আমার পক্ষ থেকে রোতাসকে কৃতজ্ঞতা জানাও। সেও আমাদের বিজয়ে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। আমি ওকে কোন উপহার দিয়ে বিদায় করতে চাই।'

একথা বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন। শারীনা তাকে সব কথা অনুবাদ করে জানালো। রোতাস বলতে লাগলো, তার এ উপহারই অনেক মূল্যবান যে, তাকে সসম্মানে বিদায় দেয়া হচ্ছে। এর চেয়ে অতিরিক্ত আর কোন উপহার চাই না।

এ সময় আবু উবাইদা (রা) কামরায় আবার ফিরে এলেন। তার হাতে ছিলো ছয় ইঞ্চি লম্বা একটি ক্রুশ ক্রেষ্ট। ক্রেষ্টটি আগর কাঠের। কিন্তু এর ওপরে

বসানো হযরত ঈসা (আ) এর কল্পিত মূর্তিটি খাঁটি স্বর্ণের। আবু উবাইদা (রা) বললেন, 'ও যেহেতু খ্রিষ্টান এজন্য ওর ধর্মমতেই ওকে উপহার দিচ্ছি। এটি এক নিহত রোমী ফৌজি অফিসারের কাছে ছিলো। মালে গণীমত হিসেবে আমি এটি পেয়েছি। ওকে বলো, সিপাহসালারের এতটুকু অধিকার নেই যে, তিনি মালে গণীমত থেকে একটি সুতোও নিজের ইচ্ছায় নিতে পারেন এবং কাউকে দিতেও পারেন। কিন্তু এ লোক আমাদেরকে যে সাহায্য করেছে এর বিনিময়ে আমীরুল মুমিনীন ও আমাদের সব মুজাহিদের পক্ষ থেকে এটি আমি তাকে দিচ্ছি।'

আবু উবাইদা (রা) তাকে ক্রুশ ক্রেষ্টটি দিলেন এবং এক দায়িত্বশীল মুজাহিদকে হুকুম দিলেন, ওর যে ঘোড়া পছন্দ হয় আস্তাবল থেকে সেটি তাকে দিয়ে দাও এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে একটু দূর পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে এসো। যাতে সেখানে প্রহরারত কোন মুজাহিদ তাকে আবার পাকড়াও না করে।

'আমার পক্ষ থেকে সিপাহসালারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো শারীনা! - রোতাস বললো অভিভূত কণ্ঠে- এই প্রথম আজ আমি অনুভব করছি, মুসলমানদের স্বভাব-কৌলিন্য কত উঁচুতে এবং কত প্রশংসনীয়। এখন আমি বুঝতে পারছি ইসলাম কেন এত দ্রুত বিশ্ব জয় করে নিচ্ছে। উনাকে বলো, আমি এ যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে যাবো একদিন। শাম দেশের পথও ভুলে যাবো। কিন্তু সিপাহসালারের উদার ব্যবহারের কথা কখনো ভুলবো না।'

রোতাস সিপাহসালার আবু উবাইদার সঙ্গে হাত মেলালো এবং এক কদম পিছু হটে রোমীয় কায়দায় স্যালুট করলো।

হিমস থেকে একটু দূরে বিস্তৃত ময়দান দিয়ে যাওয়ার সময় তার চোখে পড়তে লাগলো রোমীয় ফৌজের অংসখ্য লাশের ভৌতিক দৃশ্য। তার ভেতর কেমন অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো। তার মনে হলো সে বুঝি এখনই পাগল হয়ে যাবে। এতক্ষণ সে সতর্ক হয়ে ঘোড়া চালাচ্ছিলো। যাতে কোন লাশের গায়ে ঘোড়ার পা না পড়ে। কিন্তু ক্রমেই সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে লাগলো। এখান থেকে সে এখন ছুটে পালাতে চায়। তাকে এগিয়ে দিতে আসা মুজাহিদকে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে যেতে বললো। তারপর প্রাণপণে ঘোড়া ছুটালো। কোন লাশের গা মাড়িয়ে যাচ্ছে, না লাশের শরীর বাঁচিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আর সে লক্ষ্য করলো না।

রোতাসের রুখ বযনতিয়ার দিকে। তার ভাবনা এলো, সে বযনতিয়া যাচ্ছে ঠিক। কিন্তু হেরাকল যখন তার কাছ থেকে শুনবে সে এত দিন মুসলমানদের

হাতে বন্দী ছিলো, তখন হেরাকল কেন কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কারণ, এ কয়দিন মুসলমানদের ওখানে বন্দী থেকে তার স্বাস্থ্য এত সুন্দর হয়ে উঠেছে যে, কেউ মানবেই না সে বন্দী ছিলো। বন্দীর সঙ্গে কেউ এমন ভালো ব্যবহার করতে পারে এটা কেউ কল্পনাও করবে না কোন দিন। তার আরেকটি পেরেশানী হলো, সে শারীনার ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। হেরাকলের মতো জল্লাদ প্রকৃতির বাদশাহ তাকে কখনো ক্ষমা করবে না।

চরম দ্বিধান্বিত অবস্থায় সে তার পকেট থেকে খ্রিষ্টের মূর্তিটি বের করলো। সন্ধ্যা তখনো গাঢ় হয়নি। আবছা আলোতে খ্রিষ্টের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললো,

'হে মাসীহ্ ঈসা! কোথায় যাবো বলে দিন। আমাকে সে পথে নিয়ে যান যেখানে আমার কল্যাণ আছে ও যে পথ আমার মনো- শান্তির গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।'

রোতাস ছিলো হেরাকলের গোয়েন্দা বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার। তাই শামের বিভিন্ন এলাকার লোকজনের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তার ঘোড়ার রুখ সেদিকে হয়ে গেলো যেদিকে খ্রিষ্টান গোত্রগুলোর বসতি রয়েছে। আপাতত একটা আশ্রয় হওয়ার পর ভেবে বের করা যাবে ভবিষ্যত করণীয় কি।

✪ ✪ ✪

ইনথিউনিস, ইউকেলিস, লিজা। তিনজনে তিনটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চতুর্থ আরেকটি ঘোড়ায় নিজেদের মালপত্র বহন করে ওরা চলছে। ওরা এখন অনেক দূর চলে এসেছে। পিছু ধাওয়ার কোন ভয় নেই। রাত নামার পরও তাদের চলা অব্যাহত রাখলো। চাঁদ যখন মাথার ওপর জ্যোৎস্নার চাদর বিছিয়ে দিলো। সবুজ টিলায় ঘেরা চমৎকার একটি জায়গা বেছে নিলো ওরা রাতটা কাটানোর জন্য।

'আমরা তো প্রাণে বেঁচে গেছি- লিজা খাওয়া দাওয়ার পর বললো- এখন তো কোথাও আমাদের গা ঢাকা দেয়া দরকার। তুমি তো জানো ইনথিউনিস! আমি কিসরার শাহী খান্দানের শাহজাদী ছিলাম। হেরাকলের কাছে এসেছিলাম অন্য কোন উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঘটলো এর বিপরীত ঘটনা। এখন তো আমি ইরানের শাহী খান্দানের কাছেও অনেক বড় আসামী। তাই ওখানেও যেতে পারবো না। সাধারণ মানুষের জীবনই এখন আমাকে যাপন করতে হবে।'

'আমাকে কেন আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এলেন ? – ইউকেলিসের গলায় অস্থিরতা– আমি তো কস্তন্তীনকে কতল করতে চেয়েছিলাম। আমি হয়তো আমার বাবা হেরাকলকেও কতল করে দিতাম। আমাকে এখান থেকে ফিরে যেতে দিন। ওরা আমাকে কাপুরুষের মতো কতল করতে চেয়েছিলো। আমি ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করে কতল করবো।'

'এখন আর এর প্রয়োজন নেই– ইনথিউনিস বললেন– এখন আরেক বাদশাহী দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ ঘটবে। রোম ও পারস্যের বাদশাহী খতম হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এখন আরেক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে। সে না হবে ইরানের না হবে রোমের। বরং তা হবে মহাখ্রিষ্টের। যা সারা দুনিয়া জয় করবে। হেরাকলের কাছে আছে শুধু মিসর আর রোম। তাকে আমি মিসর থেকে বের করে রোমে নিয়ে কোনঠাসা করবো।'

'ইনথিউনিস! – লিজা বললো– তুমি অনেক ক্লান্ত, হেরাকল তোমাকে হত্যা করবে এ ভয় তোমার ওপর চেপে বসেছে। শুয়ে পড়ো। মাথা ঠিক হয়ে যাবে। তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছো।'

'না লিজা! – ইনথিউনিসের গলায় কঠিন সংকল্প– আমি ক্লান্তও নই ভীতও নই। এত জাগ্রত আমি আর কখনো থাকিনি। স্বপ্ন নয়, গোত্রীয় যোদ্ধারা আমার ফৌজ হবে। তুমি দেখোনি হেরাকলের কাছে এরা কি করে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলো ? হেরাকল ওদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে অনায়াসে ওরা আরো ত্রিশ হাজার সৈন্য দিতে পারতো। কিন্তু হেরাকল সে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারেনি। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে বদ্ধপরিকর। মুসলমানদের সামনে পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য এরা ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি ওদের বিশ্বস্ততা অর্জন করে নেবো।'

'কিন্তু এখন আমাদের গন্তব্য কোথায় ?'

'এটা জিজ্ঞেস করার কথা হলো? এ দেশের ওপর আমাদের শাসন ছিলো। সারা দেশ আমি ঘুরে ফিরে আসছি। সীমান্ত দ্বীপ এলাকায় তো আমি অনেক দিন থেকেছি। অনেক সরদারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও আছে। ওদের মধ্যে কোন কোন গোত্র অধিক শক্তিশালী তাও আমি জানি। ওদের কাছেই যাচ্ছি আমি। আমার পুর্ণ বিশ্বাস এরা আমাকে হতাশ করবে না। বরং এক অভিজ্ঞ জেনারেল পেয়ে ওরা আরো খুশী হবে। আমি ওদেরকে এক সুসংগঠিত সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত করবো।'

এসব গোত্রের মধ্যে বনী রবীআ ধন ও লোক বলে সম্মানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বনু আয়াদ নামে আরেকটি গোত্র আছে। এরাও অসম্ভব শক্তিশালী। এ গোত্রে কিছু দূরদর্শী বিচক্ষণ সরদার আছে। যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ গোত্রীয় মৈত্রি মিলে আরেক গোপন শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং বিপদজনকভাবে মাথা তুলে দাড়াচ্ছিলো। মুসলমানদের অতি তৎপর গোয়েন্দাবাহিনীর কাছেও তাদের কোন তথ্য জানা ছিলো না।

'ইনথিউনিস। তুমি জেনারেল বলে নিঃসন্দেহে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো- লিজা বললো- তবে মোটা কিছু কিছু বিষয় আমিও জানি। যে মুসলমানদের মোকাবেলা এত শক্তিশালী ফৌজও করতে পারলো না, এই অশিক্ষিত গোত্র যোদ্ধারা কি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে জিতবে ? এরা বেশি হলে বিদ্রোহ করতে পারে।'

'লিজা! আমি জেনারেল! – ইনথিউনিস বললো– আমি ফৌজের গুণ-ত্রুটি ভালো করে চিনি। মুসলমানরা শাম জয় করেছে ঠিক কিন্তু ওরা এতই ক্লান্ত যে, এখান থেকে ওরা আগে বাড়লেই ওদের দম ফুরিয়ে যাবে। ওদের বিরুদ্ধে গোত্র যোদ্ধারা অনেক তাজাদম। এখনো ওরা কোথাও লড়েনি। ওদের মধ্যে সুসংগঠিত হয়ে লড়ার সব রকম যোগ্যতা আছে। ওদের প্রয়োজন শুধু একজন জেনারেলের। অমি সেই প্রয়োজনই পূরণ করবো।'

✪ ✪ ✪

জেনারেল ইনথিউনিসের কথা মতো মুসলমানরা দৈহিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত একথা ঠিক। তবে মানসিকভাবে তারা এখন আরো তরতাজা এবং সজীব প্রাণ। তারা শুধু মালে গণীমতের পেছনে পড়ে নেই এখন।

পুরো শাম জয় করলেও ছোট বড় অনেক কেল্লা- বসতি এমন রয়ে গেছে যেখানে মুজাহিদদের সংখ্যা খুবই কম। এদিকে হিমসেও অনেক মুজাহিদ চলে এসেছিলো বিভিন্ন এলাকা থেকে। সেসব এলাকতেও মুহাফিজ মুজাহিদ কমে গিয়েছিলো। এখন এসব ছোট বড় দুর্গ ও অন্যান্য অনেক এলাকা থেকে খবর আসছে, স্থানীয় খ্রিষ্টান যোদ্ধারা সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে। তারা মুসলমানদের আনুগত্যে রাজী নয়। বিদ্রোহ দমনে মুজাহিদরা সেসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো।

কেল্লাবেষ্টিত শহর রোক্কা থেকে প্রথম বিদ্রোহের খবর আসে। খ্রিষ্টান যোদ্ধারা সেখানকার মুহাফিজ মুজাহিদদেরকে এক সঙ্গে বন্দী করে ফেলে একটি কামরায়।

সে এলাকার দায়িত্বে ছিলেন সালার সুহাইল ইবনে আদী। খবর পেতেই তিনি তার লশকর নিয়ে রোক্কার দিকে রওয়ানা করলেন।

রোক্কা পৌঁছে দেখলেন, কেল্লার সব দরজা বন্ধ। কেল্লার প্রাচীরে খ্রিষ্টান যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ব্যঙ্গ করছে। তাদের হাতে তীর বর্শা শোভা পাচ্ছে। সালার সুহাইল ঘোষণা করলেন, অস্ত্র ফেলে কেল্লার দরজা খুলে দাও। না হয় লড়াই করে যদি কেল্লা নিতে হয় সবগুলোকে গোলাম বানিয়ে আরবে পাঠিয়ে দেবো। আর যদি আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নাও আমরা তোমাদের জানমালের হেফাজতের যিম্মাদার হয়ে যাবো।'

'সাহস থাকলে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেখো।'

'রোমীয়রা এজন্য পালিয়েছে যে, এ এলাকা তাদের নয়, আমাদের।'

'আর তোমাদের নয় এ দেশ। তোমাদেরকেও আমরা ভাগিয়ে দেবো।'

মুসলমানদের ঘোষণার জবাব তারা এভাবেই দিলো আর হো হো করে হাসতে লাগলো। কেল্লার তিন চারটি শক্তিশালী গোত্র যোদ্ধা একত্রিত হওয়াতে ওদের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছে।

সালার সুহাইল ইবনে আদীর হুকুমে মুজাহিদরা তিরান্দাযী শুরু করলো। কিন্তু কেল্লার প্রাচীরের ওপর থেকে যখন তীর বৃষ্টি শুরু হলো তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল হলো। তীরের সঙ্গে বর্শাও আসতে লাগলো।

'এরা বেশ বোকা আর আনাড়ী– সালার সুহাইল মুজাহিদদের বললেন– অযথা বর্শা নষ্ট করছে কেন ? অক্ষত বর্শাগুলো উঠিয়ে নাও। এটা আমাদের কাজে আসবে।'

সালার সুহাইল কয়েকজন জানবাযকে এবার নিযুক্ত করলেন দরজা ভাঙ্গার জন্য। তারা কুড়াল এবং বড় বড় চোখা পাথর নিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো। কিন্তু প্রাচীরের ওপরের তীরান্দাযরা তাদের তীরের রুখ জানবাযদের দিকে করে দিলো। তীর বৃষ্টি এড়িয়ে জানবাযরা দরজা পর্যন্তও পৌছতে পারলো না। কয়েকজন যখমীও হলো।

শত কেল্লা জয় করার অভিজ্ঞতা মুজাহিদদেরকে কেল্লার দরজা ভাঙ্গায় বেশ দক্ষ করে তুলেছিলো। এবার তারা তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করলো কেল্লার

দরজা ভাঙ্গার দিকে। নিজেদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে কেল্লা ভাঙ্গার সব রকম কৌশলই প্রয়োগ করলো। কিন্তু সফল হলো না মোটেও। তবে কেল্লা ভাঙ্গার জন্য মুসলমানদের অনবরত হামলা কেল্লাবাসীর মধ্যে এ আতংক ঢুকিয়ে দিলো যে, মুসলমানরা কেল্লা না নিয়ে নড়বে না এখান থেকে।

কেল্লার ভেতরে গোত্র সরদাররা চিন্তায় পড়লো, যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করাই এখন নিরাপদ কাজ। না হয় তারা কেল্লা জয় করে নিলে তোমাদের কোন কথাই শুনবে না। সরদাররা পরামর্শ করতে বসলো।

'সন্দেহ নেই তোমরা যোদ্ধা এবং বাহাদুরও– এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ বললো– কিন্তু এটা ভেবে দেখো, কাদের সঙ্গে লড়ছো তোমরা? এটা আরব ও রোমের যুদ্ধ। আমরা আরবও নই রোমীয়ও নই। আমরা শাম দেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। আমরা রোমীয়দের সাহায্য করতে সৈন্য দিয়েছিলাম বলে মুসলমানরা আজ এর শাস্তি দিতে এসেছে আমাদের। তখনো বলা হয়েছিলো, অন্যের লড়াই তোমরা লড়তে যেয়ো না। ফায়দা কিছুই হবে না। রোমীয়দের যে ধ্বংসাত্মক পরিণাম হবে তোমরাও এর ভাগ পাবে। দেখে আজ আমরা ঠিকই এর শাস্তি ভোগ করছি। তাই ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। আমার বিশ্বাস, মুসলমানরা তোমাদেরকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবে।'

আরেক সরদার বললো, লড়াই যদি করতেই হয় তবে এখানকার সকল কবীলা মিলে এক বিশাল লশকর তৈরি করে তারপর মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করা হবে।

যা হোক, সন্ধির ব্যাপারে তারা একমত হয়ে গেলো। তারপর কেল্লায় বন্দী মুসলমান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওরা প্রথমে মুক্তি দিলো। তারপর ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো, সন্ধির জন্য মুসলমানদের কোন সালারের কাছে যেতে হবে। তারা জানালো, এই পুরো সীমান্তবর্তী দ্বীপ এলাকার দায়িত্ব তিনজন সালারের যিম্মায়। আর তাদের সিপাহসালার হলেন আয়ায ইবনে গনম (রা)। যিনি এখন আছেন ওয়াসিত নামক স্থানে। তিনিই কেবল সন্ধি করার অধিকার রাখেন।

সরদাররা তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে কেল্লায় বন্দী থাকা মুসলমানদের সঙ্গে কেল্লার বাইরে সালার সুহাইলের কাছে পাঠালো। তারা গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলো। সুহাইল তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ওয়াসিতে সালার আয়ায ইবনে গনমের কাছে।

এভাবে সন্ধির মাধ্যমে কেল্লার অবরোধ উঠে গেলো এবং খ্রিষ্টান যোদ্ধারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিরাপত্তা- কর আদায় করতে লাগলো।

✪ ✪ ✪

শাম থেকে পিছু হটে হেরাকল রোমের মারজুল আবয়াজ নামক শহরে গিয়ে উঠেন। এ শহরে বাদশাহদের বিলাস যাপনের জন্য বিশাল এক মহল আগ থেকেই তৈরি ছিলো। হেরাকল তার বিশাল লটবহর নিয়ে মহলে আশ্রয় নেন। শাহী ভোগ সম্ভারের উপকরণ- মদ, মদের সুরাহী, অতি সুন্দরী যৌবনবতী কানিয-দাসী এসব কিছুর কমতি সেখানে ছিলো না।

একটি খাস কামরায় কস্তন্তীন বসে আছে। আর হেরাকল আনত মুখে কামরায় পায়চারী করছে। আক্রোশ, অনিশ্চয়তা আর হতাশার অস্বাভাবিক একটা ছাপ তার চোখে মুখে। ক্ষণে ক্ষণে তিনি কস্তন্তীনের দিকে তাকাচ্ছেন। বাবার এ মূর্তির সামনে কস্তন্তীন অসহায়বোধ করতে লাগলো।

'শুধু ইনথিউনিসই গাদ্দার নয়- হেরাকল থমথমে গলায় বললেন- আমার স্ত্রী লিজা ও ছেলে ইউকেলিসও আমাকে ধোকা দিয়েছে। ওরা সবগুলো একাট্টা হয়েছে। মনে হয় লিজা জেনে গিয়েছিলো আমরা তার ছেলেকে হত্যা করতে যাচ্ছি।'

'মহান পিতা ! ওদেরকেও আমি গাদ্দার বলবো'- কস্তন্তীন কথা খুঁজতে খুঁজতে বললো।

'আমি পুরো ফৌজকেই গাদ্দার বলবো'- হেরাকল বললেন- আমি হয়তো এ হুকুমও জারী করতে পারি যে, যে কমাণ্ডার জীবিত যুদ্ধের ময়দান থেকে আসবে তাকে কতল করে দেয়া হবে। ঐ হতভাগারা আগ থেকেই নিজেদের ওপর মুসলিমভীতি সওয়ার করে রেখেছিলো। এখন আমি নয়া ফৌজ তৈরি করে খুব শীঘ্রই আবার শামে হামলা করবো। 'হেরাকল' কোন সাধারণ নাম নয়। যা ইতিহাসের পাতা থেকে সহসা মুছে যাবে। ভবিষ্যৎ বিশ্ব তাকে এক আসমানী শক্তি বলে স্মরণ করবে।'

এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, জেনারেল ইনথিউনিসের স্ত্রী এসেছে তার দুই বাচ্চা নিয়ে। কস্তন্তীন চমকে উঠলো। তার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। হেরাকল একটু ভেবে ইংগিতে তাদেরকে নিয়ে আসতে বললেন।

ভেতরে আসতেই হেরাকল ইনথিউনিসের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন সে কেন এসেছে ? তার স্বামী কোথায় এটা সে জানে কি না।

'এটাই তো আমি শাহেনশাহে মুআযযমের কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছি– মহিলা বললো– আমি তো খুঁজে খুঁজে না পেয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম, ইনথিউনিস মারা গেছে। কিন্তু সবাই বলে, সে যখমীও হয়নি মারাও যায়নি।'

'সে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই পালিয়েছে– হেরাকল বললেন– আমি ওকে পেলে তুমি পেতে ওর লাশ। কিন্তু সে লাপাত্তা ... তুমি আমার কাছে কি নিতে এসেছো ?'

'আশ্রয় চাইতে এসেছি। আমার এ নিস্পাপ বাচ্চাদের দেখুন, ওদের কোন মাথা গোঁজার ঠাই নেই।'

'এতে আমার কি দোষ ? বাপের পাপের শাস্তি ভোগ করছে ওরা।'

'কিন্তু শাহেনশাহে মুআযযম! আমি কোন অপরাধের শাস্তি পাচ্ছি ? আমি তো আমার স্বামীকে বলেছিলাম ....

'আমার খাযানা থেকে কোন গাদ্দারের স্ত্রী ও তার সন্তানদের ভরণপোষণ করা হবে না– হেরাকল বললেন শাহী মেজাযে– যাও অন্য কাউকে গিয়ে বিয়ে করে নাও। বাচ্চাদের আশ্রয় পেয়ে যাবে।'

ইনথিউনিসের স্ত্রী অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। হেরাকল তাকে ধমকাতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কস্তন্তীনও ইনথিউনিসের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলো।

'শাহেনশাহে মুআযযম! – ইনথিউনিসের স্ত্রী বললো– আমার স্বামী গাদ্দার হয়ে থাকলে আমাকে ও আমার সন্তানদের কতল করে দেয়াই কি উত্তম নয় ?

'তোমাদের ওপর আমি দয়া করেছি– হেরাকল বললেন– দয়া না করলে তোমাদেরকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতাম। মরার এত খাহেশ থাকলে বিষ খেয়ে নাও। আর নিজের বাচ্চাদেরকেও খাওয়াও। যাও এখান থেকে। আর কখনো আমার সামনে আসবে না।

ইনথিউনিসের স্ত্রীর চোখ যেন অশ্রুতে সাতার কাটছিলো।

ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলছিলো এতক্ষণ। হঠাৎ তার চেহারা লাল হয়ে উঠলো। দৃঢ়ভাবে সে মাথা তুললো।

'হে শাহেনশাহে রোম! – মহিলা একেবারে শীতল কিন্তু দৃপ্ত কণ্ঠে বললো– আমার কাছে শুনে নিন, আমার স্বামী কোথায় ? আপনার মালিকা লিজা তাকে

সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আপনার নির্দয়তা সম্পর্কে আমি জানি। তবে এখন কাউকে আর ভয় নেই আমার। আমার স্বামী ও লিজা আমার জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছিলো এতদিন। আর এখন আপনিও আমাকে ও আমার সন্তানদের শাস্তি দিচ্ছেন।'

'লিজাকে নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। সে তো আমার ছেলেকেও অপহরণ করে নিয়ে গেছে– হেরাকলের সুরে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

'শাহেনশাহে রোম! – মহিলার কণ্ঠ দুঃসাহসে ফুলে উঠলো– ইউকেলিস তো আপনার সন্তানই ছিলো না কখনো। সে আমার স্বামীর ছেলে। আপনার মালিকার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছি এ অপরাধে আমার ওপর গজব বর্ষণের আগে শুনে নিন, লিজা আমার ঘরে আমার স্বামীর সঙ্গে কয়েকবারই একাকী থেকেছে। সে আমাকে মূল্যবান মূল্যবান তোহফা দিয়ে খুশী রাখতে চেষ্টা করতো সব সময়। কিন্তু স্বামীর মূল্য তো কেউ দিতে পারবে না। আমার জীবন সে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই বলে যখন তাকে ভালো মন্দ বকতে লাগলাম, সে আমাকে তখন হুমকি দিলো যে, সে শাহে রোমের স্ত্রী। আমাকে সে কয়েদখানার নিকৃষ্ট কুঠুরীতে ফেলে আসবে।.... ইউকেলিসের জন্মের পর লিজা বলেছিলো, এখন তো সে ইনথিউনিস থেকে দূরে থাকতে পারবে না। কারণ সে তার ছেলে জন্ম দিয়েছে। সে বলতো, তার পূর্ণ যৌবনেই তো আপনি তাকে হেরেমে ছুড়ে ফেলেছিলেন এবং তাকে ভুলে গিয়েছিলেন।'

ইনথিউনিসের স্ত্রী ভেবেছিলো, এখনি বুঝি হেরাকল তার মৃত্যু পরোয়ানা জারী করে দেবে। কিন্তু সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করলো তার দিকে নিরব চোখে হেরাকল তাকিয়ে আছেন। শাহী মহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটা যে স্বাভাবিক এ যেন তিনি মাথা নামিয়ে মেনে নিচ্ছেন।

'কস্তন্তীন– শান্ত গলায় বললেন হেরাকল– এখন ওকে মহলে মেহমান হিসেবে রেখে দাও। আমি ওর দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করবো। এর আগ পর্যন্ত যেন তার পূর্ণ দেখ ভাল হয়। কোন জিনিসের অভাব যেন এরা বোধ না করে।'

✪ ✪ ✪

আরো এক দিন পথ চলে ওরা চমৎকার একটি জায়গায় রাত কাটাতে থেমে গেলো। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই দ্রুত শুয়ে পড়লো। ইউকেলিস তাড়াতাড়ি

ঘুমিয়ে পড়লো। লিজা তার কাছেই শোলো। আর ইনথিউনিস একটু দূরে। দু'জনের কারো চোখেই ঘুম আসছে না।

অর্ধ রাত পার হওয়ার পর ওরা দু'জন পা টিপে টিপে ছোট একটি মোলায়েম ঘাসে ছাওয়া টিলার ওপর গিয়ে বসলো। লিজা এখন প্রায় অর্ধ বয়সে পৌঁছে গেলেও তার অকল্পনীয় রূপ আর দেহসৌষ্ঠব তাকে যেন চির যৌবনা বানিয়ে রেখেছে। ইনথিউনিস তার চেয়ে পনের ষোল বছরের বড় হলেও তার পেশীবহুল দেহে এখনো যৌবন অটুট আছে। তাই দু'জনের এক দেহে রূপান্তরিত হতে সময় লাগলো না।

'তোমার কি নিজের স্ত্রী সন্তানের কথা মনে পড়ে না ?' – লিজা ইনথিউনিসকে জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি কাছে থাকলে আমার খোদার কথাও মনে পড়ে না। ওকে অমি সাধারণ এক স্ত্রীর অধিক মর্যাদা কখনো দেইনি। আর তোমাকে ছাড়া কাউকে আমার অন্তরে স্থানও দেইনি। আমার হৃদয় তোমার প্রতীক্ষাতেই ছিলো' ......

'তুমি কি আমাকে শাহী জীবন দিতে পারবে ? – লিজা বড় আবেগী কণ্ঠে বললো– তোমার যে ভালোবাসার প্রয়োজন ছিলো তা আমি তোমাকে দিয়েছি। এখন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি পারস্য সম্রাটের শাহী খান্দান থেকে এসেছিলাম এবং হেরাকলের শাহী মহলে এ বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেছি। তাই ভয় পাচ্ছি, না জানি এভাবেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় এবং এভাবেই জীবন শেষ হয়ে যায়।'

'আমি যে বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি তুমি হবে তার মালিকায়ে আলিয়া ইনথিউনিস বললেন।

ইনথিউনিসের ভেতর যেন হঠাৎ আদিম পাষববৃত্তি জেগে উঠলো। তিনি এমন মাতাল হয়ে গেলেন যে, তার মনেই রইলো না তিনি কোন শাহী কামরার নরম পালঙ্কে শুয়ে আছেন না জঙ্গলের কোন টিলায় খোলা আকাশের নিচে রয়েছেন। লিজাও যেন টিলার পাথুরি মেঝেতে পালঙ্কের কোমলতা অনুভব করছিলো।

ক্লান্ত হয়ে ইনথিউনিস লিজাকে বললো, চলো এবার ঘুমোতে যাই। লিজা যাওয়ার জন্য পেছন ফিরতেই চাঁদের উজ্জল আলোয় দেখলো, ইউকেলিস নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে টিলা বেয়ে উঠে আসছে। অর্থাৎ, তাদের এ সংঘনিষ্ঠ পরিবেশ

ইউকেলিস হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠার পর আঁচ করতে পেরেছে। লিজা আতংকিত হয়ে উঠলো।

'আমার পেছনে সরে এসো ইনথিউনিস'-লিজা একথা বলে ইউকেলিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ইনথিউনিসও ইউকেলিসকে দেখে ঘটনার মোড় বুঝতে পেরে লিজার পেছনে চলে গেলেন।

'আমার কাছ থেকে এ শয়তানকে বাঁচাতে পারবে না মা! – ইউকেলিস গজব-দগ্ধ গলায় বললো– সরে যাও সামনে থেকে। আমি দেখেছি, সে তোমাকে ধোকা দিয়ে তার সঙ্গে এনেছে শুধু এজন্যই। আমি ওকে জীবিত রাখবো না।

'চুপ করো ইউকেলিস! – লিজা গম্ভীর গলায় বললো– যে তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? তোমার জন্য যে তার সন্তানদের ছেড়ে এসেছে।'

ইউকেলিসের যেন একথা কানেই গেলো না, সে ইনথিউনিসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগলো, একজন মহিলাকে ঢাল না বানিয়ে পুরুষের মতো তার সামনে যেন আসে।

'ওকে বলে দাও লিজা! আমি কে? সত্য জানিয়ে দাও।' – ইনথিউনিস বললেন।

'তুমি কি তোমার পিতাকে হত্যা করবে?' লিজা বললো।

'হ্যা.... সামনে থেকে সরে যাও– রাগের ঘোরে লিজার কথা বুঝতে পারলো না ইউকেলিস– ওকে কতল করে আমি ফিরে যাবো এবং আমার বাবা হেরাকলকেও কতল করবো।'

'হেরাকল তোমার বাবা নয়– লিজা সত্য প্রকাশ করলো– সে শুধু ছিলো আমার স্বামী। তোমার বাবা এই– ইনথিউনিস... তুমি তার ছেলে।'

হঠাৎ করেই ইউকেলিসের ক্রোধ হজম হয়ে গেলো। ইনথিউনিসের দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তার উদ্ধত তলোয়ার মাটির দিকে নেমে পড়লো।

'এসো ইউকেলিস! – লিজা এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে বললো– তুমি ইনথিউনিসের ছেলে, হেরাকল্ এটা জানে না। সে তোমাকে তার ছেলে বলে জানে। যে কোন এক কারণেই আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি।'

ইনথিউনিস ও লিজা দু'জনে ইউকেলিসকে নিজেদের পাশে বসালো। তারপর লিজা নিজের সব কাহিনী ইউকেলিসকে এমন করুণ করে শোনালো, ইউকেলিসও আবেগ-আক্রান্ত হয়ে পড়লো।

'আমি তোমাকে শাহজাদা না বানিয়ে ক্ষান্ত হবো না– ইনথিউনিস ইউকেলিসকে বললো– হেরাকলকে কতল করবো না। তার বাদশাহী দখল করে তাকে পথের ভিখারী বানিয়ে ছাড়বো।'

'আমাদের শেষ গন্তব্য কোথায় ?' – ইউকেলিস জিজ্ঞেস করলো।

'আর মাত্র একদিনের পথ আছে। কাল রাতে আমরা কোন মরুভূমি বা জঙ্গলে থাকবো না। বরং কোন কবীলা সরদারের বাড়িতে নরম বিছানায় শুয়ে থাকবো'– ইনথিউনিস বললেন নিশ্চিন্ত গলায়।

✪ ✪ ✪

যেখানে ওরা শোয়ার জন্য কম্বল বিছিয়ে ছিলো লিজা ও ইনথিউনিস ইউকেলিসকে সেখানে নিয়ে গেলো। মায়ের আদর ইউকেলিসের বেশ ভালো লাগলো। নিজেকে এখন সে ছোট বাচ্চা ভাবতে লাগলো। তিনজনই শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ তারা ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শুনতে পেলো। ক্রমেই ক্ষুরধ্বনি এগিয়ে আসতে লাগলো। তিনজনের কান সতর্ক হয়ে গেলো। এবার তারা রোমী ভাষায় গানের গুণগুণে বেসুরে আওয়াজ পেলো। লিজা ফিস ফিস করে বললো, কেউ মনে হয় ধাওয়া করে আসছে। ইনথিউনিস মানলেন না, পিছু ধাওয়া করলে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার হতো। এ হয় মুসাফির কিংবা রণাঙ্গণ থেকে পলাতক কেউ।

'তুমি এখানে থাকো লিজা ! – ইনথিউনিস বুদ্ধি বের করলেন– আমি ও ইউকেলিস লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবো কে এ সওয়ার। বিপদজনক মনে হলে আমরা পেছন থেকে হামলা করবো।'

ইনথিউনিস ও ইউকেলিস দ্রুত বিশাল এক গাছের পেছনে গিয়ে ওৎ পেতে রইলো। ওদের ঘোড়া টিলার আরেক পাশে বাধা রয়েছে।

আগন্তুক সওয়ার এ দিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় চাঁদের উজ্জল আলোয় হঠাৎ তার চোখ পড়লো উপুড় হয়ে শায়িত লিজার পিঠের ওপর। সে ঘোড়া

থামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। আস্তে আস্তে সে লিজার দিকে এগিয়ে গেলো।

তার দীর্ঘ সফরে এ প্রথম কোন মানুষকে সে দেখলো। এখনো জানতে পারেনি এ এক মহিলা। কাছে গিয়ে বুঝলো এতো একজন মহিলা। সে খানিকটা ঝুঁকলো পরীক্ষা করার জন্য জীবিত না মৃত। তখনই লিজা উঠে বসলো এবং এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেলো। সওয়ারকে হঠাৎ করেই ভয়ের কালো থাবা গ্রাস করলো। সওয়ার মহিলাকে চিনে ফেললো। কিন্তু নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না।

আপনি ?' ....মালিকায়ে লিজা! .... সওয়ার সন্ত্রস্ত গলায় বললো– আপনি এখানে ? শাহে হেরাকল কি আশে পাশে কোথাও আছেন না কি ?'

'তুমি কে ? কোত্থেকে এসেছো ? কোথায় যাচ্ছো ? – এ নির্জন অন্ধকার, ছমছম পরিবেশে মনে হলো কোন অশরীরী কথা বলছে।

সওয়ারের মনে হলো, এ মালিকায়ে লিজা নয়। এ জঙ্গলে মালিকায়ে লিজা কেন আসবে। এ নিশ্চয় তার রূপ ধরে কোন মৃতের প্রেতাত্মা।

'না..... না.... সওয়ারের গলা আতংকে বুঁঝে এলো– আপনি কোন জীবিত মানুষ নন। জীবিত হলে আপনি শাহে হেরাকলের সঙ্গে রোমে থাকতেন.... আপনি কার প্রেতাত্মা? ...... আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার বিশ্রামে বেঘাত ঘটিয়েছি– একথা বলে সওয়ার উল্টো পায়ে ছুটতে শুরু করলো।

'দাড়াও! – লিজা বড় ভয়ংকর কণ্ঠে বললো– আমার কাছে এসো.... নাম বলো। তুমি রোমী ফৌজের লোক।'

'আমার নাম রোতাস!... সওয়ার বললো কাছে আসতে আসতে– আমি রোমী ফৌজের অফিসার..... মুসলমানরা আমাকে কয়েদ করেছিলো। আমি পালিয়ে এসেছি। আমি কি এখন যেতে পারি ?'

এ সময় ইনথিউনিস ও ইউকেলিস তলোয়ার হাতে তার সামনে উদয় হলো। সে আঁতকে উঠে এক দিকে সরে গেলো।

'আমি এসব কি দেখছি ?– রোতাস হয়রান হয়ে বললো– আপনারা সবাই এখানে কি করছেন ?'

রোতাস! – ইনথিউনিস তলোয়ারটি রোতাসের বুকে তাক করে বললেন– তুমি কি মনে করছো আমি জানি না যে, তুমি হেরাকল এর গোয়েন্দা বিভাগের

অফিসার ছিলে ? তুমি যে আমাদের অনুসরণ করে আসছো এটা অস্বীকার করতে পারবে ?

'আপনি কেমন জেনারেল! রোতাস বললো– আপনার এও জানা নেই যে, তিন চার মাস ধরে আমি ফৌজে নেই। ....... আমি হেরাকলের পক্ষ থেকে নয়, মুসলমানদের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছি।

সে মিথ্যে বললো, গুপ্তচরের কাজে সে দু'জন অভিজ্ঞ গুপ্তচরসহ হিমসে গিয়ে ধরা পড়ে। তার সেই দুই সঙ্গী তাদের হাতে মারা পড়ে। আর সুযোগ বুঝে সে পালিয়ে আসে।

'তাহলে এদিকে কি নিতে এসেছো ? হেরাকল ও তার ফৌজ তো এদিকে আসেনি– ইনথিউনিস বললো।

'তার চেহারা আর পোষাক দেখো– লিজা বললো– তিন চার মাস শত্রুদলের বন্দী শিবিরে থাকলে তার স্বাস্থ্য এত তরতাজা থাকতো না। ওর কাপড়ও হতো পুরোনো ছিড়ে ফাঁড়া...... সে মিথ্যা বলছে।'

'বিশ্বাস করুন আপনারা– রোতাস বললো– মুসলমানরা বন্দীদের সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করে। মেহমানের মতো আদর যত্ন করে ওরা।'

ইনথিউনিস রোতাসকে নিরস্ত্র করার জন্য তার কোমর থেকে তলোয়ারটি নিয়ে নিলেন। সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) তাকে সম্মান দেখাতে গিয়ে তার তলোয়ারটিও তাকে দিয়ে দেন। ইনথিউনিস রোতাসকে তল্লাশি চালিয়ে ক্রুশমূর্তিটি নিয়ে নিলেন। চাঁদের আলো সোনার মূর্তির গায়ে পড়তেই সেটি চমকে উঠলো।

'এ ক্রুশমূর্তিই তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। আমি জানি এটি কার। এক রোমী অফিসার সবসময় তার সঙ্গে এটি রাখতো'- উনথিউনিস বললেন।

'এখন ভেবে দেখো'– লিজা বললো– সে এতদিন মুসলমানদের কয়েদী থাকলে তারা কি তার সঙ্গে রাখতে দিতো ? আচ্ছা তুমি সত্য কেন বলছো না ?'

ইনথিউনিস তাকে আবার তলোয়ার তাক করে হুমকি দিলেন, সত্য কথা না বললে তার লাশ ফেলে দেয়া হবে এখানে। তখন জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা তার লাশ খাবে।

'আমি আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি– রোতাস বাধ্য হয়ে সত্য বলতে শুরু করলো– হেরাকল পিছু হটে কোন দিকে গিয়েছেন তা আমি জানি। কিন্তু আমি

ও দিকে যাবো না। তবে এও জানি না কোথায় যাবো আমি। আমি গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়েছিলাম; কিন্তু সব গোপন তথ্য আমি মুসলমানদের দিয়ে এসেছি।'

রোতাস মুসলমানদের হাতে ধরা পড়া থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলো।

'হেরাকলের এক মেয়ে শারীনার ধোকায় পড়েছিলোম– রোতাস বললো– আপনারা নিশ্চয় শারীনার কথা ভুলেননি। সে ওখানেই ছিলো। সেই আমাকে কয়েদখানা থেকে বাঁচিয়ে এনে খুব সুন্দর একটি কামরায় স্থানান্তর করায়। তারপর আমার সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার এমন খেলা লেখতে শুরু করলো যে, আমি তার জালে পা দিলাম। শারীনা বললো আমাকে, আমার সঙ্গে সে ফিরে আসবে। আমি ধোকায় পড়ে আমাদের ফৌজের সব দুর্বলতা তাকে জানিয়ে দিলাম। আর মুসলমানরা আমার তথ্য থেকে পুরোপুরি ফায়দা উঠিয়েছে। এরই পুরস্কারস্বরূপ তাদের সিপাহসালার আমাকে এ সোনার ক্রুশমূর্তিটি দিয়েছেন।'

ওরা রোতাসের কথা সত্য বলে স্বীকার করে নিলো। তবে তাকে হুশিয়ার করে দিলো, ধোকা দিলে তাকে কতল করে দেয়া হবে। ইনথিউনিসরা কোথায় কি পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছে রোতাসকে সে বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হলো।

'আমাকে এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবেই পাবেন– রোতাস বললো– আমি তো পথ হারা মুসাফির। অপনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন। ঐ কবীলা সরদারদেরকে আমি আপনার চেয়ে অধিক জানি বৈ কি !'

ভোরের আলো ফোটার আগেই ওরা রওয়ানা দিয়ে পরদিন নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলো।

✪ ✪ ✪

ইরাক ও শামের সীমান্ত এলাকায় এবং ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় বনু তাগলিবের এলাকা। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা গোত্র বনু তাগলীব। ইরাক অভিযানের প্রাথমিক সময়ে যখন মুসান্না ইবনে হারিসার নেতৃত্বে মুসলমানরা কিসরায়ে ইরানকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করে। তখন এই বনু তাগলীবের খ্রিষ্টান যোদ্ধারা আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুসলমানদের সেনাদলে যোগ দেয় এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে সবার প্রশংসা কুড়ায়।

এখন যখন মুসলমানরা ইরাক ও শামের বিজয় পুর্ণাঙ্গ করলো তখনই বনু তাগলিবের যোদ্ধারা বিদ্রোহ করে বসলো।

আমীরুল মুমিনীন বনু তাগলিবের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিলেন, সালার ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে। বনু তাগলিবের যোদ্ধারা সালার ওয়ালিদ ইবনে উকবার মুজাহিদ দলের সঙ্গে প্রথম দিকে সমান তালে লড়লেও কয়েকটি মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বনু তাগলিবের সরদাররা বাধ্য হয়ে সন্ধির মাধ্যমে মুসলামনদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

সালার ওয়ালিদ ইবনে উকবা ভাবলেন, এমন শক্তিশালী বিরাট এক গোত্রকে মুসলমান বানাতে পারলে মুসলমানদের যুদ্ধ শক্তিতে ভালোই সমৃদ্ধি ঘটবে। তাই তাদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করলো। তবে সরদাররা এ ব্যপারে ঐকমত্য পোষণ করলো যে, আমীরুল মুমিনীন যে ফায়সালা করবেন সেটা তারা মেনে নেবে।

হযরত উমর (রা) সালার ওয়ালিদ ইবনে উকবার এ সম্পর্কিত পয়গামের জবাবে লিখলেন, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ওদেরকে চাপাচাপি করো না। তবে সে গোত্রের কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে তারা বাধা দিতে পারবে না। আর তারা যেহেতু মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা তাই তারা 'যিম্মী'। যিম্মী হিসেবে তাদের জিযিয়া তথা নিরাপত্তা- কর দিতে হবে।'

সালার ওয়ালিদ ইবনে উকবার মুখে উমর (রা) এর পয়গাম বনু তাগলিবের লোকেরা যখন শুনলো তখন বেশ কয়েকজন খ্রিষ্টান মুসলমান হয়ে গেলো। তবে সরদাররা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে বললো, তাদেরকে যিম্মী বলা যাবে না।

'হে বনু তাগলিব! - ওয়ালিদ ইবনে উকবা বললেন- তোমাদের জন্য আমরা আমাদের আইন পাল্টাতে পারি না। আর তোমাদের প্রতিটা জিদের বিষয়েই যে আমি আমীরুল মুমিনীনের ফয়সালার জন্য তার কাছে পয়গাম পাঠাবো এমনটা ভেবো না। জিযিয়া উসুল আমরা কখনো মাফ করবো না।'

'আমরা তো ধার্যকৃত পয়সা দিতে অস্বীকার করছি না- এক সরদার বললো- আপনি জিযিয়া থেকে দ্বিগুণ পয়সা নিতে পারেন। কিন্তু আমাদেরকে যিম্মী বলবেন না এবং এ পয়সাকে জিযিয়া বলবেন না।

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, বনু তাগলীবের এক প্রতিনিদিল মদীনায় আমিরুল মুমিনীনের কাছে ধার্যকৃত পয়সা দিয়ে তাদের দাবী পেশ করবে। সেদিনই এক প্রতিনিধি দল মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলো।

মদীনায় পৌঁছে এ প্রতিনিধিদল উমর (রা) এর কাছে তাদের দাবী পেশ করলো।

'জিযিয়া হিসেবে যা ধার্য করা হয়েছে আমরা এর চেয়ে বেশি নেবো না। তবে একে জিযিয়াই বলা হবে– উমর (রা) বললেন।

'কিন্তু আমরা এটাকে 'দান' বলতে চাই– এক বৃদ্ধ সরদার বললো।

'তোমরা একে যে কোন নাম দিতে পারো হযরত উমর (রা) বললেন– আমাদের রীতিতে একে জিযিয়া বলা হয় ...... আমি তো হয়রান হচ্ছি তোমরা এত তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে কি করে এত দুর চলে এলে ?'

'আমীরুল মুমিনীন! – বৃদ্ধ সরদার বললো– আমরা আপনাকে আমীরুল মুমিনীন বলে মান্য করি। সঙ্গে সঙ্গে এ আবেদনও করছি যে, আমাদের গোত্রীয় ও জাতীয় মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে দিন। আপনি জানেন বনু তাগলিবের নাম কত উচ্চ শব্দে স্মরণ করা হয়। জিযিয়াকে তো একটি অসম্মানের বিষয় মনে করা হয়। এটা নিশ্চয় ভুলেননি, আমাদের গোত্রীয় যোদ্ধারা আপনাদের লশকরের পক্ষে কিসরায়ে ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরাও মুসলমানদের হয়ে লড়াই করবো। আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছি। ধার্যকৃত টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিন। আমাদের ইযযত-সম্মান আর ঐতিহ্য নষ্ট হতে দিবেন না।'

হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা) কে একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিলেন। এমনিই এক এলাকায় সালার সাদ ইবনে মালিক এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন সেখানকার লোকেরা দ্বিগুণ অংকের টাকা দান স্বরূপ দিতে সম্মত হয়। বনু তাগলীবের ব্যাপারেও উমর (রা) এ ধরণের ফয়লাসা দিলেন। সরদাররা আনন্দচিত্তে এ ফয়সালা কবুল করে নিলেন।

পরে আস্তে আস্তে বনু তাগলীবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

✪ ✪ ✪

ইনথিউনিস, লিজা, ইউকেলিস ও রোতাস জঙ্গলের ভেতরে বসবাসকারী বনু রবীআ গোত্রে গিয়ে হাজির হলো। লোকজন তাদেরকে দেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলেও তারা রোমী বলে খুব একটা পছন্দের চোখে দেখলো না ওদেরকে। ইনথিউনিস ও রোতাস এসব এলাকার ভাষা ভালো করেই জানতো। ওরা জানালো এখানকার কোন শ্রদ্ধাভাজন লোকের কাছে ওরা যেতে চায়।

তাদেরকে এক বৃদ্ধের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। বৃদ্ধের চোখে মুখে ছিলো আভিজাত্যের ছাপ।

'তোমরা রোমী– বৃদ্ধ বললেন ওদেরকে সম্মানে বসিয়ে– রোমীদের ব্যাপারে এখন আর আমাদের মনে সেই শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমান। হৃদয় দিয়ে তোমাদের সম্মান করবো। তোমরা কি কোথাও যাচ্ছো ? তোমরা কি আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থী ? আর পথ ভুলে গেলে আমরা পথ দেখিয়ে দেবো।'

'মান্যবর বুযুর্গ– ইনথিউনিস বললেন– আমরা পথ হারাইনি। আমরা নতুন এক পথ বানাতে এসেছি এবং আপনার ও আপনার জাতির সাহায্য প্রয়োজন।'

'বলো, তোমাদের কি সাহায্যের প্রয়োজন ? আমরা হতাশ করবো না তোমাদেরকে।'

'আমরা নিজের জন্য কিছু করতে চাই না– ইনথিউনিস বললেন– আমরা আপনাদের গোত্রভিত্তিক জাতির জন্য কিছু করতে চাই এবং আমাদের জন্য। হেরাকল পালিয়েছেন। তার ফৌজের অধিংকাশই মারা পড়েছে। জীবিতরা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাদের ফৌজি অস্তিত্বই খতম হয়ে গিয়েছে। আমি রোমী ফৌজের জেনারেল। ওকেও (রোতাস) জেনারেল মনে করুন। আর এ মহিলা ও ছেলেটি... পরে বলবো। এখন আমরা বলতে চাই। আমাদেরকে রোমী নয় আপনাদের লোক মনে করুন। হেরাকল প্রথমে বাদশাহ। তারপর নামকা ওয়াস্তে খ্রিষ্টান। আমরা প্রথমে খ্রিষ্টান, তারপর রোমী।

ইনথিউনিস রোতাসের ক্রুশ মূর্তিটি বৃদ্ধকে দেখালেন।

'আমরা এ ক্রুশ মূর্তির সালতানাতই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই– ইনথিউনিস বললেন– সেটা রোম ও ইরানের মতো কোন বাদশাহী হবে না এ হবে ঈসা মাসীহের সালাতান। আল -জাযীরা তথা সীমান্তবর্তী দ্বীপের সবগুলো গোত্র যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে আমি ও আমার এ সঙ্গী তাদেরকে এক যবরদস্ত ফৌজের রূপ দেবো যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তারা মুসলমানদেরকে শাম থেকে বের করে দেবে।'

এবার বৃদ্ধের ম্লান মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো। ইনথিউনিস যেন তার মনের কথা বলে দিয়েছেন।

'কখনো আমরা ইরানীদের গোলাম হয়েছি– বৃদ্ধ বললেন– কখনো আবার রোমীয়রা এসে আমাদের ওপর প্রজা শাসন চাপিয়ে দিয়েছে। আর এখন

মুসলমানরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে খেলা করছে। কিছু কিছু গোত্র বিদ্রোহ করেছে ঠিক কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। ফলে ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ টিকতে পারছে না এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছে। শুধু 'হলবে' এখনো কিছু হয়নি। আমার দৃষ্টি এখন ঐ কেল্লাবেষ্টিত শহরের ওপর। দুই শক্তিশালী গোত্র এখনো সেখানে আছে। বনু রবীআ ও বনু তানুখ। বনু তাগলীবের শক্তিশালী গোত্রও মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নিয়েছে। তাই বলছি, হলবে যদি আমরা জমে যেতে পারি এবং মুসলমানদের একটা ধাক্কা দিতে পারি তাহলে অন্যসব গোত্রপতিরা এক পতাকাতলে এসে যাবে।'

'আপনি কি ঐসব গোত্র সরদারদের এখানে ডেকে আনতে পারবেন ? এখনই আমরা সবার নজরে আসতে চাই না। আসল বিপদ হলো, হেরাকলের গুপ্তচররা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তোমাদের কোন ভয় নেই যে পর্যন্ত তোমরা আমাদের এখানে আছো। চোখ উঠিয়েও কেউ তোমাদের দিকে তাকাতে পারবে না। আর সরদারদেরও এখানে ডাকার প্রয়োজন নেই। আমরা তোমাদেরকে হলব পৌঁছে দেবো। সরদাররাই আসবে তোমাদের কাছে। গরীব কৃষকদের পোশাকে তোমাদেরকে আমরা হলবে পৌঁছে দেবো।'

✪ ✪ ✪

ইনথিউনিস হলবে পৌঁছেই তার সঙ্গীদের নিয়ে তৎপরতা শুরু করে দিলেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার স্থানীয় গোত্র-সরদারদের তার পুরো পরিকল্পনা মুখস্ত করিয়ে দিলো। ঐসব সরদাররা হলব ও তার আশেপাশের ছোট বড় সব গোত্রে অতি সন্তর্পণে ইনথিউনিসদের এসব পরিকল্পনার খবর ছড়িয়ে দিলো। এত বড় শহর হিসেবে হলবে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো অতি সামান্য। তারা শুধু জিযিয়া কর ইত্যাদি উসুলসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতো।

কিছুদিন পর হলবে বিভিন্ন গোত্র থেকে লোকজন আসতে লাগলো। সবাই গোপনে সঙ্গে করে হাতিয়ারও আনতে লাগলো। ক্রমেই শহর ভরে উঠলো। স্থানীয় মুজাহিদরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলো না। শহরে যে রোমী ফৌজের সেনা ছাউনি ছিলো সেগুলো ভিড়ে এমন উপচে পড়লো যে, বাইরে এবং খোলা আকাশের নিচে অসংখ্য তাঁবু টানাতে হলো। বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ছাড়াও পরাজিত রোমী সৈন্যরাও হলবে পৌঁছতে লাগলো। ভেতর

ভেতর ইনথিউনিস গোত্র-সরদার ও তাদের অধীনস্ত লোকদের ফৌজি প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে লাগলো।

ইনথিউনিস ও তার সঙ্গীদের মুসলমানরা তো নয়ই কবীলার অনেক লোকও তখনো চিনে উঠতে পারেনি। তবে ইউকেলিসকে প্রতিটি সরদার ও যোদ্ধা ভালো করে চিনতো। কারণ, ইউকেলিস তাদের এক মেয়ের ইযযত রক্ষা করে। তাদের চোখে সে এখন ইযযত ও আবরু রক্ষাকারী এক মহান প্রতীক। সবাই আরো এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো যে, শাহে হেরাকলের শাহী মহলের ভোগ বিলাসের জীবন ত্যাগ করে সে এখন তাদের কাছে চলে এসেছে তাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্য।

ইউকেলিস একদিন এমনিই ঘোড়া দৌড়ানোর জন্য শহর থেকে বের হয়ে বাগান মতো একটি জায়গায় ঘুরতে লাগলো। ঝর্ণাসিক্ত এ জায়গাটি যে কারো ভালো লাগবে। চার পাঁচটি মেয়ে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে এদিকে আসছিলো। ইউকেলিসকে দেখে সবাই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। অতি রূপসী একটি মেয়ে দৌড়ে ইউকেলিসের কাছে চলে এলো। ইউকেলিস তাকে ঠিকমতো চিনতে পারলো না।

'তুমি তো সেই- মেয়েটি রিনিঝিনি গলায় বললো- আমি সারা জীবনেও তোমাকে ভুলতে পারবো না। তুমি আমার ইযযত বাচিয়েছো.... তুমি না হলে....

'সেটা আমার দায়িত্ব ছিলো- ইউকেলিস মেয়েটিকে চিনতে পেরে বললো- আমি তো তোমার মুখটাই ভুলে গিয়েছিলাম।

বড় সরল নিস্পাপ আদলে প্রতিফলিত রূপবর্তী মেয়েটিকে খুবই মোহনীয় লাগছিলো। যৌবনের আলো তার দেহের কামনীয় ভাজগুলোকে মাত্র ফুটাতে শুরু করেছে। আবেগে মেয়েটি ইউকেলিসের হাত দুটি ধরে চুমু খেলো। বাম হাতটি ডান হাতের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম দেখে তার ভ্রু কুচকে গেলো। ইউকেলিস প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বললো, জন্মগতভাবেই তার হাতটি শুকনো। মেয়েটির চোখ কুচকে উঠলো।

'কত বার যে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি- মেয়েটি বললো- যখন মনে হতো তোমাকে সারা জীবনও দেখতে পাবো না, তখন বড় কষ্ট হতো।'

'ও ছিলো আমার ভাই, যাকে আমি কতল করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম- ইউকেলিস বললো- আমার একটি হাত অকেজো, তবুও আমি তলোয়ার বর্শা দিয়ে দুই তিনজনের বিরুদ্ধে লড়তে পারি।'

'শুনেছি, তুমি বাদশাহ হেরাকলের ছেলে। তিনি তো লাপাত্তা। কিন্তু তোমরা কেন এখানে এসেছো?'

'বাদশাহীকে অমি পায়ে পিষে এসেছি– ইউকেলিসের গলায় গর্ব– সেদিন তোমার ইযযত বাঁচিয়েছিলাম এখন তোমাদের গোত্রীয় ইযযত বাঁচাবো। এখন আমি এখানেই থাকবো।'

মেয়েটির মনে হলো, স্বপ্নের মধ্যে সে আরেকটি স্বপ্ন দেখছে। তার স্বপ্নের শাহজাদা তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই প্রেম পিয়াসী।

সেদিনের পর ইউকেলিসের সঙ্গে মেয়েটিকে ঝর্ণার ধারে, ঘন ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে, কেল্লার প্রচীরের ওপরে– নানা জায়গায় দেখা যেতে লাগলো। ইউকেলিস একদিন মেয়েটিকে তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলো। মেয়েটির তো মনে হলো, সে আসমান থেকে নেমে আসা এক ফেরেশতা।

'আমি ভয় পাচ্ছি– মেয়েটি একদিন ইউকেলিসকে বললো– যে সালতানাত তোমরা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছো তা হয়ে গেলে তো তুমি আবার সেই শাহজাদা বনে যাবে এবং সহজেই ভূলে যাবে আমাকে। এক সরদারের মেয়ে তো তোমার কাছে তখন আরো তুচ্ছ হয়ে যাবে।'

ইউকেলিস শব্দে না, এর উত্তর দিলো ওকে জড়িয়ে ধরে। তার এক হাতেই মেয়েটিকে যেভাবে বুকে পিষলো মেয়েটির মনে হলো অর পাঁজর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

✪ ✪ ✪

এক রাতে ইনথিউনিস শহরে প্রশাসনিক কাজে কর্তব্যরত মুজাহিদদেরকে তাদের গভীর ঘুমে বন্দী করলো। শহরের প্রধান ফটকে নৈশ প্রহরারত দুই মুজাহিদ আগেই সংবাদ পেয়ে যায় শহরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। তারা শহর থেকে পালালো তখনই। তবে পালানোর সময় কয়েকজন যোদ্ধা দেখে ফেলে তাদের ওপর হামলা চালায়। তারা হামলা রুখে যখমী হলেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বিশ মাইল দূরে কুনসুরীন নামক এক স্থানে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)। হলব থেকে পালিয়ে আসা দুই মুজাহিদ পর দিন কুনসুরীন পৌঁছে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কে হলবের পরিস্থিতি জানায়। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তখনই এ সম্পর্কিত পয়গামসহ এক কাসেদ পাঠিয়ে দেন সিপাহসালার আবু

উবাইদা (রা) এর কাছে। আর তিনি তার ফৌজ নিয়ে হলবের দিকে তুফান বেগে ছুট দেন। তার ফৌজের রসদ বোঝাই করা উটের দল পড়ে যায় অনেক পেছনে। সেদিকে তিনি ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) যখন হলবে পৌছলেন তখন তিক্তভাবে অনুভব করলেন, এ শহর জয় করা খুবই কঠিন কাজ। তিনি লক্ষ্য করলেন, কেল্লার প্রাচীরে যোদ্ধারা এমন ভীড় করে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে যে, তাদের মাঝখান দিয়ে বাতাসও যেতে পারবে না। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর সঙ্গে আসা সওয়ার মুজাহিদের সংখ্যা মাত্র চার হাজার। আর গোত্রভিত্তিক যোদ্ধাদের সংখ্যা দশগুণেরও বেশি। খালিদ (রা) প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধাদের দিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দেয়াল থেকে যখন তীর আসতে শুরু করলো মুজাহিদ তীরন্দাযদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না।

খালিদ (রা) আরো অধিক মুজাহিদ চেয়ে সিপাহসালারের কাছে পয়গাম পাঠালেন। সিপাহসালারের নির্দেশে সালার আয়ায ইবনে গনম (রা) পাঁচ হাজার মুজাহিদ নিয়ে উল্কা বেগে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কেল্লা জয় করার ব্যাপারে খালিদ (রা) এর বিশেষ দক্ষতা ছিলো। তিনি যখন তার জানবায অংশ নিয়ে কেল্লার ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন ইনথিউনিসের পেরেশানী বেড়ে গেলো।

চার পাঁচ দিন পর ইনথিউনিস কেল্লা বন্দী মুজাহিদদেরকে প্রাচীরের ওপর মুসলমান লশকরের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সংখ্যায় তারা প্রায় একশজন হবে। সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ইনথিউনিস সেখান থেকে ঘোষণা করলেন, এখনি অবরোধ উঠিয়ে নাও। দেরী করলে এদের মধ্য থেকে প্রথমে দশ জনের মাথা কেটে তোমাদের দিকে ছুড়ে মারবো। তারপর আরো দশজন, দশজন করে সবগুলোকে খতম করে দেবো।

'অবরোধ উঠাবে না– এক কয়েদী মুজাহিদ বড় জোশেলা কণ্ঠে বলে উঠলো– আমাদের মাথা কেটে যাক। আমরা ঘর থেকে আল্লাহর রাহে মাথা কাটাতেই বের হয়েছি। অবরোধ উঠাবে না। আল্লাহ তোমাদের মদদ করবেন।'

সব কয়েদী মুজাহিদ 'অবরোধ উঠাবে না'– 'আমাদের মাথা কাটা যাক' বলে সমস্বরে শ্লোগান উঠালো। কয়েদী মুজাহিদদের এ আগুনে জযবা দেখে যুদ্ধরত মুজাহিদদের মধ্যেও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। তবে সালাররা সবাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলেন।

দুদিন পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর হুকুমে মুজাহিদরা শহরের ভেতর জলন্ত তীর ছুড়তে লাগলো। শহরের এক দিকে উঁচু একটি জায়গা আছে। সেটার ওপর চড়ে এবং বিভিন্ন উঁচু গাছের ওপর উঠে মুজাহিদরা এ কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ভেতরে এর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা তখনো জানা গেলো না।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) জানতেন না, হলবের কেল্লার ভেতরের বিশাল যোদ্ধা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে এক রোমী জেনারেল ও রোমী অফিসার এবং তাদের সঙ্গে আছে হেরাকলের এক স্ত্রী ও ছেলে। তিনি মুজাহিদদের সাহস ও উদ্যমতা বাড়ানোর জন্য তার পুরো বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, শহরে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুশৃংখল ফৌজ নেই। এরা একক যোদ্ধা হিসেবে দুর্ধর্ষ হলেও এবং সমবেতভাবে হামলা চালাতে পারলেও অবরোধে টিকে থাকা ও অবরোধ ভাঙ্গার মতো ক্ষমতা ওদের নেই। তাই দেখবে হয় সন্ধির মাধ্যমে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে অথবা এমন কোন বোকামি করে বসবে যা তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ওদিকে শহরের ভেতর ইনথিউনিস ও রোতাসের যেন রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। খ্রীষ্টিয় সালতানাত প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ইনথিউনিস গ্রহণ করেছে তাই জরুরী হয়ে গছে, হলবকে যে কোন মূল্যে অপরাজয়ে রাখা।'

ঘুম নেই ইউকেলিসের চোখেও। শহর অবরোধ হওয়ার পর থেকে সে তার দৈনন্দিন রুটিন বানিয়ে নিলো যে, প্রাচীরের ওপর বা শহরে ঘুরে বেড়াতো এবং লোকদের সঙ্গে জোশেলা কথা বলে তাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলতো।

✪ ✪ ✪

ইনথিউনিস, লিজা ও ইউকেলিস থাকতো একটি বাড়িতে। আর রোতাস থাকতো ভিন্ন বাড়িতে। রোতাস দুই চার দিন পর পর লিজার ঘরে আসতো এমনিই কুশল বিনিময়ের জন্য। কিন্তু শহর অবরোধ হওয়ার পর তার আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইনথিউনিস সে বাড়িতে থাকলেও তারও আসা কমে যায় অনেক। ঘরে এসেই ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তেন ইনথিউনিস এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেন। একটুপর হড়বড় করে জেগে উঠে যোদ্ধা ছাউনিতে চলে যেতেন।

এক রাতে ইনথিউনিস কামরায় এসেই যথারীতি শুয়ে পড়লেন। তখনই তার কাছে লিজা এসে হাজির হলো। ইনথিউনিস লিজার সঙ্গে অবরোধ বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

'এছাড়া কি আমার সঙ্গে তোমার অন্য কোন কথা বলতে ভালো লাগে না?– লিজা অভিমানী গলায় ইনথিউনিসকে জিজ্ঞেস করলো। ইনথিউনিস লিজার এ সূর ভালো করেই বুঝতেন।

'লিজা'– ইনথিউনিস বললেন– তুমি এসব কি বলছো ? আমি তো চেয়েছি, আমি ঘরে আসলে প্রথমেই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, অবরোধ কবে ভাঙ্গবে? আর অবরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে কি প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে ? অথচ তুমি কথা বলছো এমনভাবে যে, পরিস্থিতি এখন খুবই স্বাভাবিক। আমি তো এখন এছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না।'

ইনথিউনিস গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন, লিজার চোখমুখে কেমন মাদকতা খেলা করছে। সদ্য প্রেমিক প্রেমিকার মতো ছিলো না ওদের সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীর মতোই ছিলো ওদের সম্পর্ক।

'লিজা! – ইনথিউনিস বললেন– বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করো এবং সজাগ হও। এটা প্রেম রসে মজে থাকার সময় নয়। এটা ভেবে দেখো, এ যুদ্ধে যদি আমরা হেরে যাই তাহলে আমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না আর। এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাবোই বা কোথায় ? বনু তাগলিবের মতো শক্তিশালী কবীলা আরো কয়েকটি কবীলা নিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তোমার তো আমার মতো ঘরের বাইরে যোদ্ধাদের মাঝে সময় কাটানো উচিত। তুমিতো গোত্রীয় মহিলাদের লড়াইয়ে প্রস্তুত করতে পারো।'

ইনথিউনিসের এসব কথা লিজার কাছে প্রলাপ বাক্য ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না। সে তো চাচ্ছিলো নিজের আবেগে ইনথিউনিসকে যৌবনতপ্ত করতে। কিন্তু ইনথিউনিস এসব দৈহিক অনুভূতি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

'তুমি তো আছো তোমার বাদশাহী প্রতিষ্ঠার ফিকিরে– লিজা চরম হতাশাকণ্ঠে বললো– কবে তুমি এ বাদশাহীর মুখ দেখবে কে জানে ? কিন্তু এখন তো তুমি হেরাকলের মতোই হয়ে গেছো। সে যেমন আমাকে ভোগ করে ছুড়ে ফেলেছিলো তুমিও তাই করতে যাচ্ছো। তুমি তো আগের মতো আমার সঙ্গে বসে কথাও বলতে চাও না।'

লিজা হতাশাদগ্ধ অভিমানী গলায় আরো অনেক কিছু বলে গেলো। এক সময় ইনথিউনিসের আর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, ইনথিউনিস গভীর ঘুমে। তার কাছে মনে হলো, জলমগ্ন একটি নদী আচমকা শুকিয়ে গেছে।

লিজার এই প্রথম মনে হলো একমাত্র ছেলে ইউকেলিসই তার অবলম্বন। তার জন্যই সে বেঁচে আছে। কিন্তু ইউকেলিসকে খুব একটা দেখা যেতো না। দুতিনদিন পর পর হঠাৎ রাত করে উদয় হয়ে সকাল বেলা আবার উধাও হয়ে যেতো। ইউকেলিস যদিও বলতো, সে ঈসা মাসীহ এর সালতানাত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু সালতানাত প্রতিষ্ঠার চেয়ে তার বেশি আগ্রহ হেরাকল ও কস্তুন্তীনকে হত্যা করা।

✪ ✪ ✪

পর দিন সকালে চোখ খুলতেই লিজা ইউকেলিস বা ইনথিউনিস কাউকেই দেখতে পেলো না। একটু পর খাদেমা নাশতা নিয়ে এলে লিজা নাশতা খেতে বসলো। খাদেমাও বসে গেলো ফরাসের ওপর।

'খোদা আপনার ইযযত সম্মান আরো বাড়িয়ে দিন মালকিন– খাদেমা বললো– আমাদের মতো গরীবদের কিছু একটা বলুন। এ অবরোধ কবে উঠবে ? শহরের আনাজ তরকারি দিন দিন কমে যাচ্ছে। অবশ্য পানির কোন কমতি নেই। কিন্তু শুধু পানি দিয়ে তো জীবন বাঁচে না।

'ঘাবড়িয়ো না– লিজা বললো– অবরোধ উঠে যাবে। না উঠলেও শহরের বাইরে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করা হবে।'

'আপনাকে তো কখনো গির্জায় দেখা যায় নি– খাদেমা বললো– গির্জায় প্রতিদিন আমাদের জয় ও মুসলমানদের পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা হয়। পাদ্রী বলেন, পাপ থেকে তাওবা করো। পাপের কারণেই আমাদের ওপর এত বড় বিপদ নাযিল হয়েছে। আমরা গরীবরা কিইবা পাপ করতে পারি।'

খাদেমার কথা ফুরোবার আগেই লিজা হো হো করে হেসে উঠলো। খাদেমা কিছুই বুঝতে না পেরে লিজার দিকে তাকিয়ে রইলো। খাদেমা জানালো, শহরের কিছু লোক যদিও বলছে, বাইরে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করা হোক; অধিকাংশই বলছে, শহরের দরজা খুলে দেয়া হোক। মুসলমানরা অনেক ভালো মানুষ। যে শহরকে ওরা জয় করে সেখানকার লোকদের সঙ্গে তারা অনেক সুন্দর ব্যবহার করে। লিজা তাড়াতাড়ি নাশতা সেরে উঠে পড়লো। এসব বিষয়ে কথাবার্তা তার তেমন ভালো লাগলো না।

লিজা এলোমেলো পায়ে শহরে ঘুরতে লাগলো। শহরের মহিলারা লিজাকে চিনতো। এক জায়গায় এক মহিলা তাকে ঘিরে ধরলো। ওরা আতংকিত হয়ে

জিজ্ঞেস করতে লাগলো। এ অবরোধ কবে উঠবে আর কবে তাদের মুক্তি মিলবে। লিজা যেন ভেতর ভেতর সজাগ হয়ে উঠলো, সে এমন আত্মবিশ্বাস ও জোশেলা ভাষায় কথা বলতে লাগলো যে, তাদের আতংক তো দূর হলই কয়েকজন মহিলা বলে উঠলো, তারাও পুরুষদের মতো লড়বে এবং মুসলমানদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।

লিজা নিজের ভেতর সামান্য পরিবর্তন টের পেলো। সে প্রাচীরের ওপর যোদ্ধাদের ভিড় ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো। লোকেরা তাকে সালাম করে রাস্তা করে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ লিজা তার কাঁধে কারো স্পর্শ অনুভব করলো। পেছন ফিরে দেখলো রোতাস। তার চেহারা উজ্জ্বল যাচ্ছিলো। লিজা তাকে অবরোধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা তো অবরোধ ঠেকিয়ে রাখার সব চেষ্টাই করছি– রোতাস বললো– কিন্তু মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)। শাম থেকে আমাদের ফৌজকে উৎখাতে তার ভূমিকাই সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ।'

'এ নাম আমিও শুনেছি– লিজা বললো– হেরাকলকেও বলতে শুনেছি, খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে মারতে পারলে আমি মুসলমানদেরকে শুধু শাম থেকে নয় আরব থেকেও তাড়িয়ে আরব সাগরে নিয়ে ডুবিয়ে মারতে পারতাম।'

'আপনি হয়তো জানেন না– রোতাস বললো– খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে হত্যার জন্য পর পর দু' বার চারজন করে গুপ্ত ঘাতক পাঠানো হয়েছিলো। ওরা খাঁটি আরবী বলতে পারতো। গিয়েছিলো ওরা মুসলমানদের পোশাকে। কেউ চেনার কথা ছিলো না তাদেরকে। কিন্তু ওরা সবাই মারা পড়ে রহস্যজনকভাবে। সেই খালিদ ইবনে ওয়ালিদই এখন আমাদের শত্রু দলের সালার– বলতে বলতে রোতাস বাইরের পানে তাকিয়ে বললো, ওই দেখুন আমি আপনাকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দেখাচ্ছি।'

লিজাকে রোতাস প্রাচীরের বুরুজের কাছে নিয়ে গেলো। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে দুই ঘোড়সওয়ার আগে আগে যাচ্ছে। পেছনে আরো আট দশজন ঘোড়সওয়ার।

'সামনের দুই সওয়ারের মধ্যে ডানের জন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)– রোতাস বললো– বামে যে তার নাম ইয়ায। এও সালার। এত দূর থেকে আপনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না। কাছ থেকে দেখলে দুশমন

হওয়া সত্ত্বেও অজান্তেই বলে উঠবেন, তার চেহারায় খোদা তার প্রতিচ্ছবি সাজিয়ে দিয়েছেন। দেখে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবেন না। ইনি মুসলমানদের সেই জেনারেল ও সালারদের একজন যারা বিজয় শব্দ ছাড়া পরাজয় শব্দের সঙ্গে পরিচিত নয়।'

'তাহলে কি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ হলব বিজয় করে নেবেন ?'

'আমি আপনার মনোবল ভাঙ্গতে চাই না। আমরা জান দিয়ে দেবো। তবে হলব বাঁচাতে হলে এ শহরের অর্ধেক অধিবাসীকে জানবাযী রেখে লড়তে হবে।'

রোতাসের বয়স পয়ত্রিশ সাইত্রিশ হবে। লিজার চেয়ে তিন চার বছরের ছোট। তবুও লিজাকে তার চেয়ে অনেক কম বয়সী মনে হয়। রোতাস কথা বলছিলো আর লিজা বার বার তার চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলো। তার মুখ হাসি হাসি। প্রশ্রয়ের সুক্ষ্মতম আমন্ত্রণ। হঠাৎ লিজা রোতাসের বাহু ধরে এক দিকে হাটতে লাগলো। রোতাসও গৃহ পালিত পশুর মতো তার পেছন পেছন চলতে লাগলো। এমনিতেও রোতাস লিজাকে হেরাকলের স্ত্রী হিসেবে বেশ সম্মান করতো।

'ঐ যে দেখুন– রোতাস এক জায়গায় দাড়িয়ে বাইরের অবরোধের দিকে ইংগিত করে বললো– এক সওয়ার দল যাচ্ছে.... হয়তো সে স্থানে তাজাদম কোন দল আসবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মুসলমানরা আস্তে আস্তে অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে।'

প্রায় এক হাজার ঘোড়সওয়ার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর হুকুমে অবরোধের জায়গা থেকে সরে এক দিকে সরে যাচ্ছে। রোতাস ও লিজা দেখলো, দলটি ক্রমেই পাহাড়ের ভেতরে যাচ্ছে। রোতাসের চেহারা ঝলমল করে উঠলো। রোতাসের এ মুখ লিজার বড় ভালো লাগলো। এমনিতে রোতাসের সঙ্গে লিজার খোলামেলা কোন সম্পর্ক ছিলো না। ইনথিউনিস লিজার ঘরে থাকলেই কেবল রোতাস লিজার ঘরে যেতো কেবল ইনথিউনিসের সঙ্গে কাজের কথা বলতে।

'একা একা থাকতে থাকতে আমি বড় হাপিয়ে উঠেছি– লিজা অসংকোচে বললো– শহরের ঐ কবীলার মেয়েদের সঙ্গেও মিলতে পারি না। আমি কোন পরিবেশ থেকে এসেছি তা তোমরা জানো। ইনথিউনিস রাত দিন দৌড়ঝাপ করেই কাটায়। আর যখন আসে ক্লান্ত-ভাঙ্গা দেহ নিয়ে গভীর ঘুমে ডুবে যায়। আজ তো আমি আর থাকতে না পেরে প্রাচীরের ওপর গিয়েছিলাম। তোমাকে

পেয়ে কত যে ভালো হলো। তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে গেলে কি পছন্দ করবে তুমি?'

রোতাস কিভাবে না করবে? আর সে তো ঘরেই যাচ্ছিলো। সে রাজী হয়ে গেলো।

ঘরে নিয়ে রোতাস লিজাকে খুব সম্মান করে বসিয়ে নিজে একটু সরে বসলো। কিন্তু লিজা তার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলো এবং এক হাতে রোতাসের কোমর জড়িয়ে ধরলো। রোতাস হেসে এক দিকে সরে যেতে চাইলো। কিন্তু লিজার হাত আরো শক্ত হয়ে বসে গেলো তার কোমরে। রোতাস তো কল্পনাও করেনি লিজা তার সঙ্গে এমন অসংকোচ আচরণ করবে। রোতাস তো বাচ্চা নয়। লিজার মনোভাব বুঝতে পেরে সে শিউরে উঠলো।

'আমি অন্তর দিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করি– রোতাস বললো– তা ছাড়া আমি নিজেও শাহীখান্দানের। এজন্য আমি জানি আপনি কেমন সম্মানিত। আপনি শাহী খান্দানের আবরু এটা আমি ভুলে গেলেও এটা তো আমি ভুলতে পারবো না যে, আপনি আমার জেনারেল ও কমান্ডারের বন্ধু।'

'রোতাস! আমি তো ইনথিউনিসের মালিকানাভুক্ত নই। এ মুহূর্তে তুমিই আমার বন্ধু এবং তুমিই আমার সঙ্গী। আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। আমি হেরাকলেরও স্ত্রী নই এবং ইনথিউনিসেরও বন্ধু নই। এখন আমি শুধুই লিজা। সসম্মানে নয় আদর দিয়ে আমাকে লিজা বলো।'

'তাহলে লিজা! এটা ভেবে দেখো, গির্জায় পাদ্রীরা প্রতিদিন প্রার্থনা করেন। একটি কথাই গির্জায় সবসময় বলা হয় যে, আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো পাপ থেকে তাওবা করা এবং আর কোন পাপ না করা।'

'আমার পুরো অস্তিত্বটাই পাপ– লিজা বললো– ইরানের শাহী খান্দান থেকে বড় মনোলোভা পাপ হয়ে হেরাকলের শাহী খান্দানে এসেছিলাম। কিন্তু সেই পাপ করতে ব্যর্থ হই আমি। তারপর হেরাকল আমাকে বিয়ে করে যখন হেরেমে নিক্ষেপ করে তখন আমি আরেকটি পাপ করি।'

লিজা রোতাসকে বিস্তারিত শোনালো, ইনথিউনিসের সঙ্গে তার কি করে সম্পর্ক হলো এবং তাদের গোপন পরিণয় কেমন ছিলো। আর ইউকেলিস যে হেরাকলের ছেলে নয় ইনথিউনিসের ছেলে তাও জানালো।

'তুমি তো ভাবছো, ইনথিউনিস যে ঈসা মাসীহের সালাতানাত প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছে আমিও বুঝি এমনই চিন্তা ভাবনা করছি! ইনথিউনিসও ভাবছে

আমিও তার মতো সংকল্প করেছি। কিন্তু রোতাস! আমি তোমাকে সত্য কথা বলে দিচ্ছি, আমি আমার একমাত্র ছেলে ইউকেলিসকে হেরাকল ও কস্তন্তীনের হাতে কতল হওয়া থেকে বাঁচাতে এসেছি ইনথিউনিসের সঙ্গে।'

হেরাকল ও কস্তন্তীন যে ইউকেলিসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং ইনথিউনিস তাকে বাঁচিয়ে এনেছে এ ঘটনাও লিজা রোতাসকে জানালো।

'এসব কথা শুনে আমি খুব একটা হয়রান হচ্ছি না– রোতাস বললো– শাহী খান্দানে এ ধরণের ঘটনা ঘটেই থাকে। একজনের স্ত্রী অন্যজনের গোপন সঙ্গীনী। বাদশাহর পুত্র বাদশাহর অন্যান্য স্ত্রী বা রক্ষিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক– এসব মামুলি ব্যাপার। আমি তো বলবো, এ চরিত্রের কারণেই বর্তমান বাদশাহদের পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে। ইরান ও রোমের মতো শ্রেষ্ঠ দুই পরাশক্তি আরবের সাধারণ যোদ্ধাদের কাছে হেরে যাবে এটা কি তুমি ভাবতে পেরেছিলে ? মুসলমানদেরকে দেখেছি আমি। তাদের মধ্যে ভোগ বিলাসের সামান্যতম আগ্রহও নেই। তাদের চরিত্র পাহাড় ফেটে বেরিয়ে আসা স্বচ্ছ ঝর্ণার মতো টলটলে। এটাই তাদের আসল শক্তি যার সামনে কোন যুদ্ধ শক্তি দাঁড়াতে পারে না। আমার একটি পরামর্শ শোন লিজা! এখনো তুমি অনেক পাপ থেকে বাঁচতে পারো। ইনথিউনিসকে নিয়ে তুমি গির্জায় গিয়ে তাকে ধর্ম সম্মতভাবে বিয়ে করে ফেলো।'

'তুমি আমার কথা কেন বুঝছো না রোতাস! – লিজা তিক্ত গলায় বললো– তুমি যেমন ভাবছো ইনথিউনিসের সঙ্গে আমার তেমন ভালোবাসার সম্পর্ক নেই। হেরাকল যখন আমাকে ছুড়ে ফেললো তখন তাকে ধোকা দেয়ার জন্য এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ইনথিউনিসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম। সবার মতো আমার মধ্যেও তো যৌবনের তীব্রতা আছে। এ কারণেই আমার একমাত্র ছেলেকে খুন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ইনথিউনিসের সঙ্গে পালিয়ে এসেছি।'

'তারপরও আমাদের ইনথিউনিসের ঈসা মাসীহের সালতানাত প্রতিষ্ঠার সংকল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিত। তাকে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।'

'তুমি এত কম বুদ্ধির রোতাস! – লিজা বিদ্রুপাত্মক গলায় বললো– গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারের এত কম বুদ্ধি থাকা উচিত নয়। পরাজয়ের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে সে মতে ভেবে দেখো, ইনথিউনিস এমন এক স্বপ্ন

দেখছে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। যে মুসলমানরা পারস্য ও রোমের মতো বাদশাহীকে পিষে ফেলেছে, ইনথিউনিস এ অনভিজ্ঞ কিছু গোত্রযোদ্ধাদের নিয়ে কি করে সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে টিকে থাকবে। সংরক্ষিত কেল্লায় আমরা অবরুদ্ধ না হয়ে যদি খোলা ময়দানে লড়াই করতাম তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মুসলমানরা তাদের পক্ষে ফয়সালা করে নিতো।'

'এত হাতাশা লিজা! ইনথিউনিস ও ইউকেলিসের সঙ্গেও তুমি এধরনের কথা বলো?

'না। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় না— লিজা রোতাসকে আরো কাছে টেনে ফিস ফিস করে বললো— এখন কি এ বিষয়ে কথা না বললে চলে না? ...... তুমি কি এখনো আমাকে বুঝতে পারোনি?'

রোতাস তো কোন মুণি ঋষি নয়। যৌবনে টগবগে পুরুষ। লিজার জালে পা না দিয়ে তার আর উপায় ছিলো না।

লিজা যখন রোতাসের কামরা থেকে বের হচ্ছিলো তার চোখে মুখে অনুতাপ তো দূরের কথা পরিতৃপ্তির ঔজ্জল্য ছিলো।

'ভেবে দেখো লিজা! যদি ইনথিউনিস আমাদের এ সম্পর্কের কথা জানতে পারে তাহলে কি হবে?' রোতাস জিজ্ঞেস করলো।

'খুব খারাপ হবে। ইনথিউনিস হয়তো তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তাকে আমরা জানতেই বা দেবো কেন?'

মৃদু হাস্যে দু'জন দুই দিকে চলে গেলো।

✪ ✪ ✪

অবরোধকারী মুজাহিদরা এবার শহরের ভেতর জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপ করছে। কিন্তু আবাদী শহর প্রাচীর থেকে দূরে থাকায় তীরগুলো বেকার যাচ্ছিলো। একদিন এক মুজাহিদ এক দিকের প্রাচীরের ভেতর কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলো কিন্তু সেদিকে প্রাচীরের কাছে উঁচু কোন গাছ বা টিলা টক্কর নেই। এসব তাঁবুতে বিভিন্ন গোত্র থেকে আসা শরনার্থী ও যোদ্ধারা থাকে। এর আগে এগুলোতে থাকতো রোমীয় সৈন্যরা। এছাড়াও শরণার্থী এত বেশি আসতে শুরু করে যে, মুসলিম প্রশাসনও বেশ কয়েকটি তাঁবু স্থাপন করে দেয়। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, শরণার্থীরা অস্ত্র সমেত শহরে প্রবেশ করছে।

সেই মুজাহিদ এ খবর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কে জানালো যে, প্রাচীরের অমুক দিকে কয়েকটি তাঁবু আছে সেখানে জ্বলন্ত তীর পৌছানো সম্ভবও হতে পারে। খবর পেয়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আয়ায ইবনে গানম (রা) সেই গাছে চড়ে শহরের ভেতরের তাঁবুগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন।

'খোদার কসম ইবনে গনম! – খালিদ (রা) আনন্দিত গলায় বললেন– শহরে আমরা দারুণ ভীতি ছড়াতে পারবো। শহরে যদি আমরা আতংক ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে মনে করো আমাদের অর্ধেক বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে।'

'সিপাহসালার! – আয়ায ইবনে গনম (রা) বললেন– আল্লাহর অসীম কৃপায় বিজয় আমাদেরই হবে। শহরে কোন ফৌজ নেই মানুষের ভীড় ছাড়া। ওদেরকে ধোকা দেয়ার একটা কৌশল আমার মাথায় এসেছে। আমরা দেখাবো যে, আমরা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আসলে অবরোধ উঠাবো না আমরা। সওয়ারের একটি দল এখান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং আমাদের কর্ম তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে শহরের লোকেরা মনে করে। আমরা হতাশ হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছি।'

'খোদার কসম ইবনে গনম! – খালিদ (রা) আয়ায (রা) এর কাঁধে হাত রেখে বললেন– তুমি আমাকে আলোর মুখ দেখিয়েছো। এসো, দুজন কোথাও বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি।'

একটু পর শহরের ভেতর যেদিকে তাঁবুর পল্লী সেদিকের প্রাচীরের কাছে বেশ কয়েকজন তীরন্দায পৌছে গেলো। তবে প্রাচীরের ওপর থেকে আসা তীর বৃষ্টি থেকে তারা নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান নিয়েই জলন্ত তীর ভেতরে ছুড়তে লাগলো। দুই ঘোড়সওয়ার তো কারো হুকুমের পরওয়া না করে একেবারে প্রাচীরের কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে তীর ছুড়তে শুরু করলো। শহরের ওপর থেকে তাদের ওপর শত শত তীর আসতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেফাজত করলেন। তবে তাদেরকে দেখে যখন আরো কয়েকজন ঘোড়সওয়ার তীর নিয়ে প্রাচীরের কাছে চলে গেলো তখন ওপর থেকে কয়েকগুণ বেশি তীর আসতে লাগলো। এতে তিন চারজন সওয়ার সহজেই তীরের নিশানা বনে গেলো। আয়ায ইবনে গনম (রা) বাকী সওয়ারদের ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন।

অবশ্য আর তীরান্দাযীর প্রয়োজনও নেই। কারণ প্রাচীরে মোতায়েনকৃত তীরন্দাযদের মধ্যে আগুণ আগুণ বলে শোরগোল উঠলো। চার দিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেলোা। প্রাচীরের তীরান্দাযরা ঘাবড়ে গিয়ে আগুণ নেভাতে প্রাচীর

থেকে নেমে পড়লো। এতে প্রাচীরের কয়েক জায়গা খালি হয়ে গেলো। মুজাহিদরা এ সুযোগটা নিলো। কয়েকজন মুজাহিদ প্রাচীরে রশি লাগিয়ে রশি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু ডান ও বাম দিক থেকে অসংখ্য তীর এসে তাদেরকে নিচে ফেলে দিলো। তারা ব্যর্থ হলেও তাদের এ বীরত্ব ও শাহদাতের জযবা দেখে মুজাহিদদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো।

এরপর মুজাহিদরা কয়েকবার গভীর রাতে কুঠার দিয়ে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করলো। কিন্তু এবার ওরা ওপর থেকে জলন্ত মশাল নিক্ষেপ করে মুজাহিদদের এ প্রচেষ্টাও নষ্ট করে দিলো।

✪ ✪ ✪

একদিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) প্রায় এক হাজার ঘোড়সওয়ারকে অবরোধ থেকে সরিয়ে নিলেন। রোতাস ও লিজা এদেরকেই প্রাচীরের ওপর থেকে চলে যেতে দেখে ভেবেছিলো, মুসলমানরা হয়তো হতাশ হয়ে আস্তে আস্তে অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে।

খালিদ (রা) শুধু সওয়ারদেরই সরালেন না, কেল্লা দখলের সব ধরনের কর্ম তৎপরতাও বন্ধ করে দিলেন। তারপর অবরোধের আরেক দিক থেকে আরো এক হাজার সওয়ারকে পাহাড়ের ভেতর সরিয়ে ফেলা হলো। আর অন্যান্য মুজাহিদরা বেশিরভাগই তাঁবুর ভেতর সময় কাটাতে লাগলো। অবশ্য মাঝে মধ্যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) ও আয়ায ইবনে গনম (রা) কে কেল্লার চার দিকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে দেখা যেতে লাগলো।

কেল্লার ভেতর। ইনথিউনিস এখন খুব খুশী। আগাম বিজয়ের অনুভূতি তাকে আরো চাঙ্গা করে তুললো। তবুও দু'দণ্ডের জন্য কোথাও তার বসার সময় নেই। কখনো কবীলার সরদারদের একত্রিত করে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতেন। কখনো কেল্লার নিচে এসে লোকদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ শোনাতেন। আর রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিয়ে বলতেন, মুসলমানদের আমরা এখান থেকে পালাতে দেবো না। লাশ বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হবো। আর যারা জীবিত থাকবে তাদেরকে জানোয়ারের মতো বাঁচিয়ে রাখবো।

ইনথিউনিসের দুনিয়ায় এখন ঈসা মাসীহের সালতানাত প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নেই। লিজা ইউকেলিসের কোন অস্তিত্ব সেখানে নেই। লিজার দুনিয়াতেও ইনথিউনিস এখন শুধু স্মৃতি। তার জায়গায় এখন রোতাস এসেছে।

আর ইউকেলিস এমন জযবায় ডুবে আছে যে, তার নাওয়া খাওয়ার খবরও নেই। তার সঙ্গে লিজা সেই কবে কথা বলেছে তাও যেন তার মনে নেই।

ঐদিকে জ্বলন্ত তীর দিয়ে তাঁবুতে যে আগুণ লেগেছিলো। তাতে শহরবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আগুণ লাগার পর যারা তাঁবুগুলো থেকে বের হতে পারলো। তাদের মধ্যেও অনেকে আহত হলো। আর যারা বের হতে পারলো না তারা জীবন্ত দগ্ধ হলো। শহরবাসী এতে এত ভয় পেলো যেন মহা প্রলয় নেমে এসেছে। তারপরও কয়েকটা অন্যরকম আওয়াজ উঠলো যে, অবরোধ উঠিয়ে দাও অথবা শহর মুসলমানদেরকে হাওলা করে দাও। আজ আমাদের তাঁবুতে লেগেছে আগুণ। কাল তো আমাদের ঘরে আগুন লাগবে।

ইনথিউনিস, রোতাস ও ইউকেলিস সেখানেই অন্যদের মতো ছুটাছুটি করছিলো। তাদের কানেও এই আওয়াজ গেলো। ইনথিউনিস উঁচু আওয়াজে লোকদের মনোবল ও জযবা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতা শুরু করে দিলেন।

'মুসলমানরা অবরোধ সফলের ব্যপারে হতাশ হয়ে গেছে' – ইনথিউনিস বললেন– এখন তারা কিছু সৈন্য উঠিয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে সবাই চলে যাবে। একথা কখনো তোমরা মুখে আনবে না যে, শহর মুসলমানদের কাছে হাওলা করে দাও।'

আরো অনেক কিছু বলে ইনথিউনিস শহরের লোকদের উত্তেজিত করে তুললেন, তারপর ইউকেলিসকে কিছু বলার জন্য ইংগিত করলেন।

'হে ক্রুশের রক্ষকরা! – ইউকেলিস উঁচু আওয়াজে বললো– আমার বয়স দেখো। একি হেসে খেলে কাটানোর বয়স নয়? আমার একটি বাহুও নেই। তারপরও তোমরা দেখছো। আমার আরাম আয়েশ সব শেষ হয়ে গেছে। নাওয়া খাওয়ার কথাও ভুলে গেছি। তোমরা দেখতে পাবে এক হাতেই আমি কি করে লড়াই করছি। আমি তোমাদের সন্তান। তোমাদের ইযযত ও আবরু রক্ষার জন্যই আমি শাহী মহল ছেড়ে এসেছি।'

লোকেরা আশ্বস্ত হয়ে যার যার ঠিকানায় চলে গেলো। আর তাঁবুর আগুণ থেকে যারা বাঁচতে পেরেছিলো তারা নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের খুঁজতে লাগলো।

পর দিন সকালে লোকেরা আবার পুড়ে যাওয়া তাঁবুগুলোর কাছে গিয়ে ভিড় করতে লাগলো। সেখানে তারা যে দৃশ্য দেখলো তা তাদেরকে হতবিহবল করে দিলো। পুড়ে যাওয়া তাঁবুগুলোর আশে পাশে দীর্ঘ লাইনে অগ্নি দগ্ধদের লাশ

রাখা হয়েছে। যুবক, বৃদ্ধ শিশু ও মহিলাসহ সব শ্রেণীর মানুষের লাশ রয়েছে এখানে। একটি লাশও চেনা যাচ্ছিলো না।

গতকাল ইনথিউনিস ও ইউকেলিস লোকদের মন থেকে যে শোক-আতংক দূর করে দিয়েছিলো আজ যেন তা আরো বহুগুণে তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে। চার দিকে কান্না আর আর্তনাদের শব্দ। বাচ্চা বুড়ো সবার চোখেই শোকাহত অশ্রু।

'কোথায় আমাদের রোমী জেনারেল? গলা ফাটানো এক অওয়াজ উঠলো– পুড়ে মরেছে তো আমাদের সন্তানরা। যা জ্বলেছে তা তো আমাদেরই জ্বলেছে। কেল্লা থেকে মুসলনাদের ওপর কেন হামলা করা হচ্ছে না?'

এর সমর্থনে সমস্বরে আরো আওয়াজ উঠলো, ইনথিউনিস এসব খবর পেয়েই রোতাসকে নিয়ে দৌড়ে এলো। লোকেরা তাকে দেখে জোর শ্লোগান দিতে লাগলো। কেউ কেউ বলে উঠলো, এ রোমী জেনারেল তো এখানে বাদশাহ হওয়ার জন্য এসেছে।

ইনথিউনিস বহু কষ্টে লোকদেরকে শান্ত করলেন এবং বললেন, প্রাচীরের বাইরে গিয়ে দেখো, অবরোধ এমনিই উঠে যাবে।

'না, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারবো না। বাইরে গিয়ে সবাই লড়াই করবো'– এক যোদ্ধা বললো।

ইনথিউনিস ও রোতাস তাদেরকে অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, বাইরে বের হয়ে লড়ার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু লোকজন তাদের দাবী থেকে সরতে রাজী হলো না।

'হে রোমী জেনারেল! – এক প্রৌঢ় সরদার বললো– মুসলমানদের সঙ্গে আমরা দুশমনী রাখতে চাই না। তোমরা বাইরে বের হয়ে যদি অবরোধ ভাঙ্গতে চেষ্টা না করো তাহলে আমরা নিজেরাই দরজা খুলে দেবো।'

'তোমরা জাহেল আর আহমক ছাড়া কিছুই না– ইনথিউনিস যেন গর্জে উঠলেন– তোমরা মুসলমানদের জন্য নয় ইসলামের জন্য দরজা খুলে দেবে। মুসলমানরা শহরে এসেই সবার আগে তোমাদেরকে ইসলাম কবুলের হুকুম দেবে। তখন তোমাদের ধর্মই নয় শুধু তোমাদের রূপসী স্ত্রী কন্যাদেরও হাতছাড়া করতে হবে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে তোমরা বাঁচতে পারবে না।'

'হে ক্রুশের পুজারীরা! – রোতাস উচু আওয়াজে বলতে লাগলো– তোমরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দরজা খুলতে চাও এবং যাদের আনুগত্য মেনে নিতে

চাও তাদের জুলুমের উদাহরণ হিসেবে দেখে নাও তোমাদের সামনে রাখা জ্বলন্ত লাশের দীর্ঘ সারি। তোমাদের দূধের বাচ্চাকেও তো ওরা রেহাই দেয়নি। তোমরা ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে প্রতিটি খ্রিষ্টান পরিবারকে ওরা হত্যা করবে।'

'হে রোমী অফিসার ! – এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন– যেখানে লড়াই হয় সেখানে শিশুরাও আক্রান্ত হয়। তোমরা ভুলে গেছো। রোমী আর ইরানী ফৌজ যেখানে গিয়েছে সেখানেই নির্বিচারে হত্যা করেছে। নিঃস্পাপ শিশুদেরকেও তারা নিজ হাতে কতল করেছে। যুবতী ও কিশোরীদেরকে বেআবরু করে হত্যা করেছে। মুসলমানদেরকে তো আমরা নিজেরা শত্রু বানিয়েছি। আমরা রোমীদের সাহায্যের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম। অথচ ওরা লড়ার আগেই পালিয়েছে। যদি আমাদের নারী ও শিশুদের প্রতি তোমাদের এত সহানুভূতি থাকে বাইরে বের হয়ে হামলা করো। দেখবে বাচ্চারা পর্যন্ত লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে।

সমস্বরে সবাই এর সমর্থনে শ্লোগান দিয়ে উঠলো। এর মধ্যে আরেক লোক এগিয়ে এসে সবার উদ্বেগ আতংক আরো বাড়িয়ে দিলো।

'বিপদ তো আরেকটি আসছে। শহরে খাবারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ পড়ে যাবে। ঘোড়া উটসহ অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের জন্য দানা পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের আগে এগুলো মরবে। এভাবে ছটফট করে মরার চেয়ে লড়াই করে জান কুরবান করে দেয়া কি ভালো নয় ?'

ইনথিউনিস ও রোতাস যেন বোবা বনে গেলো। তাদের মাথায় ছিলো শুধু যুদ্ধ আর অবরোধ। তারা কখনো ভাবেনি যুদ্ধের আরো বিভিন্ন দিক আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শহরে খাবার মজুদ করে রাখা। সেটা তারা করেনি। ইনথিউনিস তখনই কবীলা সরদারদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। সরদাররা সর্বসম্মত ফয়সালা দিলো, আমরা যদি এ জন্য অপেক্ষা করি যে, অবরোধ আপনাআপনি উঠে যাবে তাহলে শহরের লোকেরা দুর্ভিক্ষে পড়ে নিজেরাই দরজা খুলে দেবে। তাই বাইরে বের হয়ে হামলা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ইনথিউনিস সরদারদের বললেন, যারা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হোক। তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হবে।

✪ ✪ ✪

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) সালার আয়ায ইবনে গানম (রা) এর সঙ্গে পরামর্শ করে শহরের বাইরে আরেক দিক থেকে একদল ঘোড়সওয়ার সরিয়ে নিলেন। প্রাচীরের ওপর থেকে ইনথিউনিস রোতাস ও কবীলার কয়েকজন সরদার এ দৃশ্য দেখলো যে, এক দিক থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, খুশীতে তারা প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

'আমরা আর অপেক্ষা করবো না– ইনথিউনিস চূড়ান্ত ফায়সালা শোনালেন– কাল সকালে ঐ দিকের দুটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর মুসলমানদের আমরা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।'

পর দিন সূর্যোদয় হতেই আচমকা শহরের দুটি দরজা খুলে গেলো। শহরের লোকেরা বর্শা তলোয়ার, নেযা নিয়ে এমন ঝড়গতিতে বের হলো যেন বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছাস। মুসলমানদের অবস্থা তখন এমন ছিলো যেন এমন হামলা রোখার মতো ক্ষমতা নেই। যেন পাল্টা হামলা চালানোর মতো পূর্ব প্রস্তুতিও তাদের ছিলো না। এ ছিলো আসলে তাদের ভান। কারণ মুসলমান সালাররা মুজাহিদদের সবসময় যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একথাও বলে দেন যে, তারা এমনভাবে চলাফেরা করবে যেন তাদের ওপর ক্লান্তি ও হতাশার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে।

ইনথিউনিস হামলার পরিকল্পনা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করেন। হামলাকারীদের তিনি ডান ও বাম পার্শ্বস্থ দুই ভাগে ভাগ করে দেন। যাতে পশ্চাৎদিক অরক্ষিত হয়ে না পড়ে। এক ভাগের নেতৃত্বে ইনথিউনিস নিজে থাকেন। আরেক ভাগের নেতৃত্ব দেন রোতাসের হাতে। ইউকেলিস রয়ে যায় রোতাসের সঙ্গে।

ঢিলেঢালা আলসেমীর ছদ্মবেশী মুজাহিদরা যখন হামলা রুখতে উঠে দাঁড়ালো হামলাকারীদের তখন মনে হলো কঠিন কোন পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে।

তুমুল লড়াই শুরু হলো। ইনথিউনিস ও রোতাস তার লশকরকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক ফৌজের মতো লড়াতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ওরা ছিলো এক হুলুস্থুলে হামলাকারী। যারা শুধু বুঝতো একটা কথা, মুসলমানদের হত্যা করা। কিন্তু কবীলা যোদ্ধারা নিজেরাই মরতে লাগলো।

মুসলমানরা শহরের দরজা কব্জা করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু ইনথিউনিসের নিপুণ সৈন্যবিন্যাসের দরুণ তা সম্ভব হচ্ছিলো না। ইনথিউনিসও এটা বুঝে গেলেন যে, মুসলমানদেরকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। তিনি তার

লশকরকে শহরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সরদারদের সহায়তায় ওদেরকে লড়াই থেকে বের করে আনা হলো। মুজাহিদরা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরের লোকেরা এটাও দেখার সুযোগ পেলো না যে, বাইরে তাদের আরো যোদ্ধা রয়ে গেছে। প্রাচীরের কাছে গিয়ে ওরা লড়াই অব্যাহত রাখলো। এতে মুজাহিদরা খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না। ওপর থেকে তীরন্দায ও বর্শাবাজরা তাদের ওপর তীর ও বর্শার বৃষ্টি শুরু করে দিলো। এতে মুজাহিদরা বেশ হতাহতের শিকার হয়ে ফিরে এলো এবং দুশমন নিরাপদে শহরে পৌঁছতে পারলো।

প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে গোত্র যোদ্ধারা দেখতে পেলো, ময়দানে অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। বহু যখমী কাতরাচ্ছে। এ দৃশ্য তাদের মনোবল আরো বাড়িয়ে দিলো। ইনথিউনিস ঘোষণা দিলেন, এর চেয়ে আরো জোরদার হামলা করা হবে আবার।

ওদিকে মহিলারা শহরে ফিরে আসা যোদ্ধাদের মধ্যে নিজেদের ভাই, স্বামী পুত্রদের খুঁজে ফিরতে থাকে। লিজাও ইউকেলিস ইউকেলিস বলে ছুটাছুটি করতে থাকে। কোথাও তার ছেলেকে দেখা যাচ্ছে না। পাগলের মতো সে প্রাচীরের ওপরে গিয়ে শহরের দিকে ফিরতেই দেখতে পায়, ইউকেলিস রোতাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। লিজা ছুটে গিয়ে ইউকেলিসকে এমনভাবে ঝাপ্টে ধরলো যেমন চিল তার শিকারকে থাবা দিয়ে ধরে নিয়ে যায়।

ইউকেলিসের সন্ধানে আরেকজন হন্যে হয়ে ঘুরছিলো। সে হলো অসম্ভব রূপসী মেয়ে রোজী। একেই কস্তন্তীনের হাত থেকে ইউকেলিস বাচায় এবং হলবে এসে এ মেয়েকে পেয়ে তার সঙ্গে সুদৃঢ় প্রেমের সৌধ গড়ে তুলে।

রোজীও প্রাচীরের ওপর থেকে ইউকেলিসকে লিজার সঙ্গে দেখতে পেয়ে সেদিকে দৌড়ে যায়। ইউকেলিস রোজীকে দেখতে পেয়ে মায়ের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রোজীকে তার বাহুবেষ্টনীতে নিয়ে নেয়।

ওদিকে শহরের বাইরে মুজাহিদরা শহীদদের লাশ উঠাচ্ছে। আর যখমীদের দেখভাল করছে মেয়েরা। এরা মুজাহিদদেরই স্ত্রী, বোন বা মেয়ে। এদেরকে রাখা হয়েছিলো অবরোধ থেকে বেশ দূরের এক তাঁবুতে। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে শারীনাও আছে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সে আহতদের পানি পান করাচ্ছে এবং উঠিয়ে উঠিয়ে ডাক্তারের তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছে।

মুজাহিদদের মোটমুটি ক্ষয়ক্ষতি হলেও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) বিচলিত হলেন না। যদিও হতাহতের সংখ্যা কম ছিলো না। আগে যেখান থেকে অবরোধের সৈন্য উঠিয়ে এনেছিলেন সেখানে এবার অন্যদিক থেকে কিছু সৈন্য মোতায়েন করলেন। এছাড়া, তিনি অন্যকোন পদক্ষেপ নিলেন না। আর মুজাহিদদেরকে আগের মতোই গা ছাড়া ভাব নিয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন।

উভয় পক্ষই আবার পরবর্তী হামলার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। হতাহতও কোন পক্ষের কম হয়নি। তাই কিছু সময় নেয়া দু' পক্ষের জন্য জরুরী। শহরে এখন পরবর্তী হামলার জোর প্রস্তুতি চলছে। নবীন ছেলেরাও লড়াইয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। পিছিয়ে থাকছে না মেয়েরাও।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) মুজাহিদদের সরাসরি কোন দিক নির্দেশনা দিতে চাইলে ফজরের নামাযের পর দিতেন। তিনি মুজাহিদদের গুরু দায়িত্ব স্মরণ করাতে গিয়ে অধিকাংশ সময় বলতেন,

'আল্লাহর সালতানাতের কোন সীমাপরিসীমা নেই। আর জিহাদ আল্লাহর নামেই হয়ে থাকে। তিনিই দেবেন এর প্রতিদান।' আবার কখনো বলতেন, 'দুআ ছাড়া আমল এবং আমল ছাড়া দুআ যেন পানিবিহীন চারা গাছ পরিপালন করা। যা কিছু দিন পর নিশ্চিত খড়কুটায় পরিণত হবে।'

লড়াইয়ে কয়েকজন কবীলা যোদ্ধা বন্দী হয়। সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাদের মাধ্যমে শহরের অবস্থা জানতে পারলেন যে, শহরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন পর অবস্থা দুর্ভিক্ষের দিকে মোড় নেবে। তাছাড়া  স্থানীয়রা চাচ্ছে অতি দ্রুত অবরোধ উঠে যাক। কিছু লোক তো মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিতেও রাজী। এটা জানার পর খ্যালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর আক্রমণের পরিকল্পনা করা সহজ হয়ে গেলো।

শহরের ভেতরও পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হচ্ছে। ইনথিউনিস ও রোতাস দুদিন পর সকাল সকাল হামলার সিদ্ধান্ত নিলো। এ হামলা হবে চূড়ান্ত হামলা। মামুলি যখমীরাও সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওরা এখন আরো দ্বিগুণ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ইউকেলিস ইনথিউনিস ও রোতাসকে না জানিয়ে তার মতো যুবকদেরকে নিয়ে জানবায এক দল প্রস্তুত করলো। এরা সবাই ঘোড় সওয়ার। এরা শপথ করলো। হামলা করে মুসলমান সিপাসালারকে জীবিত বা মৃত কেল্লার ভেতর

ধরে আনবে। সিপাহসালার মুহাফিজদের বেষ্টনীতে থাকে। ওরা জানে এজন্য ওদের বড় রক্তক্ষয়ী লড়াইতে নামতে হবে।

হামলার একদিন আগেই ইউকেলিস তার মা লিজার কাছ থেকে বিদায়ী দুআ নিয়ে নিলো। সে তার গুপ্ত জানবায দলের কথা মাকে জানিয়ে বললো, এখন থেকে দলকে তৈরি করতে হবে। তাই সে হামলার পর ঘরে ফিরবে। মা তাকে দুআ ও কল্যাণমাখা চুমু দিয়ে বিদায় করলো।

✪ ✪ ✪

বেলা পড়ে আসছে। ইনথিউনিসের প্রয়োজন হলো রোতাসকে। কাউকে না বলে নিজেই তাকে খুঁজতে বের হলেন। কোথাও না পেয়ে রোতাসের ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। রোতাস একলা থাকে। তাই বিনা সংবাদেই তার ঘরের আঙ্গিনায় গিয়ে আওয়াজ দিলেন। ভেতরে থেকে আওয়াজ এলো, কাপড় পাল্টে আসছি। রোতাস যেহেতু একলা থাকে তাই তাড়াহুড়া করে ইনথিউনিস তার কামরার দিকেই এগিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ ছিলো। কিন্তু দরজায় হালকা ধাক্কা দিতেই আড়বিহীন দরজা খুলে গেলো। কামরায় চোখ যেতেই ইনথিউনিসের চেহারা আচমকা নীলবর্ণ হয়ে উঠলো। যেন কোন বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে। সেখানে লিজা খুব দ্রুত কাপড় পরছে। কয়েকটি স্পর্শকাতর অঙ্গ এখনো নিরাবরণ। রোতাসও আলুথালু অবস্থায় কাপড় পরছিলো। ইনথিউনিস যেন ভুলেই গেলেন, আগামীকালই মুসলমানদের ওপর চূড়ান্ত হামলা চালানো হবে। তলোয়ার বের করে রোতাসকে চ্যালেঞ্জ করলেন–

'তলোয়ার নিয়ে ঘরের বাইরে এসো। যে জীবিত থাকবে এ নারী হবে তার।'

রোতাস সঙ্গে সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো এবং তলোয়ার নিয়ে ঘরের আঙ্গিনায় চলে এলো। দু'জনের চোখেই খেলা করছে রক্তের নেশা।

লিজা কাপড় পরে বাইরে এসে দেখলো, দুই বন্ধু পরস্পরের রক্তের পিয়াসী হয়ে তলোয়ার চালাচ্ছে। দু'জনেই একে অপরকে আঘাত করার জন্য একটু পেছনে সরলো এবং দু'জনে দিক বদল করলো এমনভাবে যে, দু'জনই নিশ্চিত তার দুশমনকে এ আক্রমণে শেষ করে ফেলবে। দু'জন তলোয়ার বর্শার মতো সোজা করে ধরে একে অপরকে বিদ্ধ করার জন্য ছুটে আসতে লাগলো, ওমনিই লিজা তাদের মাঝখানে এসে তাদেরকে 'থামো' বলে নিরস্ত্র করতে চাইলো। কিন্তু দু'জনে এমন তীব্রগতিতে ছুটে আসছিলো যে, আর নিয়ন্ত্রণ রেখে থামতে পারলো

না। এবং একজনের তলোয়ার বর্শার মতো লিজার পিঠে বিদ্ধ হয়ে গেলো এবং অপরজনেরটা লিজার পেটে ঢুকে পড়লো।

দু'জনে এক ঝটকায় তলোয়ার বের করে ফেললো। কিন্তু লিজা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলো এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো পর মুহূর্তেই। ইনথিউনিস ক্রোধভরা চোখে রোতাসের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে পিছু হটলেন যেন রোতাসের ওপর আবার হামলা করবেন।

'দড়াঁও ইনথিউনিস! – রোতাস তার তলোয়ার সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে বললো– আমরা দুজন এক নারীর পেছনে পড়ে আমাদের নিজেদের অবস্থানই ভুলে গেছি। আমরা কি ঈসা মাসীহের সালতানাত প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিনি? .... আমাকে চাইলে কতল করতে পারো তবে নিজের সংকল্প ভুলো না। এই যে দুঘর্টনায় মারা গেছে এ ছিলো এক বদকার নারী। এক নারীর কারণে আমাদের পরস্পরের দুশমন হওয়ার কোন অর্থ হয় না।'

রোতাসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইনথিউনিস কাঁধ ঝাকিয়ে শ্রাগ করলেন এবং নিজের তলোয়ার কোষবদ্ধ করে রোতাসের তলোয়ারটি মাটি থেকে তুলে তার হাতে দিয়ে তাকে বাইরে যেতে ইংগিত করলেন। বাইরে এসে ইনথিউনিস রোতাসকে বললেন, যা হয়েছে ভুলে যাও। বিজয় আমাদের হলে অনেক মেয়ের স্বাদ চাখা যাবে। দু'জনেই আগের মতো কঠিন ব্যস্ততায় ডুবে গেলো। যেন কিছুই হয়নি কোথাও।

✪ ✪ ✪

সকালে আকাশ ফর্সা হতেই শহরের দু' দিক থেকে দুটি করে চারটি দরজা খুলে গেলো। চার দরজা দিয়ে খুব দ্রুত লশকর বের হতে শুরু করলো। ওদিকে পঞ্চম আরেকটি দরজা দিয়ে ইউকেলিস একশজনের এক জানবায বাহিনী নিয়ে বের হলো। ইনথিউনিস শুধু চারটি দরজা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইনথিউনিসের লশকর এবার ডান ও বাম পার্শ্ব দিয়ে হামলা না করে সরাসরি সোজা হামলা চালালো। ওদের মতো মুজাহিদরাও ভিন্ন কৌশলে লড়তে থাকলো। লড়তে লড়তে মুজাহিদরা পিছু হটতে শুরু করলো। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর এটা এক বিশেষ চাল। অনেক বড় বড় যুদ্ধ শক্তিকে এভাবে পরাজিত করা হয়েছে। ইনথিউনিসরা বুঝতেই পারলো না তার লশকর কেল্লা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়বে।

লড়তে লড়তে এরা যখন শহর থেকে অনেক দূর চলে গেলো তখন শহরের পাশের টিলা পাহাড় থেকে ঘোরসওয়ার মুজাহিদদের বড় একদল বের হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো। এদেরকেই অবরোধ উঠিয়ে এক দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। আর ইনথিউনিসরা ভেবেছিলো, মুসলমানরা অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে।

আচমকা বের হওয়া মুজাহিদদের এক দল চলে গেলো খোলা দরজা দিয়ে শহরের ভেতরে। আরেক দল খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। ওদিকে যে মুজাহিদরা লড়তে লড়তে পিছু হটছিলো তারাও এক যোগে কবীলা যোদ্ধাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। এবার গোত্র যোদ্ধারা দু'দিক থেকে মুজাহিদদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে সমানে কাটা পড়তে লাগলো।

ওদিকে সামান্য কিছু ঝামেলা ছাড়া শহর দখল করতে মুজাহিদদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। শহর দখল করেই তারা বৃদ্ধ শিশু ও নারীসহ অপারগদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো এবং শহরের সবাইকে বড় একটি ময়দানে দাঁড় করানো হলো।

ইউকেলিস তার এক শত জানবায নিয়ে মুসলিম সিপাহসালারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে জানে না, মুসলিম সিপাহসালার রাজা বাদশাহদের মতো যুদ্ধের ময়দানে এক জায়গায় থিতু হয়ে বসে থাকেন না। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তো সারা ময়দান ঘুরে ঘুরে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেন। তার সঙ্গে সব সময় কাসেদ আর মুহাফিজরা ছায়ার মতো লেগে থাকে। ইউকেলিস তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সে ও তার জানবায বাহিনী মুজাহিদদের বেষ্টনীতে পড়ে গেলো এবং এ টগবগে যুবক বাহিনী কচুকাটা হয়ে হয়ে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর ঘোড়া তাদেরকে পায়ে মাড়িয়ে পিষতে লাগলো।

'রোমী দু'জনই মারা গেছে– উচু আওয়াজে কেউ বললো– ইনথিউনিসও নেই রোতাসও কতল হয়ে গেছে।'

পুরো ময়দানে যখন এ আওয়াজ পৌঁছলো খ্রিষ্টান কবীলা যোদ্ধাদের জোশ জযবা নিমিষেই নিভে গেলো। নিজেদের তলোয়ার বর্শা ফেলে দিয়ে চিৎ কার করে বলতে লাগলো। আমরা আর লড়াই করবো না। আত্মসমর্পণ করছি। ওদের ঘোড়সওয়াররাও ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) লড়াই বন্ধ করে দিলেন এবং ঘোষনা করালেন। যারা হাতিয়ার ফেলে দিয়েছে তারা শহরের ভেতর চলে যাবে। তবে নিজেদের ঘরে যেতে পারবে না কেউ।

সবাইকে এক ময়দানে একত্রিত করা হলো। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা), সালার আয়ায ইবনে গনম (রা) সহ অন্যান্য সালাররা প্রধান ফটক দিয়ে বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেন।

'আল জাযীরা তথা সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসীরা! – একটু পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) ময়দানে সমবেতদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন– এ শহর আমরা লড়াই করে নিয়েছি। তোমরাও আমাদের অনেক প্রাণের ক্ষতি করেছো। তোমাদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করার কথা ছিলো কিন্তু আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর নির্দেশিত পথে চলবো। আমাদের রীতি মতে তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা উচিত এবং তোমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার অধিকারও আছে আমাদের। কিন্তু বনু তাগলিব এভাবে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলে আমাদের আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ পাঠান কাউকে ইসলাম গ্রহণে যেন বাধ্য করা না হয়। এর পরিবর্তে জিযিয়া তথা নিরাপত্তাকর আদায় করা হবে। তাই তোমাদের প্রত্যেককে সামর্থ্য অনুযায়ী জিযিয়া দিতে হবে। রোমীয়দের সঙ্গে তোমরা হাত মিলিয়েছিলে। এর শাস্তিও আমরা তোমাদের দিচ্ছি না। তারপরও কি শহরে আমার লোকেরা কোন লুটপাট চালিয়েছে? কোন মুসলমান কোন ঘরে ঢুকেছে?'

'না..... না সিপাহসালার! কোন মুসলমানই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি– অনেকগুলো আওয়াজ উঠলো।

'এমন হবেও না– খালিদ (রা) বললেন– আমরা তোমাদের ইযযত আবরুর মুহাফিজ। কিন্তু কেউ সামান্যতম বিশৃংখলা বা গাদ্দারী করলে তাকে কতল করে দেয়া হবে।'

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হলবের অমুসলিম অধিবাসীদের মনে যে ভয়াবহ আতংক বিরাজ করেছিলো তা দূর হয়ে গেলো খালিদ (রা) এর বক্তৃতার কারণে। সেদিনই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলো।

✪ ✪ ✪

সূর্য পাটে যেতে এখনো বেশ দেরি। মুজাহিদরা শহীদদের লাশ ও যখমীদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের নারীমহল যখমীদের পানি পান করাচ্ছে। উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করছে। শারীনাও কয়েকজন যখমী মুজাহিদকে উদ্ধার করেছে

এ পর্যন্ত। সে এক যুবক যখমীকে দেখে থমকে গেলো। তার মুখে ও মাথায় কোন আঘাত না থাকলেও পুরো দেহ থেকে যেন রক্তের বন্যা নামছিলো।

'আরে, তুমি তো নিশ্চয় ইউকেলিস!– শারীনা তাকে চিনতে পেরে বিস্মিত হয়ে বললো– শাহে হেরাকলের ছেলে এখানে কেন এসেছো .....এ কি বাস্তব না দুঃস্বপ্ন?'

'আমি ইউকেলিস শারীনা! – বলতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠলো ইউকেলিসের গলা– আমি তোমাকে দেখে হয়রান হচ্ছি তুমি এখানে কি করে ?' – ইউকেলিসের আওয়াজ তার কাতরানির শব্দে চাপা পড়ে গেলো।

'চুপ থাকো ইউকেলিস! – শারীনা বললো– এটা কোন কাহিনী শোনা বা শোনানোর সময় নয়। আমি– তুমি কিভাবে এখানে এসেছি পরে শোনা যাবে। এ পানি নাও। তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবো।'

'না শারীনা! আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। জানি না কি করে এখনো আমি বেঁচে আছি। আমাকে টানা হেঁচড়া না করে এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দাও।'

শারীনা পরম মমতায় ইউকেলিসের হাতটি ধরলো। সে এটাই জানে ইউকেলিস তার সতালো ভাই। সে যে ইনথিউনিসের ছেলে তা তো তার জানার কথা নয়।

শারীনা ইউকেলিসকে বললো, সে মুজাহিদদের ডাকিয়ে আনছে। ওরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ইউকেলিস আরো শক্ত করে শারীনার হাতধরে জোরে জোরে মাথা হেলিয়ে নিষেধ করলো কোন ধরণের চিকিৎসা নিতে। কারণ সে এখন বেকার হয়ে গেছে।

ওদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত লাশের মধ্যে ইউকেলিসকে খুঁজে মরছে রোজী। নারীদের ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করে দিয়েছে মুজাহিদরা। কিন্তু রোজী লুকিয়ে ছাপিয়ে শুধু ঘরই নয় শহর থেকেও বেরিয়ে এসেছে। রোজী পাগলের মতো ইউকেলিসকে খুঁজছে। যখমী ও রক্তাক্ত লাশের চেহারা দেখে দেখে সে এগুচ্ছে। এক সময় ইউকেলিসকে পেয়ে গেলো এক মেয়ের পাশে। সে ইউকেলিসের পাশে প্রায় লুটিয়ে পড়লো।

'উঠার চেষ্টা করো ইউকেলিস! – শারীনা তার একটি হাত ইউকেলিসের কাঁধের নিচে নিয়ে গিয়ে বললো– আমরা দুজনে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।'

'ইউকেলিস! উঠো– রোজী বললো।

'আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম– ইউকেলিস অস্ফুট গলায় রোজীকে বললো– আমার মাকে বলবে' ....... আর কিছুই বলতে পারলো না সে। চোখ দুটি স্থির হয়ে গেলো। দুই ঠোঁট ফাঁক হয়ে রইলো।

রোজীর বুকচেরা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। শারীনার মুখ থেকে ফুঁপানির মতো এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে সেখান থেকে চলে গেল। রোজীর পরিচয়ও জানতে ইচ্ছে হলো না।

✪ ✪ ✪

এখন একটু সাদামাটা সংলাপ। অনেকটা তুলনামুলক। আজকের মুসলমানদের ঈমানের সঙ্গে সেদিনের মুসলমানদের ঈমানের তুলনা। মিলাতে গেলে মনে হবে ভুল হিসাব।

মানুষের জন্মগত স্বভাবে এ এক অমোঘ ধারা, তার চিন্তা-চেতনা ভুল পথে চালিত হলেও সে এটাকেই আজীবন আকড়ে ধরে থাকতে চায় এবং সর্বমহলে তা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অনুরূপ মুসলমানরা যখন ঈমানের সম্পদ হারিয়ে ফেলে তখন তার দৃষ্টিতে গতকালের বাস্তবতা আজ হয়ে যায় কল্পকাহিনী। অথচ তারাও সেই মুসলমানই ছিলো যারা ঈমানকে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ মনে করতো। ঈমানের প্রশ্নে নিজেদের প্রাণকূল হয়ে যেতো অতি তুচ্ছ জিনিস। সেই ঈমানের অমিত শক্তিতেই তারা বড় বড় দানবীয় যুদ্ধ শক্তিকে এমন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিয়ে ফেলেছে যেন তার কোন বাস্তবতাই ছিলো না।

পৃথিবীর দুই দানবীয় শক্তি রোম ও পারস্য যখন সংঘাতে জড়াতো মনে হতো আকাশ ও জমিন হেলে পড়ছে। পারস্যের বাদশাহ তথা কিসরায়ে ইরানকে প্রজারা 'খোদার বেটা' বলতো। মুসলমানরা যখন মাদায়েন রুখ করলো শেষ কিসরায়ে ইরান ইয়াযদগিরদ পালিয়ে তুর্কিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মনে মনে সংকল্প করে ইরানের মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়া হবে। তারপর ইরানে হামলা করে একটা মুসলমানকেও তখন জীবিত ছাড়া হবে না।

অনেক বছর পর হযরত উসমান (রা) এর খেলাফতকালে খোরাসানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইয়াযদগিরদ এটাকে মহা সুযোগ মনে করে তুর্কিস্তান থেকে মারু পৌঁছে এবং সেখানকার বড় বড় সরদারদের হাত করে সেই বিদ্রোহের

আগুণে আরো ঘি ঢালার চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদরা খুব দ্রুত বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয় এবং ইয়াযদগিরদের সন্ধান পেয়ে যায়। ইয়াযদগিরদের জন্য তখন পালানোও মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই সে বেশি দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলো না। মারুর হাকিমের  হাতে ধরা পড়ে এবং তার হাতেই কতল হয়ে যায়।

(এ হলো ইরানের শেষ কিসরার ইতিহাস। যে কবরস্থানে দাফন হওয়ার আগেও মুসলমানদের শাসনাধীন ছিলো। কস্তুনতনিয়ার আসল নাম ছিলো বযনতিয়া। পরে হেরাকল তার সবচেয়ে প্রিয় ছেলে কস্তুন্তীনের নামানুসারে বযনতিয়ার নাম রাখেন কস্তুন্তনিয়া। আরো বহু শতাব্দী পর আতাতুর্ক মুস্তফা কামাল পাশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কস্তুন্তনিয়ার নাম রাখেন ইস্তাম্বুল।)

✪ ✪ ✪

সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর মাধ্যমে হলব বিজয়ের সংবাদ শুনলেন প্রথমেই তিনি অন্যান্য মুজাহিদ ও সালারদের নিয়ে শুকরিয়ানা নামায পড়লেন। তারপর হলব চলে এলেন সেদিনই। বিজয়ী মুজাহিদদের সমবেত করে সবাইকে শাম বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ দিলেন এবং মুজাহিদদের উদ্দেশ্য বললেন,

'পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সাহায্যের সূত্র ধরে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে চলছি। বাতিলের আরেক শক্তিকে নাস্তানাবুদ করে ইসলামী সালতানাতের সীমান্ত আরো প্রশস্ত করেছি। তবে ইসলামী সালতানাতের কোন শেষ সীমানা নেই। কারণ আমরা বাদশাহী নয় বরং আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর। তাই এ যমিনে শুধু তারই হুকুম চলবে। শহীদরা তারই সন্তুষ্টির জন্য তার রাহে নিজেদের কুরবানী  দিয়েছেন। তাদেরকে মহান আল্লাহ তার দরবারে আশ্রয় দিয়েছেন। বাহু, উরু, চোখ থেকে যারা বঞ্চিত হয়ে সারা জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে তাদের কুরবানীও দেখো। তবে তারা কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না। তাদের ও তাদের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা .....

'শহীদ ও অঙ্গহানি হয়ে যাওয়া মুজাহিদের পরিবারকে  ও তাদের ঘনিষ্ঠ জনদের সেই যমিনই রিজিক দিবেন যে যমিন তাদের রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে। এ

দুনিয়ার দৃষ্টিতে নিজেদেরকে দেখো না। তোমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। প্রতিদিন তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি পড়নি ? আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত আখ্যা দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তোমরা মানবজাতির কল্যাণ সাধনায় আত্ম নিবেদিত থাকবে এবং তাদেরকে অকল্যাণ থেকে মুক্ত রাখবে। এর চেয়ে বড় কল্যাণের কাজ কি হতে পারে, তোমরা জনগণকে জালিম বাদশাহর হাত থেকে বাচিয়ে বাতিলের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছো এবং সত্যের পথে উঠিয়ে এনেছো। নিজেদেরকে সঙ্গী ও বন্ধুহীন মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

✪ ✪ ✪

হায় আমাদের স্বামী, বাপ, ভাইয়েরা কাদের জন্য যুদ্ধ করলো ? কাদের জন্য মরলো ? হলবের ভেতর এখন এসব আর্তনাদই উঠছে বিভিন্ন নারীকণ্ঠ থেকে।

'দুই রোমী জেনারেল আমাদের যোদ্ধাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো- কয়েকজন মহিলার আর্তনাদি আওয়াজ।

'বড় রূপসীর বেশে এক প্রেত এসেছিলো। সে মেয়েদেরকেও লড়াই করতে উস্কানি দেয়- লিজা সম্পর্কে কেউ একজন বললো।

'কোথায় সে ?'

'জীবিত পেলে ওকে কেটে ফেলো, আমাদের লোকদের যেভাবে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে।'

হলবের লোকেরা লিজাকে ইনথিউনিসের স্ত্রী বলে জানতো।

'ওর স্বামী নাকি মারা গেছে- চিৎকার করে এক মহিলা বললো- শুনেছি অন্য জেনারেলটাও মারা গেছে। ঐ প্রেত-নারীর ছেলেরও কোন পাত্তা নেই।'

'ঐ ডাইনীকে খুঁজে বের কর, খঞ্জর দিয়ে কুপিয়ে ওকে ছালনি বানিয়ে দাও- এক প্রৌঢ়া মহিলা বললো।

মহিলারা শহরের এক জায়গায় একত্রিত হয়ে এসব বলাবলি করছিলো। কেউ একজন বললো, আরেক জেনারেল রোতাস যে বাড়িতে থাকতো লিজা সে বাড়িতে মরে পড়ে আছে। সব মহিলা সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখলো, রক্তাক্ত লিজা উঠোনে চিত হয়ে পড়ে আছে। মহিলারা নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় খিস্তি

করে ঘৃণার ময়লা ঝাড়লো অনেক্ষণ। কেউ বললো, ওর লাশ হেচড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দাও। আরেকজন বললো, না। দরজা বন্ধ করে চলে যাবো আমরা। ওকে এখানেই পোকামাকড় খেয়ে শেষ করবে।'

ওদিকে যখমীদের উঠিয়ে উঠিয়ে শহরে আনা হচ্ছে। এখানে যেন বন্ধু আর শত্রুর ব্যবধান ঘুচে গেছে। যখমী মুসলমান হোক খ্রিষ্টান হোক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের চিকিৎসা শিবিরে পৌঁছে দিচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একদল মহিলাও আছে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে শারীনা। শারীনা এক গলি দিয়ে যাওযার সময় শুনলো, এ বাড়িতে রোমি জেনারেলের স্ত্রী মরে পড়ে আছে। কৌতুহল শারীনাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো। সেখানে মাত্র দু' তিনজন মহিলা আছে এখন।

লিজার লাশ দেখে শারীনা যেমন হয়রান হলো তেমনি শোকতপ্ত হয়ে উঠলো। হেরাকলের স্ত্রী হিসেবে লিজাকে তো সে সতালো মা বলে জেনেছে এতদিন। শাহী মহলে লিজার সামনেই সে হেসে খেলে বড় হয়েছে।

লিজা এখানে কি করে এলো, কিভাবে কতল হলো ? মুসলমানরা তো মহিলাদের ওপর হাত তোলাকে কবীরা গুণাহ মনে করে- এসব ভেবে শারীনা হয়রানীর শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে।

এর আগে রোমী দুই জেনারেলের লাশ দেখেও শারীনা বিস্মিত হয়। শারীনা ইনথিউনিসকে চিনতে পারে এবং রোতাস তো তার হাতেই বন্দী হয়ে মুসলমান শিবিরে গিয়েছিলো। শারীনা এ প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাচ্ছিলো না যে, এক জেনারেল ও এক রোমী অফিসারের নেতৃত্বে অনভিজ্ঞ এসব কবীলা যোদ্ধাদের হেরাকল কি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিলো। আচ্ছা, হেরাকল না হয় অনবরত পরাজয়ের কারণে দিশাহীন হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তার এক স্ত্রীকে কেন পাঠালেন এখানে ?

'না, না- শারীনা এক নারীর আর্তনাদ শুনতে পেলো- এটা হতে পারে না। সবাই মিথ্যা বলছে।'

শারীনা চমকে উঠে দেখলো এ তো সেই মেয়ে যে ইউকেলিস মৃত্যুর সময় 'রোজী' বলে ডেকেছিলো। শারীনা এ মেয়েকে বিলাপরত অবস্থায় ইউকেলিসের লাশের পাশে রেখে এসেছিলো।

'তুমি মরতে পারো না মা!- রোজী দু' হাতে মৃত লিজার মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো- তুমি না বলতে , আমাকে ইউকেলিসের দুলহান বানাবে? চলো, ইউকেলিসের কাছে চলো। সে তোমার অপেক্ষায় আছে।'

শারীনার চোখে পানি এসে গেলো। সে বুঝলো, ইউকেলিসের মৃত্যু তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। শারীনা তাকে আলতো করে উঠালো। রোজী! একে আমিই উঠাবো। ও গভীর ঘুমে। কে হন ইনি তোমার ?' – শারীনা জিজ্ঞেস করলো।

'ইনি ইউকেলিসের মা'। আমার রক্তের সম্পর্কিত না হলেও তিনিই আমার সবকিছু। ইকেলিসের সঙ্গে আমাকে দেখে তিনি বড় আনন্দ পেতেন। তিনি বলতেন, আমার ছেলের জন্য তোমার মতো দুলহানই খুজছিলাম আমি।'

ইউকেলিসও নেই তার মাও যে নেই এ সত্য কিভাবে তাকে বুঝানো যাবে শারীনা ভেবে পেলো না। রোজী তো এখন ঘোরের জগতে বাস করছে। রোজীর ঘোরের মধ্যেই শারীনা তার সঙ্গে তার সুরে সুরে কথা বলতে লাগলো। একবারও বললো না যে, উঠোনে যে পড়ে আছে সে মারা গেছে।

এ সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা সেখানে এসে রোজীর হাত ধরে রোজীকে সেখান থেকে চলে আসতে বললো।

'তুমি এখান থেকে যাও মা! – রোজী ঘোর লাগা গলায় বললো– আমি ইউকেলিসকে ডাকতে যাচ্ছি। সে এসে তার মাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

শারীনা রোজীর মাকে এক কামরায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আসলে কি ঘটেছে। ইউকেলিস রোজীকে জানিয়ে দিয়েছিলো, তার বাবা শাহে হেরাকল। তার এক ছেলে কস্তন্তীন তাকে হত্যা করতে চাইতো। কারণ, হেরাকল কস্তন্তীনকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার করেছেন। এজন্য ইনথিউনিস তাকে আর তার মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে সে হেরাকলের নয় ইনথিউনিসের ছেলে। ইনথিউনিস এখানে এসেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ঈসা মাসীহের সালতানাত কায়েম করতে।

রোজী এসব কথা তার মাকে জানিয়েছিলো। এখন রোজীর মা শারীনাকেও জানালো। ওরা কথা বলছিলো। হঠাৎ কামরার বাইরে রোজীর তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেলো–

'হেরাকলই ইউকেলিস ও তার মাকে কতল করিয়েছে। আমিও তাকে কতল করতে যাচ্ছি।'

রোজীর ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেলো কামরার ভেতর থেকে। রোজীর মা হায় হায় করতে করতে তার পিছু নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। শারীনা বড় ভারবাহী মন নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্ত লিজার লাশটা দেখলো। তারপর

বাইরে বেরিয়ে দেখলো, রোজী শহরের প্রধান ফটকের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে আর তার মা চিৎকার করছে 'ওকে ধরো... ওকে যেতে দিয়ো না।

অসংখ্য লাশের হেফাজত, রক্তাক্ত যখমীদের সেবা শুশ্রূষা এবং শোকাহতদের বিলাপ ধ্বনি এক প্রলয়ংকারী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। এ অবস্থায় এক মা ও এক মেয়ের প্রতি কেইবা দৃষ্টি দিতে যাবে।

✪ ✪ ✪

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) শাম বিজয়ের সংবাদ পেয়ে হুকুম পাঠালেন, শাম পর্যন্তই মুসলমানদের সীমানা থাকবে। এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই। কারণ বিজিত এলাকা এতই বিশাল যে, সেখানে শীঘ্রই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। না হয় স্থানীয়রা যে কোন সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আবু উবাইদা (রা) এর মতো জোশদীপ্ত সিপাহসালারসহ সব সালাররাই আমীরুল মুমিনীনের এ সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দূরদর্শী ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলেন। শুধু একজন সালার এটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)। তখন তিনি হলব থেকে অনেক দূরে। আমর ইবনুল আস (রা) পরিস্কার ভাষায় একথাও বলে দিলেন, আমীরুল মুমিনীনের এ হুকুম অনেকটা অদূরদর্শী।

আবু উবাইদা (রা) হলবে থাকা অবস্থাতেই আমর (রা) এর এ মন্তব্য শুনে তিনি হলব থেকে আমর ইবনুল আসের কাছে এলেন। এসেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এ ধরনের উত্তেজনামূলক কথাবার্তা বলে মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন।

'রোমীয়রা ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেড়ার পালের মতো পালাচ্ছিলো আমরা ওদেরকে পিছু ধাওয়া করে গেলে বড় সহজে মিসর ঢুকতে পারতাম।

'আমি হয়রান হচ্ছি ইবনে আস! – আবু উবাইদা (রা) বললেন– এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে গেছো যে, খ্রিস্টান গোত্রগুলো আমাদের সৈন্যদের কমতি দেখে প্রতিটি শহরে বিদ্রোহ করে বসেছিলো ? এতো আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমরা সবখানেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছি। ভেবে দেখো, আমরা আর এগুতে চাইলে পেছনে কি এরা বিদ্রোহ করে বসবে না ?'

✪ ✪ ✪

আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী, দৃঢ়চেতা, দূরদর্শী নেতৃত্বদানের বিরল প্রতিভার অধিকারী এবং সংকল্পবদ্ধতায় অতি শক্তিমান। ফিলিস্তীনের যুদ্ধে বড় বড় সালাররা যখন ব্যর্থ হচ্ছিলো তখন উমর (রা) আমর ইবনে আসকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন এবং বলেন, তিনি পরাজয়ের নয় বিজয়ের সুসংবাদ শুনতে চান। আমর (রা) বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীনকে বিজয়ের সুসংবাদই শোনাবেন।'

বায়তুল মুকাদ্দাসে তখন আতরাবুন নামে রোমীয়দের এক বিখ্যাত জেনারেল ছিলেন। চতুরতা, শত্রুকে কানা পথ দেখানো এবং চালবাজিতে তার কোন জুড়ি ছিলো না। আমর ইবনে আসেরও রণ-চতুরতায় দারুণ খ্যাতি ছিলো। এজন্যই উমর (রা) আতরাবুনের বিরুদ্ধে আমর ইবনে আস (রা) কে বাছাই করেন। এবং তিনি এই ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেন,

'আমরা আরবের আতরাবুনকে রোমের আতরাবুনের বিরুদ্ধে পাঠালাম। এখন দেখি এর পরিনাম কি হয়!'

আমর ইবনে আস যখন বায়তুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হন আতরাবুন তখন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটু দূরের এক স্থান 'আজনাদাইনে।' আমর (রা) আজনাদাইনে গিয়ে দেখলেন তার সৈন্যের তুলনায় আতরাবুনের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ। তিনি সেনা সাহায্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

খবর পেতেই উমর (রা) সঙ্গে সঙ্গে সেনা সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন। আর আমর (রা) আজনাদাইন ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মাঝামাঝি এক জায়গায় তাঁবু ফেললেন। ফৌজি হামলার পূর্বে প্রথমে তিনি আতরাবুনের ওপর মানসিক হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দু'জন গুপ্তচরকে দূতবেশে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে আতরাবুনের কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য হলো, কেল্লার ভেতরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি জেনে আসা।

আতরাবুন দুই দূতকে পুর্ণ সম্মান দিয়ে বসালো এবং তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে তাদেরকে বিদায় দিলেন। দুই দূতকে শহরে ঘুরিয়ে দেখানোর মতো বোকা জেনারেল ছিলো না আতরাবুন।

তাই দুত দু'জন ফিরে এলে তাদের কাছ থেকে শহরের সন্তোষজনক রিপোর্ট না পেয়ে আমর (রা) নিজেই ছদ্মবেশে দূত হয়ে গেলেন আতরাবুনের কাছে।

সন্ধি বিষয়ে দু' একটা কথা হওয়ার পর আমর ইবনে আস কথায় কথায় বললেন, তিনি একথা তার সিপাহসালার পর্যন্ত পৌঁছাবেন। তারপর তার হুকুম নিয়ে পুনরায় হাজির হবেন।

'আমার চোখ আমাকে ধোকা দেয়নি– আতরাবুন মুচকি হেসে বললো– আমি কোন দূতের সঙ্গে কথা বলছি না বরং আরবের সিপাহসালার আমর ইবনে আসের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি কি আমর ইবনে আস নও?'

'আরে ধ্যৎ– আমর (রা) জোর দিয়ে বললেন– আমি আমর ইবনে আস হলে নিজের ওপর মিথ্যার পর্দা ফেলার প্রয়োজন হতো না। আমাদের সিপাহসালার অত্যন্ত নির্ভীক। কখনো মিথ্যা বলেন না।'

আতরাবুন এমনভানে হেসে উঠলো যেন এ দূতের কথা সে মেনে নিয়েছে। একটু পর আতরাবুন কামরার বাইরে গেলো এবং বেশ সময় পর আবার ফিরে এসে আলোচনা শুরু করলো। আসলে আতরাবুন বাইরে গিয়ে তার এক মুহাফিজকে দায়িত্ব দেয় যে, এই আরব যখন কেল্লার বাইরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিত হামলা করে তাকে শেষ করে দেবে।

আমর ইবনে আস (রা) বুঝে গেলেন যে, তার আজ আর রেহাই নেই। তার মাথা বিদ্যুৎগতিতে চলতে লাগলো। হঠাৎ করেই তিনি আতরাবুনের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলতে লাগলেন যেন রোমীয়দের সেনাশক্তি দেখে তারা বেশ ভীত হয়ে পড়েছে। তারপর সমীহ জাগানো গলায় বললেন, আসলে তিনি সিপাহসালার আমর ইবনে আসের পাঠানো দূত নয় বরং আমীরুল মুমিনীন তাকে পাঠিয়েছেন। কেল্লার বাইরে তার সঙ্গে আসা দশজন উপদেষ্টা একটু দূরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি তাদেরকে নিয়ে কেল্লায় ফিরে আসবেন। তারপর তারা ফয়সালা করবে আতরাবুনের শর্তগুলো তারা মানবে কি মানবে না।

আতরাবুন দারুন খুশী হলো যে, একজন নয়। আরো দশজন মুসলমান তার জালে ধরা পড়ছে। সে আমর (রা) কে বললো আপনি আপনার উপদেষ্টাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

অনেক পর যখন আতরাবুন বুঝতে পারলো, আরবী সিপাহসালারই তাকে রাম বানিয়ে চলে গেছে তখন তার পাগল হওয়ার মতো অবস্থা হলো।

✪ ✪ ✪

এর আগে মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য বিজয় রথ দেখে হেরাকল বায়তুল মুকাদ্দাসের ভেতর থেকে নবী (আ)গণের মূল্যবান সব স্মৃতিগুলো কস্তুন্তনিয়া নিয়ে যেতে থাকেন। আর এদিকে জেনারেল আতরাবুনের নেতৃত্বে বিশাল ফৌজের সমাবেশ ঘটান। অন্যদিকে খ্রিষ্টান ফৌজ ও শহরবাসীদেরকে ধর্মীয় উগ্রতায় উত্তেজিত করে তোলার জন্য তাদের 'আসকাফে আজম' (প্রধান পাদ্রী) সফরানিউস উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি রোমী ফৌজকে উগ্র ধর্মীয় বক্তৃতা দিয়ে এমন উস্কে দিলেন যে, এরা যেন ভয়ংকর এক ঝড়ে পরিণত হয়েছে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন তখন বুঝা গেলো মুসলমানদের ওপর রোমীয়দের কেমন ভয়ংকর আক্রোশ। খণ্ড খণ্ড লড়াইগুলোও এত রক্তক্ষয়ী হলো যে, আমর ইবনে আস সেনা-সাহায্য ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

সংবাদ পেয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) মদীনা থেকে এক ফৌজ নিয়ে হাবিয়া নামক স্থানে পৌছে সিপাহসালার আমর ইবনে আসসহ অন্যান্য সালারদের সেখানে ডেকে নিয়ে যুদ্ধের নতুন কৌশল ঠিক করলেন।

ওদিকে রোমীয়রা গোয়েন্দা মাধ্যমে জেনে যায়, মুসলমানদের আমীরুল মুমিনীন বড় এক ফৌজ নিয়ে হাবিয়া নামক স্থানে এসে সব সালার ও সিপাহসালারের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে নিচ্ছেন।

এর দু' একদিনের মধ্যেই হঠাৎ করে 'আসকাফে আজম' সফরানিউসের পক্ষ থেকে দূত মাধ্যমে এক পয়গাম এলো যে, উমর (রা) নিজে যদি বায়তুল মুকাদ্দাস আসেন তাহলে সন্ধি চুক্তি হতে পারে।

সবাই ধরে নিলেন, এটা আতরাবুনের আরেক ধোকার কারসাজি। কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তার পর উমর (রা) যেতে রাজী হলেন। অতি মামুলি কাপড় পরে পায়ে হেটে বায়তুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হলেন তিনি।

উমর (রা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ঢুকতে যাবেন বায়তুল মুকাদ্দাসের এক পাদ্রী তখন তাকে বললো, আপনি শহরে যদি আরেকটু ভালো কাপড় পরে ঘোড়ায় চড়ে ঢুকতেন তাহলে রোমীয়রা আপনাকে অনেক সম্মানের চোখে দেখতো। উমর (রা) এর উত্তরে যা বললেন ইতিহাসের পাতায় আজও তা অম্লান।তিনি বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন শুধু ইসলামের বিনিময়েই দিয়েছেন। পোশাক বা ঘোড়া ইসলামে কোন সম্মানের বস্তু নয়। সম্মান তো হয় মানুষের। দামী পোশাক বা উন্নত ঘোড়ার নয়।'

'আসকাফে আজম' সফরানিউস নিজে এসে উমর (রা) কে স্বাগত জানিয়ে তার ওখানে নিয়ে গেলেন। সন্ধির কোন আলাপ আলোচনা ছাড়াই আসকাফে আজম বললেন, সন্ধি উমর (রা) নিজ ইচ্ছে মতো যেন লিখে দেন। উমর (রা) যাই লিখলেন, তাই বিনা প্রশ্নে মেনে নিলেন 'আসকফে আজম' সফরানিউস। আর এভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসও মুজাহিদদের ঝুলিতে চলে আসলো।

আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) সন্ধি চুক্তি হওয়ার পর হয়রান হয়ে দেখলেন, সেখানে আতরাবুনের কোন পাত্তা নেই। তার কথা জিজ্ঞেস করতেই সফরানিউস বললেন, আতরাবুন গতকাল গভীর রাতে কিছু ফৌজ সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং তার গন্তব্য মিসর। অর্থাৎ, আতরাবুন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলো, রোমীয়রা যত কঠিন যুদ্ধেই ঝাপিয়ে পড়ুক বায়তুল মুকাদ্দাস শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতেই যাবে এবং তার ফৌজের পাইকারী হত্যা খেলা শুরু হবে

(বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ঘটনা এখানে (পুনর্বার) বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, যাতে জানা যায়, মিসর বিজয়ের চিন্তা সর্ব প্রথম কার মাথায় কি করে এলো এবং কে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) কে এ ব্যাপারে রাজী করিয়েছিলেন।)

বায়তুল মুকাদ্দাসেই কোন এক সন্ধ্যায় আমার ইবনে আস (রা) কথায় কথায় মিসরের প্রসঙ্গ উঠালেন। উমর (রা)ও তার কথা শুনতে সম্মত হলেন।

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন! – যেমন আপনার ডান হাত আপনার বাম হাতকে চিনে তেমনি আমি কখনো মানবো না, আমাদের আমীরুল মুমিনীন এ আত্মতৃপ্তিতে রয়েছেন যে, আতরাবুন আমাদের ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা অবাস্তব স্বপ্ন দেখে অভ্যস্ত নই। নিজেকে ধোকা দেয়া ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয়।'

আরে আসের বেটা– উমর (রা) বললেন– ভূমিকা না করে মূল কথায় চলে আসা ভালো নয় ? তুমি বলো, আমি শুনছি।'

'ইয়া আমিরুল মুমিনীন! আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের আতরাবুনের পিছু ধাওয়া করা উচিত ছিলো।'

'তুমি কি এতেই যথেষ্ট মনে করছো না যে আমরা অনেক বড় কঠিন এক অভিযান শেষ করে এসেছি।'

'আমি একে যথেষ্ট মনে করছি না আমীরুল মুমিনীন ! এ বিজয়কে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকলে আতরাবুন নয়া ফৌজ তৈরি করে আমাদের ওপর হামলা করে বসবে। হেরাকল ও আতরাবুন একই ইবলিসের দুই নাম। আতরাবুন

এতই চতুর ও বিচক্ষণ যে, আলজাযীরা ও ফিলিস্তীনের খ্রিষ্টান কবীলাগুলোকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারবে এবং যমিনের নিচে থেকেও সে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারবে। এ ধরনের প্রস্তুতির জন্যই সে মিসর গিয়েছে। তাই আমাদের করণীয় হলো, তাকে শান্তিতে কোথায়ও অবস্থান করতে না দেয়া। আপনার অনুমতি চাই। আমি মিসরে হামলার নেতৃত্ব দিতে চাই।'

'শুধু আতরাবুনের প্রতি এত মনোযোগ নিবদ্ধ করো না ইবনে আস ! তুমি কি দেখছো না, আমরা পৃথিবীর দুই পরাশক্তি কায়সারে রোম ও কিসরায়ে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছি। এত দূরে আরেকটি অভিযান শুরু করলে কি আমাদের অন্যান্য অভিযানের শক্তি কমে যাবে না ?'

আমর ইবনে আস তারপর আমীরুল মুমিনীনের সামনে মিসরের পূর্ব ইতিহাস পেশ করলেন। মূসা (আ) ও ফেরআউনের ঘটনা শুনালেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা উল্লেখ করে শুনালেন, ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস কি করে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হলো। আরো বর্ণনা করলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর ঘটনা, এসব ঘটনা শুনতে শুনতে আরবরা তাদের হৃদয়ে মিসরের জন্য অন্যরকম একটি স্থান করে রেখেছে।

উমর (রা) এসব ইতিহাস খুব ভালো করে জেনেও নীরবে শুনতে লাগলেন আমর ইবনে আসের কথা। তিনি আসলে আমর (রা) কোন জযবায় কোন নিয়তে এসব বলছেন তা জানতে চাচ্ছিলেন।

আমর (রা) আরব ও মিসরের সম্পর্কের কথা তুলে ধরলেন। বললেন, হেজাযবাসী বিশেষ করে মক্কার সঙ্গে মিসরের বাণিজ্য সম্পর্ক তো আবহমানকালের। তা ছাড়া আরবদের উৎস পুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ) এর মা হযরত হাজেরা (আ)ও মিসরী। হযরত ইবরাহীম (আ) তার পত্নী হযরত সারা (আ) কে নিয়ে ইরাক থেকে মিসর চলে গিয়েছিলেন। তখন মিসরের বাদশাহ হযরত হাজেরাকে ইবরাহীম (আ) এর খেদমতে পেশ করেন।

কিন্তু হাজেরা (আ) এর গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ) জন্ম হওয়ায় হযরত সারা তা মেনে নিতে পারেননি। পরে আল্লাহর হুকুমে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে মক্কার বিজন মরুতে রেখে যান। এভাবেই মক্কাকে কেন্দ্র করে পুরো আরব আবাদ হয়। আর হযরত ইসমাঈল (আ) আরবেরই বনী জুরহাম গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এভাবেই আরব ও মিসরের মধ্যে আবহমানকাল থেকে এক আত্মিক সম্পর্ক বিরাজ করছে।

আরবরা তো মিসরীদের সম্পর্কে বাণিজ্য সূত্রে অনেক কিছু জানতো। কিন্তু পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর আরবরা মিসরীদের সম্পর্কে আরো অনেক অজানা তথ্য জানতে পারে।

এদিকে ৬১৬ খ্রি. পারসিকরা মিসরে হামলা করে রোমীদের পরাজিত করে। পারসিকরা নয় বছর মিসরে রাজত্ব করে। তারপরই হেরাক্লিয়াসের উত্থান ঘটে। এদিকে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, অতি সত্বর রোমীয়রা পারসিকদের ওপর বিজয় লাভ করবেই। এর কয়েক বছর পরই রোমীয়রা পারসিকদের ওপর বিজয় লাভ করে।

মিসর সম্পর্কে আরেকটি খণ্ড তথ্য এখানে স্মরণযোগ্য। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বহির্বিশ্বের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। মিসরের বাদশাহর কাছে এ পত্র নিয়ে যান হযরত হাতিব (রা)। চিঠির বক্তব্য ছিলো এই ঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে আজীমুল কিবত মুকাওকিসের নামে। শান্তি বর্ষিত হোক সত্যপন্থীর ওপর.....

আম্মাবাদ, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়াতে নিরাপদে থাকবেন এবং আল্লাহ তাআলা দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। হে আহলে কিতাব! সে সত্যের প্রতি এগিয়ে আসুন যার সমর্থক অমরা উভয়েই। তা হলো, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না। কাউকে তার সঙ্গে শরীক করবো না আর না আমাদের মধ্যে কেউ কারো প্রতি এমন আচরণ করতে পারব যাতে আল্লাহকে ছেড়ে বান্দার পূজায় বাধ্য করা হয়। তারপর যদি লোকেরা বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয় তাহলে বলে দাও, আমি তো আল্লাহকে মান্যকারী।'

ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকিম লিখেছেন, অধিকাংশ বাদশাহই রাসূলুল্লাহ (সা) এর পত্র পেয়ে পত্রদূত ও পত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। আর কিসরায়ে ইরান তো প্রিয় নবীজীর পত্র ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ভরা মজলিসে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু মুকাওকিস প্রিয় নবীজীর (স) প্রেরিত চিঠিটি অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন। তারপর রাতের বেলা পত্র দূত হাতিব (রা) কে একাকি তার শাহী

কামরায় ডেকে নিয়ে সসম্মানে চেয়ারে বসিয়ে প্রিয় নবীজী (স) সম্পর্কে জানতে চান। হযরত হাতিব (রা) উপমা উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা প্রতিচ্ছবি তার সামনে পেশ করেন।

'আমি জানতাম অতি সত্বর এক পয়গম্বর আসবেন– মুকাওকিস বললেন– কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এ নবী অসবেন শাম দেশে। কারণ এর আগে অধিকাংশ নবী শাম দেশেই প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি, সেই নবী বিপদসংকুল আরব ভূমিতে এসেছেন। আমি তোমাদের নবীর দলে ভিড়লেও কিবতিরা আমার সঙ্গ দেবে না। তাই আমার ও তোমার মধ্যে যে কথা হয়েছে তা যেন এখানকার আর কেউ না জানে। আমি অনুভব করছি, তোমাদের নবীর বিজয় রথ এদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে.....

'তোমাদের পয়গম্বরের সঙ্গীরা তাঁর তিরোধানের পর এ মিসরে লড়াই করে বিজয়ী হবে। কিন্তু এসব কথার একটি শব্দও কিবতিদেরকে আমি বলবো না। তুমি তোমার বন্ধুর (রাসূল (স)) কাছে ফিরে যাও।'

পর দিন সকালে মুকাওকিস হযরত হাতিবকে ডেকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিলো,

'আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অজীমুল কিবত মুকাওকিসের পক্ষ থেকে সালাম! আমি আপনার চিঠি পড়েছি। আপনি এতে যা বলেছেন তা আমি বুঝেছি। আমি জানতাম অচিরেই এক পয়গাম্বর আসবেন। আমার ধারণা ছিলো, শাম দেশে তার আবির্ভাব হবে। আমি আপনার কাসেদকে যথাসাধ্য সম্মান করার চেষ্টা করেছি। আর আপনার খেদমতে কিবতীদের মধ্য থেকে অত্যন্ত অভিজাত ঘরের দুটি মেয়ে পেশ করছি এবং আপনার সওয়ারীর জন্য উঁচু জাতের একটি খচ্চর তোহফা হিসেবে পাঠাচ্ছি।'

মেয়ে দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরে তার স্ত্রী করে নেন।'

✪ ✪ ✪

হযরত আমর ইবনে আস (রা) উমর (রা) কে মিসর অভিযানের ব্যাপারে আরেকটি যুক্তি দেখালেন, মিসরের কিবতীরা খ্রিষ্টান হলেও তারা এখন ভিন্ন এক ফেরকা বানিয়ে নিয়েছে। মিসর হেরাকলের পদানত থাকায় হেরাকল নিজে

খ্রিষ্টান হয়েও কিবতী ফেরকার শক্ত বিরোধী। এছাড়া খ্রিষ্টানদের আরো কয়েকটা দল আছে। তাদের মধ্যে সবসময় লড়াই বিরোধ লেগেই থাকে।

হেরাকল এজন্য সব ফেরকাকে নিষিদ্ধ করে একটি সরকারি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচলন করেন এবং মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ার (আলেকজান্দ্রিয়া) প্রধান পাদ্রী 'আসকাফ' কিরাসকে এ ক্ষমতা দেয়া হয় যে, তিনি জনগণকে জোরজবরদস্তি করে সরকারি ধর্মে বাধ্যতামূলকভাবে দীক্ষিত করবেন। তারপর থেকেই শুরু হয় সরকারি খ্রিষ্টান ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার। বিশেষ করে কিবতী ফেরকাগুলোকে গত দশ বছর ধরে যে অমানবিক নির্যাতনের মধ্যে রাখা হয়েছে তা বড়ই লোমহর্ষক। কিন্তু তাদের পক্ষে বলার মতো কেউ নেই।

আমর ইবনে আস হযরত ওমর (রা) কে বললেন, কিবতীদেরকে এ জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত করা আমাদের জন্য ফরয।

আমর (রা) তারপর উমর (রা) কে মিসরের ভুমি কত যে উর্বর, তার গর্ভে কত যে প্রাকৃতিক খনি আছে তা জানালেন। বললেন, কুদরতের দান করা এ ধনভাণ্ডার রোমীদের রঙ্গ-মহলে চলে যাচ্ছে। আর সাধারণ লোকেরা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন!– আমর (রা) বড় আবেগাপ্লুত গলায় বললেন– আমার অন্তর বলছে, আমাদেরকে ঐ যমীন ডাকছে যেখান দিয়ে নীল দরিয়া বয়ে যাচ্ছে ..... আমি আমার এক ব্যক্তিগত ঘটনা শোনাতে চাই। যেটাকে আমি আল্লাহর এক ইশারা বলে মনে করি।'

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমর (রা) যে একবার এক লোকের সঙ্গে মিসরের ইস্কান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) যান। সেখানে এক জাতীয় উৎসবে যে তিনি লটারীর মাধ্যমে মিসরের ভবিষ্যৎ রাজা বনে গিয়েছিলেন এবং লোকেরা তার খর্বকায় দেহ দেখে বিদ্রূপ করে বলেছিলো, এ বুদ্ধু আবার আমাদের রাজা হবে কি করে?' – এ ঘটনা আমর ইবনে আস উমর (রা) কে শোনালেন।

'আমিরুল মুমিনীন! – ঘটনা শুনিয়ে ইবনে আস (রা) বললেন– আমি এমন চিন্তা আমার মাথায় কখনো আনবো না যে, সেই খেলাচ্ছলের লটারীতে এ ইংগিত ছিলো যে, আমি একদিন না একদিন মিসরের বাদশাহ বনবো.... বাদশাহী শুধু আল্লাহ তাআলারই। আমি সংকল্প করেছি মিসরে আমাকে আল্লাহর বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।'

উমর (রা) আমর ইবনে আস (রা) এর কথায় রাজী হয়ে গেলেও তিনি হযরত উসমান (রা) সহ মদীনার বিশিষ্ট সাহাবাগণের সঙ্গে আলোচনা করে নেয়া জরুরী মনে করলেন। মদীনায় গিয়ে তিনি এ আলোচনা উঠাতেই সবাই এ ধরনের চিন্তা ভাবনাকে আত্মঘাতী বলে উল্লেখ করলেন। কেউ অনুমতির পক্ষে মত দিলেন না।

যা হোক, উমর (রা) ইবনে আস (রা) এর এ সংকল্প ও জযবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাকে প্রবোধ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে মিসরীদের ব্যাপারে একটা কথা উঠালেন। তিনি বললেন, কিবতী খ্রিষ্টানদেরকে তো আমরা রোমীয়দের হাত থেকে বাঁচাবো। কিন্তু ওদের মধ্যে একটা বড় অমানবিক প্রথা চালু আছে। সেটা হলো, নীল দরিয়ায় পানি যাতে শুকিয়ে না যায় এজন্য তারা বছরে একবার এক সুন্দরী কুমারী মেয়েকে নানান অলংকারে সজ্জিত করে নীল দরিয়ায় ফেলে দেয়। মেয়েটি ডুবে মরে গেলে কিবতীরা বলে, নীল দরিয়া এখন আর শুকাবে না।

ইবনে আস (রা) উমর (রা) কে সমর্থন করে বললেন, ইনশাআল্লাহ কিবতীরাও সব কুপ্রথা ছেড়ে দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হবে।

✪ ✪ ✪

হলব ও ইন্তাকিয়ার মধ্যে দূরত্ব প্রায় মাইল চল্লিশেক হবে। ইন্তাকিয়া থেকে হলবে এবং হলব থেকে ইন্তাকিয়ায় ব্যবসায়িক সূত্রে লোকজনের বেশ আসা যাওয়া আছে। হলব বিজয়ের অনেক দিন পর এই দু' এলাকায় যাতায়াতকারী লোকদের মধ্যে একটা গুজব উঠলো যে, এ দুই এলাকার মাঝামাঝি জঙ্গল পথে কিছু দিন ধরে এক প্রেতাত্মার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। লোকেরা এর আওয়াজ শুনলেই দৌড়ে পালাতে শুরু করে।

একদিন এক মুসাফির হলবের এক সরাইখানায় উঠলো। সে আতংকগ্রস্ততার কারণে কথা বলতে পারছিলো না। লোকেরা বুঝতে পারলো এ লোক পথে এক অশরীরী দেখে এসেছে। লোকেরা তাকে অভয় দিতে দিতে বললো, সে কি দেখেছে সবাইকে বলে দিলে কেউ আর ঐ পথ দিয়ে যাবে না।

মুসাফির জানালো , সে তার বসতি থেকে খচ্চরে চড়ে হলবের দিকে আসছিলো। গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ি এক পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনতে পেলো, 'আমি তার রক্ত পান করবো...... সে আমার রক্ত ঝরিয়েছে'– ...

তারপর তার চিৎকার শোনা গেলো। ভয়ে মুসাফির তার খচ্চরের ওপর চাবুক চালাতে লাগলো। কিন্তু এতো খচ্চর। ঘোড়ার মতো তো আর ছুটতে পারবে না।

তার খচ্চরটি এক টিলার মাঝখান দিয়ে বাঁক ঘুরতে গিয়ে আচমকা এক যুবতীর সামনে পড়লো। তার চুলগুলো এলোমেলো। পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়। কিন্তু চেহারা দিয়ে যেন আলো বের হচ্ছে।

মুসাফির নিশ্চিত সে আজ প্রেতাত্মার কবলে পড়েছে। সে দ্রুত তার খচ্চর থেকে নেমে প্রেতাত্মার সামনে হাটু গেড়ে বসে বললো,

'আমি এক গরিব মুসাফির। ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চার পেট পালার জন্য দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। আমাকে বলো তোমার কি খেদমত করতে পারি। প্রাণে মেরো না আমাকে।'

প্রেতাত্মা কিছুই বললো না। সে খচ্চরের কাছে গিয়ে খচ্চরের জিনের সঙ্গে বাঁধা মুসাফিরের খাবার পুটলিটা নিয়ে মুসাফিরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'হেরাকল কোথায়?– প্রেতাত্মা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি সঠিক জানি না– মুসাফির কাঁপতে কাঁপতে বললো– শুধু জানি শাম থেকে পালিয়েছে। মিসরও যেতে পারে। মিসরে তার বাদশাহী আছে, আর আলেকজান্দ্রিয়া তার মহল আছে।'

'আমি তার রক্ত পান করতে যাচ্ছি– দাঁত পিষে বললো প্রেতাত্মা– সে আমার রক্ত ঝরিয়েছে। আমাকে কতল করিয়েছে। তুমি জানো সে কোথায়? বলো, না হয় তোমার রক্তও খাবো।'

'আমার বাচ্চাদের ওপর জুলুম করো না– মুসাফির কাঁদতে কাঁদতে বললো– আমি গরিব মানুষ হয়ে বাদশাহদের ব্যাপারে জানবো কি করে? তুমি যদি খোদাকে মেনে থাকো, তাহলে তার নামে আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

প্রেতাত্মা আর কিছু না বলে উল্টো পায়ে চলে যেতে লাগলো। মুসাফির দেখলো সে একটি টিলার চূড়ায় উঠে হঠাৎ করে যেন গায়েব হয়ে গেলো।

কিছু দিন পর ইন্তাকিয়ায়ও এমন দুই মুসাফির পৌছলো যারা এ ধরনেরই এক প্রেতাত্মার সাক্ষাত পেয়েছে। হলবের মুসাফিরের সাথে প্রেতাত্মা যেমন আচরণ করেছিলো এদের সঙ্গেও তেমনি আচরণ করেছে। কাউকেই কোন ক্ষতি করেনি। লোকেরা এসব শুনে নিশ্চিত বলে দিলো, এ নিশ্চয় হেরাকলের কতল করা কারো বিদেহী আত্মা।

ঐ এলাকায় বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি ছোট ছোট বসতি আছে। বসতির লোকেরা প্রায়ই প্রেতাত্মার আর্তচিৎকার শুনতে পায়। লোকেরা সন্ধ্যার পর বাইরে বের হওয়া ছেড়ে দিলো। মুসাফিরদের কথায় অনুমান করা গেলো। প্রেতাত্মার রোখ এখন ইন্তাকিয়ার দিকে।

একদিন কয়েকজন অমুসলিম ইন্তাকিয়াবাসী ইন্তাকিয়ার সালারের কাছে এসে বললো, কিছুদিন ধরে এক প্রেতাত্মার খবর শুনে লোকেরা এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, অনেকের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। সন্ধ্যার পর কেউ ঘর থেকে বের হয় না। মুসাফিররাও সফর মুলতবী করে দিচ্ছে। আমরা শুনেছি, মুসলমানদের কাছে এমন শক্তি আছে যা দিয়ে তারা অশরিরী বা প্রেতাত্মাকে কাবু করতে পারে।

'হ্যাঁ তোমরা ঠিকই শুনেছো– সালার বললেন– এ শক্তির মূল রহস্য হলো ইসলাম জানে, কেউ মরে গেলে সে আর ফিরে আসে না। আসল রূপেও না এবং প্রেতাত্মা হয়েও না। ইসলাম বাস্তবধর্মী কথা পছন্দ করে। ভূত প্রেতের কোন অস্তিত্ব তার আকীদায় নেই। তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করো। তোমাদের মধ্যেও এ শক্তি এসে যাবে। তারপর তোমরা ভূত প্রেতকে নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে সে কে?'

সালার অনুভব করলেন, ইসলামের ব্যাপারে এসব সূক্ষ্ম কথা এরা এখন বুঝবে না। তিনি তার মুহাফিজ বাহিনীর কমাণ্ডারকে ডেকে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন যে, সে যতজন প্রয়োজন ততজন মুহাফিজ নিয়ে যেন অনুসন্ধান চালায়, আসলে এ কি কোন অশরিরী-প্রেতাত্মা, না কোন মানুষ। লোকেরা যে আতংকিত হচ্ছে এর বাস্তবতা কতটুকু?

**[ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ]**

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর
ইতিহাসখ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনীসম্বলিত উপন্যাস....

# শেষ সংঘাত

১

আলতামাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস...
মূলঃ আলতামাস

# শেষ আঘাত

**ভাষান্তরঃ মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন**

১. উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান দুই অশ্বারোহী। অগ্নিঝরা মরুর ধূসর বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসে এই দুই অশ্বারোহীর মেজাযও আগুন- তপ্ত। দুজনের মুখ নেকাবৃত। কিন্তু খোলা চার জোড়া চোখ। কালের অনেক উথান পতনের গভীর অভিব্যক্তি ফুটে আছে দুজনের চোখেই। অর্থাৎ তারা পরস্পরের কঠিন প্রতিপক্ষ। দুজনের স্পাত-কঠিন হাতে বিদুৎ খেলে গেলো। পলকে বেরিয়ে এলো উদ্যত তলোয়ার। অথচ তারা কিংবদন্তীর আলোকময় দিগন্তের দুই সাহসওয়ার
........ ইসলামের প্রতিরোধ্য দুই সিপাহসালার..........
২. কায়সারে রোম শাহে হেরাক্লিয়াসের দরবার। শাহ্‌জাদী শারীনা গাঢ় চোখে তাকিয়ে রইলো বন্দী হাদীদের দিকে। অনাগত ভবিষৎতের এক স্বপ্ন-বীজ শারীনার মনমুকুরে বুনে দিলো সত্য সজীব চেতনার আধার হয়ে। শারীনা কি পারবে মৃত্যুপুরী থেকে হাদীদকে উদ্ধার করতে?.........
৩. প্রজার মেয়ে রুজীর জন্য শাহ্‌জাদা ইউকেলিস কেন এত উতলা? ওদিকে মুজাহিদরা রোমীয়দের আগ্রাসী থাবায় প ্যুস্ত। আরেক দিকে ইউকেলিস আর দুর্ধর্ষ রোমীয় জেনারেল ইনথিউনিস মিলে বিশাল এক সেনাদল নিয়ে গুটি কয়েক মুজাহিদকে ঘুরে ধরেছে। সামান্য প্রতিরোধের আগেই ওরা শাহ্‌দাত বরণ করে দিবে?
হেরাক্লিয়াস এখন আহত সিংহের মতো মরন থাবা হানতে যাচ্ছেন। এ তার চূড়ান্ত ও শেষ আঘাত। লক্ষ লক্ষ ফৌজ সমবেত করেছেন পুরো মিসর জুড়ে। অথচ সিপাহসালার আমর উবনে আস (রাঃ) হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন শত্রুপুরীতে। একি আত্মহত্যা নয়?


**আল-এহছাক প্রকাশনী**
বাংলাবাজার, ঢাকা

ঐতিহাসিক উপন্যাস...
মূলঃ আলতামাস

# শেষ আঘাত

ভাষান্তরঃ মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

১. উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান দুই অশ্বারোহী। অগ্নিঝরা মরুর ধূসর বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসে এই দুই অশ্বারোহীর মেজাযও আগুন- তপ্ত। দুজনের মুখ নেকাবৃত। কিন্তু খোলা চার জোড়া চোখ। কালের অনেক উত্থান পতনের গভীর অভিব্যক্তি ফুটে আছে দুজনের চোখেই। অর্থাৎ তারা পরস্পরের কঠিন প্রতিপক্ষ। দুজনের স্পাত-কঠিন হাতে বিদুৎ খেলে গেলো। পলকে বেরিয়ে এলো উদ্যত তলোয়ার। অথচ তারা কিংবদন্তীর আলোকময় দিগন্তের দুই সাহসওয়ার

........ ইসলামের প্রতিরোধ্য দুই সিপাহসালার..........

২. কায়সারে রোম শাহে হেরাক্লিয়াসের দরবার। শাহ্জাদী শারীনা গাঢ় চোখে তাকিয়ে রইলো বন্দী হাদীদের দিকে। অনাগত ভবিষৎতের এক স্বপ্ন-বীজ শারীনার মনমুকুরে বুনে দিলো সত্য সজীব চেতনার আধার হয়ে। শারীনা কি পারবে মৃত্যুপুরী থেকে হাদীদকে উদ্ধার করতে?.........

৩. প্রজার মেয়ে রুজীর জন্য শাহ্জাদা ইউকেলিস কেন এত উতলা? ওদিকে মুজাহিদরা রোমীয়দের আগ্রাসী থাবায় পর্যদুস্ত। আরেক দিকে ইউকেলিস আর দুর্ধর্ষ রোমীয় জেনারেল ইনথিউনিস মিলে বিশাল এক সেনাদল নিয়ে গুটি কয়েক মুজাহিদকে ঘুরে ধরেছে। সামান্য প্রতিরোধের আগেই ওরা শাহ্দাত বরণ করে দিবে?

হেরাক্লিয়াস এখন আহত সিংহের মতো মরন থাবা হানতে যাচ্ছেন। এ তার চূড়ান্ত ও শেষ আঘাত। লক্ষ লক্ষ ফৌজ সমবেত করেছেন পুরো মিসর জুড়ে। অথচ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাঃ) হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন শত্রুপুরীতে। একি আত্মহত্যা নয়?

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা